পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-৪

বর্ধিষ্ণু বর্ধমান

(জেলাভিত্তিক ইতিহাস)

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্), পি. এইচ্. ডি.,
কাব্যপুরাণতীর্থ সাহিত্যভারতী, বিদ্যার্ণব
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের
অবসরপ্রাপ্ত রীডার ও বিভাগীয় প্রধান

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * ১৯৯৮

BARDHISHNU BARDHAMAN'
By
Dr. Hansanarayan Bhattacharya

প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৯৮

মুদ্রক ঃ
শঙ্কর প্রসাদ নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্য প্রভাব
বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ধারা
বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য পরিচয়
হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ৩ খণ্ড
যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
বঙ্গসাহিত্যাভিধান—৪ খণ্ড
বাঙ্গালা ছন্দ সমীক্ষা
বাঙ্গালা অলংকার সমীক্ষা
মন্দির ত্যাজ যব (উপন্যাস)
সিন্ধু তরঙ্গ (উপন্যাস)
বারোমতি (ছোটগল্প সংকলন)
রূপের অমরাবতী কাশ্মীর (ভ্রমণ কাহিনী)
হিমাচল হিমালয় (ভ্রমণ কাহিনী—বিশ্ববাণী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)
শ্রীগৌরাঙ্গের জায়া ও জননী (উজ্জীবন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ ঃ

ত্রিকবি রামায়ণ (বাল্মীকি কৃত্তিবাস ও মধুসূদন)
রূপকুণ্ড (ভ্রমণ কাহিনী)
পঞ্চকেদার (ভ্রমণ কাহিনী)

সদ্যো ব্রহ্মলীন পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ বহুভাষাবিদ,
মহাপ্রাজ্ঞ গ্রন্থকার ও সিদ্ধসাধক
বৈদান্তিক সন্ন্যাসী পরম পূজ্য গুরুদেব
ভিক্ষু শুদ্ধদেবের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তর জেলা বর্ধমান সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৩ খ্রীঃ) বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদের উদ্যোগে এবং অর্থানুকূল্যে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ৮ম অধিবেশনে বর্ধমান সম্পর্কে নানা বিষয়ের আলোচনা হয়। ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বর্ধমান শাখার উদ্যোগে এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ধমানের পুরাকথা, বর্তমান বর্ধমান, বর্ধমানের স্থান-নাম ইত্যাদি অধ্যায়ে বর্ধমান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই প্রবন্ধগুলি বর্ধমানের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না। পরে বর্ষীয়ান্ জননেতা শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী ও অনুকূল চন্দ্র সেন বর্ধমান পরিচিতি (১৩৭৩) নামে একটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তৎপরে বর্ধমান সম্পর্কে আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তৎসত্ত্বেও 'বর্ধিষ্ণু বর্ধমান' নামে আমার এই গ্রন্থ রচনা কলিকাতার ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড নামক বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের অনুরোধের ফল।

আমি বর্ধমানের সন্তান। বর্ধমান সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য এবং অনুরাগ জন্মসূত্রে স্বাভাবিক। তাই বর্ধমান সম্পর্কে লেখার সুযোগ আমি অস্বীকার করতে পারি নি। পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলি অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষযুক্ত বলে আমার মনে হয়েছে। অবশ্য আমার গ্রন্থ যে সর্বক্রটিমুক্ত বর্ধমানের সামগ্রিক পরিচয় বহন করে, এ দাবী আমি করি না। বৃদ্ধ বয়সে বর্ধমানের গ্রামে নগরে ঘুরে ঘুরে তথ্য বা পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তথ্যগত খুঁটিনাটি ও পরিসংখ্যান অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে। তাই খুঁটিনাটি তথ্য আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের বিষয় অকপটে স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই।

বর্ধমানের ইতিহাস বহু প্রাচীন। মধ্যযুগে বর্ধমানভুক্তি একটি বিরাট অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। বর্ধমানভুক্তি থেকে অর্থাৎ গুপ্তযুগ-পালযুগ থেকে

মুসলমান আমলে বর্ধমান চাকলা ও ইংরাজ আমলে বর্ধমান জেলায় পরিণতির ও বিবর্তনের ইতিহাস যথাসাধ্য বিবৃত করার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। প্রাচীন বর্ধমানের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু রাজ্যে বিভক্ত অখণ্ড বঙ্গদেশের পরিচয় বিস্তৃতভাবে গ্রন্থের প্রারম্ভে দিয়েছি। এটা 'ধান ভানতে শিবের গীত' বলে মনে হলেও সে যুগের বঙ্গভূমির সামগ্রিক চিত্র ও তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমানের অবস্থানকে সামগ্রিকভাবে জানার জন্য প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে।

আধুনিক বর্ধমান জেলার খুঁটিনাটি বিবরণ, যেমন, চালকলের সংখ্যা, উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ, বিভিন্ন ব্লকের বিবরণ, প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সামগ্রিক তালিকা ইত্যাদি অন্যান্য গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় যথাসম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। বর্ধমানের সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকটিই সবিস্তারে আলোচনা করেছি। শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত অধুনালুপ্ত 'বর্ধমান' সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় এবং বর্ধমান সম্মিলনীর রজতবর্ষ স্মরণিকায় আমার লেখা বর্ধমান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সহ এই গ্রন্থে সংযোজিত করেছি। শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী ও অনুকূল চন্দ্র সেন লিখিত 'বর্ধমান পরিচিতি' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত 'কবিগান পাঁচালী ও যাত্রাগানে বর্ধমান' নিবন্ধটিও পরিমার্জিত আকারে এই গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।

পূর্বসূরীদের গ্রন্থের ঋণ আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি। শারদীয় বর্ধমান পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের কোন কোন প্রবন্ধও ব্যবহার করেছি। এ বিষয়েও ডঃ মণ্ডলের কাছে আমি ঋণী। এই গ্রন্থ রচনায় শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী, আমার দুই বৈবাহিক বর্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় ও দুর্গাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন। দুর্গাপুরের দিলীপবাবু একখানি দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে বিশেষভাবে উপকার করেছেন। বর্ধমান নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু তাঁর সম্পাদিত 'বর্ধমান চর্চা' গ্রন্থটির দুটি খণ্ড উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণহরি দে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

সর্বোপরি ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্ণধার শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ, বিশেষতঃ প্রকাশন বিভাগের কর্মী

শ্রীকাশীনাথ পাল ও শ্রীঅসীম তরফদারের উৎসাহে এবং সক্রিয় প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থের সত্বর প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শারীরিক অসুস্থতা হেতু নিজে সমগ্র প্রুফ্ দেখতে না পারায় মুদ্রণপ্রমাদ অনেক রয়ে গেল। এ জন্য পাঠকদের সহৃদয়তা বিশেষভাবে প্রার্থনা করি।

বিনীত

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বণিকনগর

নবদ্বীপ, নদীয়া

১লা বৈশাখ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বৃহদ্বঙ্গের পটভূমিকায় বর্ধমান

গঙ্গারিডে

গ্রীক লেখকগণ গঙ্গারিডে (Gangaridae) নামে একটি দেশের নাম উল্লেখ করেছেন। কুইনটাস্ কার্টিয়াসের মতে ভারতের বৃহত্তম নদী গঙ্গার তীরে বাস করতো গঙ্গারিডে ও প্রাসি (Prasii) নামে দুটি জাতি। কোন পণ্ডিতের মতে প্রাসি শব্দে প্রাচ্য বা পূর্বদেশীয়দের বোঝানো হয়েছে। গঙ্গারিডে নামক জনপদ সম্পর্কে বহুবিধ মত প্রচলিত। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারের মতে গঙ্গাতীরবর্তী মানুষদেরই গঙ্গারিডে বলা হয়েছে।[১] ডঃ বিনয় সেনের মতে বঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র—এই তিনটি বিভাগের বিস্তৃত অঞ্চল গঙ্গারিডে নামে উল্লিখিত।[২] মেগাস্থিনিসের বিবরণ অনুসারে গঙ্গা উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গারিডের পূর্বসীমা গঠন করেছিল।[৩] প্লিনি (Pliny) গঙ্গারিডে কলিঙ্গে একত্রে উল্লেখ করেছেন এবং গঙ্গার সীমান্ত অঞ্চলে স্থাপন করেছেন। সেন্ট্ মার্টিন সাধারণভাবে বঙ্গভূমিকেই গঙ্গারিডে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং প্লিনি যে পার্থলিসকে (Parthalis) গঙ্গারিডের রাজধানী বলেছেন তাকে বর্ধনের (Vardhana) সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করেছেন। এই স্থান প্রাচীনকালে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। বর্ধন বর্তমান বর্ধমানেরই রূপান্তর বা নামান্তর।[৪] ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী গ্রীক লেখকদের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে গঙ্গারিডে বা গঙ্গারাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল এবং প্রাসৈ বা প্রাচ্য রাষ্ট্র গঙ্গা-ভাগীরথী থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমদিকে সমস্ত গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল।[৫] কারো কারো মতে গঙ্গারিডে বা গঙ্গারাষ্ট্র রাঢ় অঞ্চলকেই বোঝাতো।

১। Studies in Geography of Ancient & Medieval India, pp. 173-74.

২। Some Historical Aspects of Some Inscriptions of Bengal, p. 36.

৩। Megasthenis & Arrian, p. 135.

৪। Ptolemy's Ancient India—by Mc.Crindle, Ed. by S. N. Mazumdar Sastri, pp. 173-74.

৫। Indian Antiquities.

স্বাধীনতা-পূর্ব অখণ্ড বঙ্গদেশ প্রাচীন ও মধ্যযুগে পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ ছাড়াও সমতট, হরিকেল, কর্ণসুবর্ণ, গৌড়, বরেন্দ্র এবং রাঢ় নামে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ডঃ বিনয় সেন এই ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— যেমন (১) সুহ্ম, রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণ (২) পুণ্ড্র (পুণ্ড্রবর্ধন), গৌড় ও বরেন্দ্র এবং (৩) বঙ্গ, হরিকেল ও সমতট।

মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত আছে যে মহারাজ যযাতির বংশে পূর্ব-দেশের অধিপতি ক্ষত্রিয় রাজা বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমা পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই পাঁচটি পুত্র প্রাচ্যদেশ অধিকার করে পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন; রাজার নামানুসারে পাঁচটি রাজ্যের নাম হয়েছিল— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে অখণ্ড বঙ্গদেশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন সময়ে রাজ্যগুলির সীমা প্রসারিত বা সংকুচিত হয়েছে। তথাপি বিভিন্ন গ্রন্থ ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে রাজ্যগুলির অবস্থান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। প্রত্ন-নিদর্শনও অনেক সময়ে এ বিষয়ে সহায়তা করে।

পুণ্ড্রবর্ধন ঃ

এই রাজ্যগুলির মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন বহু প্রাচীনকাল থেকে সুপ্রসিদ্ধ জনপদ হিসাবে পরিচিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, সাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে (১৫।২৬), মহাভারতে (১।৫৪।৫২-৫৫, ২।৩০), হরিবংশে (খিল হরিবংশ পর্ব ৩১।৩৩-৪২) এবং রামায়ণে (৪।৯৯।২৩-২৫) পুণ্ড্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের দিগ্বিজয় পর্বে ভীমসেন পূর্বভারত জয়ের সময়ে মোদাগিরি (মুঙ্গের), পুণ্ড্র এবং কৌশিকী কচ্ছ (কোশী নদীর তীরবর্তী ভূভাগ) জয় করেছিলেন। সুতরাং মহাভারতের আমলে পুণ্ড্রগণ উত্তরবঙ্গের উত্তরাঞ্চলে বাস করতেন। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে পুণ্ড্র ভারতের পূর্বপ্রান্তের নগর।

হিউ-এন্-সাঙ্ রাজমহলের নিকট কজঙ্গল থেকে পুণ্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন। এই প্রদেশ ছিল নদীবেষ্টিত। এই নদী অতিক্রম করে তাঁকে কামরূপ যেতে হয়েছিল। এই নদী গঙ্গা। তিনি পুন্-ন-ফ-তন্-ন বা পুণ্ড্রবর্ধন থেকে বৃহৎ নদী পার হয়ে ক য়ো ফু-পো (করতোয়া) নদীর তীরে উপনীত হয়েছিলেন।[১]

১। Watters—On Young Chuang II, p. 184.

পুণ্ড্রবর্ধনের পশ্চিমে ছিল গঙ্গা এবং করতোয়া নদী ছিল পূর্বদিকে। "প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল বগুড়া-দিনাজপুর-রাজশাহী-রংপুর জেলাকে কেন্দ্র করিয়া।"[১] গুপ্ত রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের একটি বিভাগ ছিল কোটিবর্ষ বিষয়। ত্রিকাণ্ড দেশ নামক অভিধান অনুসারে বরেন্দ্র এবং গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামরূপরাজ জয়পালের সিলিমপুর অনুশাসনে, লক্ষ্মণ সেনের তর্পণদীঘি অনুশাসনে এবং মাধাইনগর অনুশাসনে বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনের একটি বিশাল অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। গঙ্গা ও মহানন্দা থেকে পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী, রংপুর জেলার অংশ নিয়ে বরেন্দ্র গঠিত হয়েছিল। প্রায় পুণ্ড্রবর্ধনের সমগ্র অঞ্চলই এক সময়ে বরেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল।[২]

বরেন্দ্র

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৬।১।১৯), বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা (১১।৬-৮) এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গৌড়ের উল্লেখ আছে। ঈশান বর্মণের হরহ লিপি অনুসারে গৌড়ীয়গণ সমুদ্রতীরে বাস করতেন। হিউ-এন্-সাঙ্ তাম্রলিপ্ত থেকে কিয়ে-লো-ন-সু-ফ-ল-ন বা কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন এবং লো-তো-মো-চি বা রাঙ্গামৃত্তিকা বিহার দর্শন করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ গৌড়রাজ শশাংকের রাজধানী ছিল। রাঙ্গামাটি ও কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান কানসোনা) মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহো কাব্য অনুসারে গৌড়রাজ মগধের অধীশ্বর ছিলেন। পরবর্তীকালে পঞ্চগৌড় বলতে বোঝাতো গৌড়, সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল। বর্তমানে গৌড় বলতে বোঝায় মালদহ জেলার একটি অঞ্চল; এক সময়ে গঙ্গা গৌড়ের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হোত। গৌড়েরই অপর নাম লক্ষ্মণাবতী, মুসলমানদের লখ্‌নৌতি। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে লক্ষ্মণাবতী নাম হয়। সময়ে সময়ে গৌড় নাম একটি সহরে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহৎ অঞ্চলে প্রসারিত হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়রাজ্যের সীমা মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত এবং উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। শশাংকের আমলে বঙ্গীয় সাম্রাজ্যই গৌড় নামে অভিহিত হতে থাকে।

গৌড়

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ ১৩৫
২। Historical Aspects of Bengal Inscriptions—Dr. B. C. Sen, p. 112.

বঙ্গ ঃ

ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) প্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়—"বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।" এখানে বঙ্গ ও বগধ বা মগধ একত্রে উল্লিখিত। সিংহলী মহাবংশে বিজয়সিংহের লংকাজয়ের প্রসঙ্গে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ আছে,—"বঙ্গকম্ কার্পাসিকং শ্রেষ্ঠম্।"[১] মহাভারতে দিগ্বিজয় বর্ণনায় পুণ্ড্রের পর বঙ্গ এবং বঙ্গের পর তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে। পুরাণগুলিতে অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গের সঙ্গে বঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এই জনপদগুলি থেকে বঙ্গ স্বতন্ত্র ছিল। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, রামায়ণে ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনা অনুসারে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তাম্রলিপ্ত সুহ্মের অন্তর্গত হয়। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘু দিগ্বিজয়কালে সুহ্মদের পরাজিত করার পর বঙ্গবাসীদের পরাজিত করে গঙ্গাস্রোতের মধ্যে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। প্রত্নলিপিতে বঙ্গের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় নাগার্জুনিকোণ্ডা মন্দির লিপিতে (খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দী) এবং দিল্লীর মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভে চন্দ্র নামক ভূপতির লিপিতে (আঃ ৪০০ খ্রীঃ)।

বৃহৎসংহিতায় (১৪/৮) বঙ্গ ভারতের অগ্নিকোণে অর্থাৎ দক্ষিণপূর্বে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে পূর্বদিকে অবস্থিত। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বলা হয়েছে—

> রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগঃ শিবে
> বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ।

এই শ্লোকে সমুদ্র থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বঙ্গ বলা হয়েছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকায় যশোধর (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) লিখেছেন, "বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ।" অর্থাৎ বঙ্গবাসীরা ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে বাস করেন। আধুনিক কালেও ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পূর্বে মৈমনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা বঙ্গদেশবাসী বা বাঙ্গাল নামে পরিচিত। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন, "মহাভারত, রঘুবংশ, প্রজ্ঞাপনা এবং যশোধরকৃত জয়মঙ্গলা প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে স্পষ্টই মনে হয় যে 'বঙ্গ' দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটি ব্যাপক,

---

১। অর্থশাস্ত্র—২, ১১

অপরটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বলিতে সময়ে সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব হইতে কপিশা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাইত। সংকীর্ণ বঙ্গ, মগধ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম, এমন কি সাগরানুপ হইতেও পৃথক বলিয়া মহাভারতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে' এবং যশোধরের টীকায় 'বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ' প্রভৃতি বাক্যে মনে হয়, বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্বকূলস্থিত ভূখণ্ডই এই সংকীর্ণ বঙ্গ।"[১] বিশ্বরূপ সেনের (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) মদনপাড়া অনুশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গে পিঞ্জোকাষ্ঠি নামে একটি গ্রাম দানের বিবরণ আছে। এই গ্রামটি ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণায় মদনপাড়ার নিকটবর্তী পিঞ্জরি গ্রাম বলে প্রতিপাদিত হয়েছে। সুতরাং ফরিদপুর জেলা বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

জৈন অভিধানকার হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণিতে বঙ্গ ও হরিকেল সমার্থক—"বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়াঃ।" চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং হরিকেলকে (O-li-ki-lo) পূর্ব ভারতের পূর্বতম রাজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। রাজশেখর কর্পূর মঞ্জরীতেও হরিকেলের উল্লেখ করেছেন। কান্তিদেবের (৮ম শতাব্দী) চট্টগ্রাম অনুশাসনে হরিকেল মণ্ডলের উল্লেখ আছে। শ্রীচন্দ্রের (৯ম শতাব্দী) রামপাল (ঢাকা জেলায়) তাম্রশাসনে চন্দ্রদ্বীপকে হরিকেলের অন্তর্গত বলে মনে হয়। এই অনুশাসনটি বিক্রমপুর থেকে প্রচারিত হয়েছিল। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের ইদিলপুর (ফরিদপুর জেলা) তাম্রশাসনে বিক্রমপুর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে বঙ্গের সীমানা বিস্তৃত হয়। পণ্ডিতদের মতে বাখরগঞ্জ জেলা এবং ফরিদপুর ও খুলনা জেলার অংশবিশেষ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে টোডরমল বঙ্গদেশের জমি জরিপ করে শাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন চন্দ্রদ্বীপ সরকার বাকলার একটি পরগণায় পর্যবসিত হয়। আবুল ফজলের মতে বাকলা ও চন্দ্রদ্বীপ সমার্থক।[২]

হরিকেল

চন্দ্রদ্বীপ

ডাকার্ণব গ্রন্থে চৌষট্টি তান্ত্রিক পীঠের অন্যতম হরিকেল, টিক্কর, খাড়ি, রাঢ় এবং বঙ্গাল দেশ পৃথক পৃথক। "এই সব সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে মনে হয়, সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে দশম একাদশ শতক পর্যন্ত বঙ্গ এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু

১। **Studies in Indian antiquities, p. 187-88.**

২। **Historical Geography of Bengal, p. 52.**

স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল ; কিন্তু ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয়।"[১] শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল লিপিতে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপের রাজা বলা হয়েছে। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে চন্দ্রদ্বীপের তারামূর্তি ও মন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে চন্দ্রদ্বীপের ঘাঘরকাট্টি পাটক ঘাঘর নদীর তীরবর্তী ঘাঘরকাটি নামক গ্রাম। ঘাঘর নদীর তীরে ফুল্লশ্রী গ্রামে মনসামঙ্গল রচয়িতা বিজয় গুপ্তের নিবাস ছিল। এই চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে "বিক্রমপুর ও লৌহিত্যের পূর্বতীরস্থ ভূখণ্ড সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গ বা হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।"[৩]

রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপি ও চেদিরাজ কর্ণদেবের গোহরবালি লিপিতে বঙ্গাল নামে দেশের উল্লেখ আছে। "অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় যে, দক্ষিণাপথ ও তুরস্ক দেশাগত ভূপতিগণই মধ্যযুগে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নাম ব্যবহার করেছেন।"[৪] তৃতীয় গোবিন্দের নেসারি লিপিতে

বাঙ্গালা

(৮০৫ খ্রীঃ) বাঙ্গালা দেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালাদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র অবশ্যই চন্দ্রদ্বীপের চন্দ্রবংশীয় রাজা। অবলুর কানাড়ী লিপিতে বঙ্গ ও বাঙ্গালা পৃথক রাজ্য রূপে উল্লিখিত। ডাকার্ণব থেকে জানা যায় যে, হরিকেল ও বাঙ্গালা পৃথক রাজ্য ছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে বঙ্গ ও বাঙ্গালা একই দেশ। এখানকার রাজারা সমগ্র দেশে ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ চওড়া একটি মাটির আল বা বাঁধ দিয়ে জলপ্লাবন নিবারণের চেষ্টা করতেন বলেই বঙ্গ+আল একত্রে বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা নাম হয়। কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে বঙ্গ শব্দের সঙ্গে প্রাকৃত আল যোগ করে নিষ্পন্ন বঙ্গাল শব্দে বঙ্গের অন্তর্গত একটি জেলাকে বোঝানো হয়েছে।[৫] ব্লকম্যান লিখেছেন যে, সুলতান সুজার রাজত্বকালে রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব-পৃঃ ১৪০

২। তদেব পৃঃ ১৪০-৪১

৩। Studies in Indian Antiquities—p. 190.

৪। তদেব পৃঃ ১৮৮

৫। Studies in the Geography of Ancient & Medieval India—Dr. D. C. Sen, p. 32.

বঙ্গালভূম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু Betaev, Sansson, Purchas প্রভৃতি লেখকগণের মানচিত্রে ও গ্রন্থে চট্টগ্রামের অভিমুখে সাগরতীরবর্তী ভূখণ্ডে Bengala নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে অংকিত Gastaldi-র মানচিত্রে Bengala-র উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলই বঙ্গাল বা বাঙ্গালা দেশ ছিল।[১] চন্দ্রবংশের রাজারা এই অঞ্চলেই রাজত্ব করতেন।

প্রবঙ্গ ও উপবঙ্গ

বঙ্গের সীমানা প্রসারিত হওয়ায় প্রবঙ্গ ও উপবঙ্গ নামে দুটি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা অনুসারে উপবঙ্গ দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগ। উপবঙ্গ সম্ভবতঃ নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা।[২] দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে উপবঙ্গ যশোর ও সন্নিকটস্থ আরণ্যক ভূমিকে বুঝিয়েছে। বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া অনুশাসন ও কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে বিক্রমপুর বঙ্গেরই একটি উপবিভাগ। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনে অনুত্তর বঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ নামে আর একটি উপবিভাগের উল্লেখ আছে।

সমতট :

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সীমান্তরাজ্য সমতটের উল্লেখ আছে। বৃহৎসংহিতায় সমতট বঙ্গ থেকে পৃথক রাজ্য (১৪।৬-৮)। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে হিউ-এন্-সাঙ্ কামরূপ থেকে দক্ষিণে ১২০০ বা ১৩০০ লি অতিক্রম করে সন্-মো-ত-ট বা সমতটে উপনীত হয়েছিলেন। এই শতাব্দীর শেষভাগে ইৎ-সিং রাজভট নামে সমতটের রাজার উল্লেখ করেছেন। এই রাজভটকে পণ্ডিতগণ আস্রফপুর লিপির (৭ম শতাব্দী) খড়গবংশীয় রাজরাজভট্ট বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। হিউ-এন্-সাঙের সময়ে সমতট কামরূপের দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউ-এন্-সাঙ্ সমতট থেকে তাম্রলিপ্তি গিয়েছিলেন। ত্রিপুরাও সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজরাজভট্টের রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা। ফার্গুসনের মতে হিউ-এন্-সাঙের সমতট ছিল ঢাকা জেলায়, যার প্রাচীন রাজধানী ছিল সোনার গাঁও। Watters-এর মতে হিউ-

১। **Historical Geography of Bengal, p. 63.**
২। **Historical Aspects of Bengal Inscription—Dr. B. C. Sen, p. 85.**

এন্-সাঙের সমতট ফরিদপুর জেলায়। প্রথম মহীপালের (১০ম শতাব্দী) বাঘাউড়াতে (ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া সহরের নিকটবর্তী গ্রাম) প্রাপ্ত নারায়ণ বিগ্রহের লিপিতে সমতটের উল্লেখ আছে। এই লিপিতে সমতটের অন্তর্গত বিলিকন্দক গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রামকে বাঘাউড়ার নিকটবর্তী ত্রিপুরা জেলার বিলকিন্দুয়াই গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। দামোদর দেবের অপ্রকাশিত মেহার পট্টোলি থেকে ত্রিপুরা জেলাকেই সমতটের কেন্দ্র বলে অনুমিত হয়। বিজয় সেনের ব্যারাকপুর লিপিতে সমতটীয় মাপের দ্বারা (সমতটীয় নলেন) খাড়ী বিষয় মাপার উল্লেখ আছে। মনে হয়, খাড়ী বিষয় সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণ সেনের সুন্দরবন তাম্রলিপিতে খাড়ী মণ্ডলের উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় খাড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। ডঃ বিনয় সেনের মতে ২৪ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] জেনারেল কানিংহামের মতে গঙ্গার মূল স্রোত (পদ্মা) ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী বদ্বীপ সমতটের অন্তর্গত ছিল —"From all these concurrent facts it is certain that Samatata must be the Delta of the Ganges, and as the country is described as 300 li or 500 miles in circuit it must have included the whole of the present delta or triangular tract between the Bhagirathi and the main stream of the Ganges."[২]

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "সমতটের অর্থই হইতেছে তটের সঙ্গে যাহা সমান অর্থাৎ সমুদ্রশায়ী নিম্নদেশ। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্বতীর হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মেঘনা-মোহানা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূখণ্ডকেই বোধ হয় বলা হইত সমতট। মুসলমান ঐতিহাসিকদের এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ভাটি, তারানাথের বাটি।"[৩]

সাগরতীরবর্তী সমতট রয়াল বেঙ্গল টাইগার অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এই অঞ্চল ব্যাঘ্রতটী নামে পরিচিত। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে, দেবপালের নালন্দা অনুশাসনে, লক্ষ্মণ সেনের আনুলিয়া

১। Historical Aspects of Bengal Inscriptions.

২। Ancient Geography of India, p. 576.

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, পৃঃ ১৪২

তাম্রশাসনে ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের অন্তর্গত মহন্তা প্রকাশ বিষয়ে ক্রৌঞ্চশ্বভ্র গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গে বাগড়ী নামে একটি স্থান আছে। সংস্কৃত ব্যাঘ্রতটী থেকে প্রাকৃতে বগ্‌ঘাড়ি বা বঘাডি থেকে বাঙ্গালায় বাগড়ী হওয়া সম্ভব। ব্যাঘ্রতটী বা বাগড়ী আধুনিক কলিকাতা শহর সহ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ব-দ্বীপ নিয়ে গঠিত। ব্যাঘ্রতটীর পূর্বাংশ বঙ্গ বা হরিকেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের দ্বারা এই অংশ শাসিত হয়েছিল।[১]

ব্যাঘ্রতটী

হরিপাল দেবের ময়নামতী তাম্রশাসনে (১২১৯-২০ খ্রীঃ) পট্টিকেরা নগরে একটি বৌদ্ধ মঠ প্রদানের উল্লেখ আছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত অষ্ট-সাহস্র প্রজ্ঞাপারমিতার পাণ্ডুলিপিতে একটি ষোড়শভুজা দেবীর সঙ্গে লিখিত আছে, "পট্টিকেরে চুণ্ডাবর ভবনে চুণ্ডা"। কুমিল্লা জেলায় ময়নামতি পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পরগণা পাটিকারা বা পৈতকার। পট্টিকেরা বা পট্টিকের নাম সহ মুদ্রার আবিষ্কার খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে পট্টিকেরা রাজ্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে।[২] ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমায় চুণ্টা নামে একটি গ্রাম আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় চণ্ডা দেবী ও চুণ্ডা গ্রামের মধ্যে সংযোগ অনুমান করেছেন। তাঁর মতে সমতটের প্রধান কেন্দ্র ত্রিপুরা জেলা খ্রীঃ ১১শ থেকে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত পট্টিকেরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩]

পট্টিকেরা

সুহ্ম ঃ

উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণ বঙ্গের বিবরণ পুণ্ড্রবঙ্গ-সমতটে পাওয়া যায়। মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের বিবরণ সুহ্ম ও রাঢ় দেশের পরিচয়ের মধ্যে নিহিত আছে। পুণ্ড্রবর্ধনের মত প্রাচীন না হলেও মহাভারতের যুগ থেকে সুহ্মদেশ পরিচয়ের সীমানায় উপনীত হয়েছে। ভীমসেনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুহ্ম দেশের উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। ভীম বিদেহ দেশ (উত্তর বিহার) জয় করার পরে কিরাত দেশে (নেপাল ?) এসেছিলেন। তৎপরে তিনি সুহ্ম এবং প্রসুহ্ম জয়

১। Historical Aspects of Bengal Inscriptions, pp. 98-101.

২। Historical Geography of Bengal—Amitabha Bhattacharya-pp. 70-71

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, পৃঃ ১৪১

করে মগধ, গিরিব্রজ (রাজগীর) এবং অঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তৎপরে তিনি মোদাগিরির (মুঙ্গের) রাজাকে বধ করে কৌশিকী নদীর তীরবর্তী পুণ্ড্রদেশ জয় করেন। অতঃপর তিনি বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং কর্বট জয় করে পুনরায় সুহ্মদেশের রাজাকে পরাজিত করে সমুদ্রতীরবর্তী জনগণকেও পরাজিত করেন এবং লৌহিত্যের (ব্রহ্মপুত্র) তীরে উপনীত হন। এ থেকে বোঝা যায় যে সুহ্ম সমুদ্র এবং তাম্রলিপ্তের (তমলুক) নিকটবর্তী ছিল। সুহ্ম অবশ্যই গঙ্গার পূর্বতীরে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ডঃ বিনয় সেনের মতে মহাভারতের আমলে সুহ্মর পশ্চিমে ছিল মগধ (পশ্চিম বিহার), উত্তরে নেপাল, পূর্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে রঘু দিগ্বিজয়কালে ভাগীরথী অতিক্রম করে সমুদ্রতীরবর্তী সুহ্মদেশ জয় করেছিলেন।

সুহ্মদেশ

বরাহ মিহির বৃহৎসংহিতায় ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে সুহ্ম-দেশের উল্লেখ করেছেন (১৪।৫)। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় আর্যাবর্তের পূর্বদেশীয় জনপদের মধ্যে সুহ্ম-দেশের উল্লেখ আছে (১৭ অঃ)। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভুবনকোষ অধ্যায়ে (৫৮ অঃ) ও সুহ্ম পূর্বাঞ্চলীয় জনপদের মধ্যে অবস্থিত ছিল। দণ্ডীর দশকুমারচরিতানুসারে দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত সুহ্ম-দেশের অন্তর্গত ছিল। কালিদাসের রঘুবংশে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ না থাকায় ডঃ বিনয় সেনের অনুমান, তাম্রলিপ্ত কালিদাসের সময়ে সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল (১ম) দণ্ডভুক্তি আক্রমণ করেছিলেন। সে সময়ে মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ এবং উড়িষ্যার উত্তরাংশ দণ্ড ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ধোয়ীর পবনদূত কাব্যে সুহ্ম গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত—

গঙ্গা-বীচি প্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।[২]

—ঊর্ধ্বে যাত্রাপথে গঙ্গার তরঙ্গ-বিধৌত, সৌধমালায় অলংকৃত আনন্দময় সুহ্মদেশ দেখে বিস্মিত হবেন।

এই সুহ্মদেশেই অধিষ্ঠিত ছিলেন সেনরাজাদের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ

১। Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, p. 40.
২। পবনদূত—২৭

বিগ্রহ। এখানেই অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের বিগ্রহও প্রসিদ্ধ ছিল, গঙ্গাতীরে বল্লাল সেনের রাজধানী বিজয়পুরও অবস্থিত ছিল।[১]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, সাংখ্যায়ন শ্রৌত সূত্রে (১৫।২৬), মহাভারতে, হরিবংশে, রামায়ণে এবং জাতক-কল্প সূত্রে সুহ্ম সুপরিচিত নাম। মহাভারতে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— .

পাণ্ডুনা মিথিলাং গত্বা বৈদহাঃ সমরে জিতাঃ
ততঃ কাশীষু সুহ্মেষু পৌণ্ড্রেষু চ নরর্ষভ !
বিজিত্য পৃথিবীপালান্ কুরূণামকরোদ্ যশঃ ॥[২]

—পাণ্ডু মিথিলা গমন করে বিদেহবাসীদের যুদ্ধে জয় করেছিলেন। তারপর কাশী, সুহ্ম ও পৌণ্ড্রদেশের রাজাদের জয় করে কুরুবংশের যশ বিস্তার করেছিলেন।

সুহ্মের পরই পুণ্ড্রের উল্লেখ থেকে মধ্য-বঙ্গকেই সুহ্ম বলে মনে হয়। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) বঙ্গ ও পুণ্ড্রের সঙ্গে সুহ্ম দেশের নাম উল্লিখিত হয়েছে (৪।২।৫২)। জৈন আয়রঙ্গ সুত্ত অনুসারে মহাবীর বর্ধমান বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমির মধ্যে লাঢ়দেশ (রাঢ়দেশ) ভ্রমণ করেছিলেন। সুতরাং বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমি (সুহ্মভূমি) রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ সুহ্ম রাঢ়ের দক্ষিণাংশের নাম ছিল, পরে এই অংশের নাম হয় দক্ষিণ রাঢ়।[৩] কখনও কখনও সুহ্ম বলতে সমগ্র রাঢ়কেই বোঝাতো।[৪] নীলকণ্ঠ মহাভারতের সভাপর্বের টীকায় রাঢ় ও সুহ্মকে সমার্থক বলে গণ্য করেছেন। ক্রমে সুহ্মনাম অপ্রচলিত হয়ে যায়। রাঢ় নাম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

মিন্হাজ্ উদ্দিন সিরাজের তবকাৎ-ই-নাসিরি অনুসারে রাল বা রাঢ় গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত। বারোজের (Barros) (১৪৯৬-১৫৭০) মানচিত্রে 'রার' গৌড়ের বা লক্ষ্মণাবতীর বিপরীত দিকে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। সিংহলী

রাঢ়-দেশ

বৌদ্ধ মহাবংশ ও দীপবংশ থেকে জানা যায় যে রাজা সিংহবাহু লালের (রাঢ়ের) রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সিংহপুরে। সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ লংকা জয় করে সিংহল নামে পরিচিত

১। পবনদূত— ২৮-৩১
২। মহা আদি ১০৭/২৮-২৯
৩। Historical Geography of Anct. & Medieval Bengal, p. 48.
৪। কল্পনা-মঞ্জরী—রাজশেখর, ১ম অংশ

করেছিলেন। জৈন আচারাঙ্গ সূত্র অনুসারে মহাবীর রাঢ় অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়ে। এই অঞ্চলের মানুষ মহাবীরকে অসম্মানিত করেছিল। ডঃ বিনয় সেনের মতে আচারাঙ্গ সূত্রের বজ্জভূমি বীরভূমি বা বীরভূম হওয়া অসম্ভব নয়।[১] তিনি মনে করেন জৈন গ্রন্থের রাঢ় সাহাবাদের পূর্বে গয়ার দক্ষিণ থেকে ভাগলপুর ও পশ্চিমে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২] ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের মতে রাঢ় ভাগীরথীর পশ্চিমে বর্ধমান বিভাগের বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে গঠিত ছিল।[৩] ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তি অনুসারে রাঢ় ছিল রুক্ষ জলহীন দেশ। বর্ধমান বিভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম/একাদশ শতাব্দীতে রাঢ় উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজেন্দ্র চোলের (১০ম/১১ম শতাব্দী) তিরুমালাই লিপিতে উত্তর লাড়ম্ (উত্তর রাঢ়) ও তক্কণ লাড়ম্ (দক্ষিণ রাঢ়) এর উল্লেখ আছে।

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বজ্জভূমিকে বর্ধমান বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। "জৈনদিগের সর্বপ্রধান অঙ্গ আচারাঙ্গ সূত্রে যে বজ্জভূমি ও সুব্‌ভভূমির উল্লেখ আছে, তাহাই আমাদের পুরাণে বর্ধমান ও সুহ্ম নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীন কালে প্রায় খ্রীষ্টপুর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ধমান রাঢ় দেশেরই অন্তর্গত ছিল।[৪]

রাঢ় ও বর্ধমান

মার্কণ্ডের পুরাণে (৫৮।১৪) কূর্মাকৃতি ভারতের মুখে তাম্রলিপ্ত ও পাদদেশে বর্ধমানের উল্লেখ আছে—বর্ধমানাঃ কোশলাশ্চ মুখে কূর্মস্থ সংস্থিতাঃ। বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় ভারতবর্ষের পূর্বদিকে পুণ্ড্র, উৎকল কাশী, তাম্রলিপ্ত, কোশল, বর্ধমান প্রভৃতির উল্লেখ আছে,—একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকা বর্ধমানশ্চ।[৫] উক্ত গ্রন্থে নর্মদার পূর্বে ওড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, বাহ্লিক, প্রাগ্‌জ্যোতিষ বধমান প্রভৃতির অবস্থান উল্লিখিত হয়েছে—পুণ্ড্রা গোলাঙ্গুল শ্রীপর্বত বর্ধমানাশ্চ।[৬] মহাভারতে বর্ধমানের উল্লেখ

১। Hist. Aspects of Inscriptions of Bengal, p. 53.
২। i bid—p. 55.
৩। Hist. Gco. of Anct & Medieval Bengal, p. 49.
৪। বর্ধমানের পুরা কথা—বর্ধমান বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—১৩২১।
৫। বৃহৎ-সংহিতা—১৪।৭
৬। তদেব—১৬।৩

পাওয়া যায় না। কিন্তু ভীমসেনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও সুহ্ম এবং সাগরবাসী ম্লেচ্ছদের কথা বলা হয়েছে (আদিপর্ব ১০৪ অঃ)। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "বরাহমিহিরের সময়ে যে স্থান সুহ্ম ও বর্ধমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে সেই উভয় স্থানই একত্র রাঢ় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।"[১] ডঃ নীহাররঞ্জন রায় দক্ষিণ রাঢ়ের সীমা সম্পর্কে লিখেছেন, "গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী দক্ষিণতম ভূখণ্ড অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বহুলাংশ এবং হাবড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম জনপদ ; মোটামুটি ইহাই পরবর্তীকালের দক্ষিণ রাঢ়।" দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে (খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী) রাঢ় দেশের দক্ষিণ সীমায় দামোদর নদ অবস্থিত—"দামোদরোত্তরভাগে রাঢদেশঃ প্রকীর্তিতঃ।"[২]

বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে বাল্লহিট্টঠা, জলশোঠ, খাণ্ডবিল্লা, অম্বয়িল্লা এবং মোলাদণ্ডী গ্রামের উল্লেখ আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে "বাল্লহিট্টঠা বর্ধমান জেলার উত্তর সীমায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত নৈহাটির ৬ মাইল পশ্চিমে বালুটিয়া গ্রাম, অন্যান্য গ্রামগুলি বর্তমান-মুর্শিদাবাদ জেলার যোগসীমায়।"[৩]। নৈহাটী লিপি অনুসারে উত্তর রাঢ় বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত। উত্তর রাঢ়ের সীমা সম্পর্কে ডঃ রায় লিখেছেন, "বর্ধমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ কাঁদি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা (সাঁওতাল ভূমি সহ), এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইয়া উত্তর রাঢ়। মোটামুটি অজয় নদী এই উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা এবং দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা।"[৪] তিনি আরও লিখেছেন, "অকাট্য লিপি প্রমাণ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঙ্গা-ভাগীরথীই রাঢ়ের উত্তরতম সীমা……।"[৫]

কৃষ্ণ মিশ্রের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে গৌড় দেশের অন্তর্গত নিরুপমা নগরী রাঢ়া পুরীর উল্লেখ আছে।[৬] প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দুর্গাপুরের মুচিপাড়া থেকে চার মাইল উত্তরে আঢ়া বা আড়রা গ্রামই রাঢ়াপুরী।[৭] আঢ়া বা আড়া গ্রামে রাঢ়ের অধীশ্বর কর্তৃক রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির

১। বর্ধমানের পুরাকথা—বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান অধিবেশন—১৩২১
২। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব—১৩৫৯, পৃঃ ১৪৬
৩-৫। তদেব পৃঃ ১৪৯
৬। সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩১১
৭। দুর্গাপুরের ইতিহাস—পৃঃ ৩৮-৩৯

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্গাপুর থেকে ছয় কি. মি. উত্তরপূর্বে কাঁকসা থানার অধীনস্থ আড়া গ্রামের পূর্বপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি ধ্বংস স্তূপ আছে এবং আড়া থেকে শিবপুর যাওয়ার পথে রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান।[১] খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গুপ্তরাজাদের আমলে অখণ্ড বঙ্গভূমিতে যে চোদ্দটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে একটি ছিল বর্ধমান জেলায়। তখনকার বঙ্গভূমি প্রধানতঃ দুটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশকে তখন বলা হোত ভুক্তি। প্রধান নগরের নামানুসারে ভুক্তি দুটির নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি ও বর্ধমান ভুক্তি। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরও দুটি

ভুক্তি বিভাগ

ভুক্তির কথা জানা যায়—কঙ্কগ্রাম ভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি। কঙ্কগ্রাম ভুক্তির অধিকাংশই ছিল প্রাচীন কজঙ্গল। দণ্ডভুক্তির অনেকটা ছিল প্রাচীন ওড্রে। গোপচন্দ্রের রাজত্বকালের মল্লসারুল তাম্রলিপি বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে পাওয়া গেছে।[২] কজঙ্গল-ভুক্তি বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ, বীরভূম জেলার দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরাংশ এবং বিহারের সাঁওতাল পরগণার সন্নিহিত অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল।[৩] হিউ-এন্-সাঙের বিবরণ অনুসারে হর্ষবর্ধন গৌড়রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে কজঙ্গলে কিছুকাল যাপন করেছিলেন। বল্লাল সেনের নৈহাটী অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, উত্তর রাঢ় মণ্ডলের অন্তর্গত স্বল্প দক্ষিণ বীথিতে বাল্লহিট্‌ঠা গ্রাম বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাল্লহিট্‌ঠাকে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বালুটিয়া গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়।[৪]

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা গোপচন্দ্রের আমলের মল্লসারুল লিপি, ১০ম শতাব্দীর ইর্দা লিপি এবং বল্লাল সেনের নৈহাটী ও গোবিন্দপুর লিপিতে বর্ধমান

বর্ধমান ভুক্তি

ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইর্দা তাম্রশাসনে দেখা যায় যে খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীতে দণ্ডভুক্তি মণ্ডল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যদল দক্ষিণ রাঢ়ে অবস্থিত দণ্ডভুক্তি বিধ্বস্ত করেছিল। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর

১। বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩
২। বঙ্গভূমিকা - ডঃ সুকুমার সেন —পৃঃ ৫১-৫২
৩। তদেব - পৃঃ ১২
৪। Historical Geography of Bengal.

রামচরিতে দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের উল্লেখ আছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় দণ্ডভুক্তি মণ্ডল সম্পর্কে লিখেছেন, "দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর (প্রাচীন মিথুনপুর) জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ, বর্তমান দাঁতন প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতিবহ।"[১] ডঃ রায়ের মতে দক্ষিণ রাঢ় মণ্ডল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল।[২] খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল রাজাদের আমলেও দণ্ডভুক্তি বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল।

ইর্দা লিপি বালাসোর জেলার ইর্দা গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই লিপি থেকে জানা যায় যে বালাসোর জেলা (অন্ততঃ আংশিকভাবে) বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলা এবং দক্ষিণ বালাসোর জেলা পর্যন্ত বর্ধমান ভুক্তির সীমানা প্রসারিত হয়েছিল। ইর্দা লিপিতে প্রদত্ত গ্রামের নাম চত্তিবন্না। ডঃ ননীগোপাল মজুমদার মেদিনীপুরে সুবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত চাতনা গ্রামের সঙ্গে চত্তিবন্নাকে অভিন্ন মনে করেছেন।[৩]

কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে (১১শ শতাব্দী) এবং শ্রীধরাচার্যের ন্যায় কন্দলীতে (৯৯১ খ্রীঃ) দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভোজ বর্মণের (১১শ শতাব্দী) বেলাব তাম্রশাসনে এবং বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ়ের উল্লেখ আছে। বেলাব লিপিতে উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতেও (১১শ শতাব্দী) উক্ত গ্রামের উল্লেখ আছে। বীরভূম জেলার লাভপুর থানার অন্তর্গত সিদ্ধন গ্রামের সঙ্গে সিদ্ধল গ্রামের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। এই গ্রাম অবশ্যই বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে উল্লিখিত ভূরি-শ্রেষ্ঠিক আধুনিক হুগলী জেলায় দামোদরের তীরে অবস্থিত ভুরসুট গ্রাম, কবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ধমান জেলার নবগ্রাম ও দামিন্যা গ্রামের উল্লেখ করেছেন। নয়পালের ইর্দা লিপিতে উল্লিখিত বর্ধমান ভুক্তিতে অবস্থিত বৃহৎ ছত্তিবন্না ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম অথবা সুবর্ণরেখা তীরবর্তী ছাতনা গ্রাম।[৪]

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ১৫০
২। তদেব
৩। Inscriptions of Bengal, vol. III
৪। বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব

বল্লাল সেনের নৈহাটী লিপিতে কাটোয়ার নিকট বালহিট্টা নৈহাটী থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী বালুটিয়া গ্রাম। লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর লিপিতে বিড্ডার শাসন নামে একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত,—বর্তমানে হাওড়া জেলার বেতড় গ্রাম। দণ্ডীর দশকুমার চরিত-এ দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত (তমলুক) বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত (৬ উচ্ছ্বাস)।

গুপ্তরাজাদের আমলে বঙ্গভূমির পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমান ভুক্তি—এই দুই ভুক্তির বিষয়ে জানা যায়। মহারাজ গোপচন্দ্রের মল্লসারুল লিপি থেকে বর্ধমান ভুক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বর্ধমান ভুক্তি গোপচন্দ্রের পূর্বে বৈন্যগুপ্তের সময়েও বিদ্যমান ছিল।[১] মল্লসারুল লিপিতে বর্ধমানভুক্তির শাসনকর্তা ছিলেন উপরিক। উপরিকের অধীনস্থ ভোগপতিক, পত্তনক, চৌরোদ্ধরণিক, আবসথিক, হিরণ্যসামুদায়িক, ঔদ্রঙ্গিক, ঔর্ণস্থানিক (রেশম বস্ত্র শিল্পের অধিকর্তা) কার্তাকৃতিক, দেবদ্রোণীসম্বন্ধ, কুমারামাত্য, আগ্রহারিক, তদাযুক্তক বাহনায়ক (যানবাহনের অধিকর্তা) এবং বিষয়পতি উপাধিকারী রাজ-কর্মচারীদের উল্লেখ আছে।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের আমলে বর্ধমান ভুক্তিকে ভেঙ্গে উত্তরে কঙ্কগ্রাম ভুক্তি ও দক্ষিণে বর্ধমান ভুক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। দণ্ডভুক্তির কোন উল্লেখ এই সময়ে পাওয়া যায় না। নৈহাটী তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বর্ধমান ভুক্তি উত্তর রাঢ় মণ্ডল অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড় ছিল। রাঢ় অঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশই বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। সুতরাং ভাগীরথীর পশ্চিমে বিস্তৃত অঞ্চল ছিল বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে মেদিনীপুর ও বালাসোর জেলা বর্ধমান ভুক্তির মধ্যে গণ্য হয়েছে (ইর্দা লিপি)। উত্তর রাঢ়ের কেন্দ্র ছিল বর্ধমান ভুক্তি।

প্রাচীনকালে সমগ্র বঙ্গভূমি ও মগধ একই শাসনের অধিকারে ছিল। বৈদিক গ্রন্থাদিতেও প্রাচ্য দেশের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুহ্ম, প্রসুহ্ম, পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এবং সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। রামায়ণের পূর্বদেশীয় সংস্করণে বঙ্গ দশরথের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২] বৌদ্ধ এবং জৈন

পূর্বভারতের অধিকার

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃঃ ৩৯৭
২। অযোধ্যাকাণ্ড ১০।৩৬-৩৭

গ্রন্থ অনুসারে বঙ্গ এবং রাঢ় খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথক রাজ্য হিসাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাম্র ও রৌপ্য নির্মিত প্রাচীন ছাপ দেওয়া মুদ্রা (Punch Marked Coins) তমলুক, ২৪ পরগণা ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। গ্রীক বীর আলেক্‌জাণ্ডারের সময়ে প্রাসি (prasii) এবং গঙ্গারিডে দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। গঙ্গা তীরবর্তী গঙ্গারিডে বা গঙ্গারাষ্ট্র শক্তিশালী রাজ্য ছিল।

মৌর্য সম্রাট অশোককে কলিঙ্গজয় কালে অবশ্যই গঙ্গারিডেকে পদানত করতে হয়েছিল। দিব্যাবদান অনুসারে পুণ্ড্রবর্ধন অশোকের রাজ্যান্তর্গত ছিল। উত্তরবঙ্গে মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের অনুশাসনে পুণ্ড্রবধনে অশোকের রাজত্বের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউ-এন্-সাঙ্ (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অশোক নির্মিত বৌদ্ধ স্তূপ দেখেছিলেন। একটি স্তূপ ছিল পুণ্ড্রবর্ধনে একটি তাম্রলিপ্তির নিকটে, অপরটি ছিল সমতটে, আর একটি ছিল কর্ণসুবর্ণে (কানসোনা— মুর্শিদাবাদ)। কর্ণ-সুবর্ণ বা রাঙামাটিতে বুদ্ধদেব স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। অশোক সিংহলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন অবশ্যই তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে। সুতরাং সমগ্র বঙ্গদেশ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে অনুমিত হয়।

বঙ্গদেশে অশোকের অধিকার

অশোকের পরে মৌর্যসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে বঙ্গদেশ মগধের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা ছিল বলে মনে হয়। কলিঙ্গরাজ খারবেলের রাজত্বকালে (খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) সম্ভবতঃ বঙ্গদেশ কলিঙ্গের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে বঙ্গের নাম উল্লিখিত হয়নি। সুতরাং খারবেলের সঙ্গে রাঢ়বঙ্গের মিত্রতার সম্পর্ক উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে বজ্র বা বজ্জভূমির (ব্রহ্মভূমি = রাঢ়) সঙ্গে খারবেলের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।[১]

খারবেলের সময়ে রাঢ়

গয়া, মগধ এবং বঙ্গভূমিতে কুষাণ সাম্রাজ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ছোটনাগপুরের পাঁজি জেলায় কণিষ্ক এবং হুবিষ্কের মুদ্রা পাওয়া গেছে। তমলুক ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কণিষ্ক ও বাসুদেবের মুদ্রা পাওয়া গেছে। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) বিবরণ

বঙ্গে কুষাণ অধিকার

১। Historical Aspects of Bengal Inscriptions, pp. 168-77, 191.

অনুসারে পাটলিপুত্রও তাম্রলিপ্ত মণ্ডলাধিপতির শাসনে ছিল। মণ্ডলাধিপতি কুষাণরাজের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গভূমি শাসন করতেন।[১]

কুষাণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে বঙ্গদেশ সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে গুপ্ত সম্রাটের বিজিত রাজ্যের মধ্যে সমতট, কামরূপ (আসাম) ও নেপালের উল্লেখ আছে। এই প্রশস্তিতে ডবাক রাজ্যকে কোন কোন পণ্ডিত ঢাকা বলে মনে করেন। সুতরাং এই সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। দিল্লীর নিকটবর্তী মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভের লিপি অনুসারে চন্দ্র বঙ্গবাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন—বঙ্গেস্বাহববর্তিনো ভিলিখিতা খড়্গেন কীর্তিভুজে। সম্ভবতঃ সমগ্র গৌড়বঙ্গই এই চন্দ্ররাজার অধিকারভুক্ত ছিল। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে লিখিত লিপিতে মহারাজা সিংহবর্মন বা সিন্ধবর্মনের পুত্র পুষ্করণের অধিপতি মহারাজা চন্দ্র বর্মনের কীর্তি বর্ণিত হয়েছে। দুটি অনুশাসনের লিপিই গুপ্তযুগের। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মেহেরৌলি অনুশাসনের চন্দ্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, মতান্তরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। মনে হয় পুষ্করণের (বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের ২৫ মাইল উত্তরপূর্বে দামোদরের তীরে পোখরন্) চন্দ্রবর্মন সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক। পণ্ডিতদের মতে সিংহবর্মন পুষ্করণের স্বাধীন রাজা ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে চন্দ্রবর্মনের পরাজয় বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি পুষ্করণের অধিপতি হওয়া অসম্ভব নয়। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বিজিত রাজ্যের তালিকায় ডবাক রাজ্যের উল্লেখ আছে। ডঃ ফ্লিটের (Fleet) মতে ডবাক ঢাকা। এছাড়া কামরূপ ও সমতট সমুদ্রগুপ্তের বিজিত রাজ্যের তালিকায় বর্তমান।

গুপ্ত অধিকার

বঙ্গে গুপ্ত রাজাদের অধিকার

দামোদরপুর লিপি থেকে জানা যায় যে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি গুপ্তসাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এবং উপরিকের দ্বারা শাসিত হোত। সুতরাং বর্ধমানভুক্তি সহ সমগ্র বঙ্গদেশই সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীন ছিল বলে মনে হয়। স্কন্দগুপ্তের আমলেও বঙ্গদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমাদিত্য উপাধিধারী স্কন্দগুপ্তের একটি দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া গেছে। স্কন্দগুপ্তের কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা হুগলী জেলার মহানাদে আবিষ্কৃত হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের সমাপ্তিকাল ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্কন্দগুপ্তের সময়ে অথবা পরে তাঁর

১। Ibid—P. 198.

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কিছুকাল বঙ্গ ও বিহারে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।

পুরুগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্ত (তৃতীয়) রাজা হন ৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। কুমারগুপ্ত (তৃতীয়) এবং তাঁর পিতা নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের মুদ্রা কালিঘাটে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের রাজ্যকাল ৪৬৭-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। এরপর কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের (২য়) পুত্র বুধগুপ্ত রাজা হন। বুধগুপ্তের আমলেও পুণ্ড্রবর্ধনে গুপ্ত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তরবঙ্গে দামোদরপুরে প্রাপ্ত দুটি অনুশাসন এবং রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একটি অনুশাসন এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। পাহাড়পুর অনুশাসনে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে বট গোহলি নামে একটি গ্রামদানের বিবরণ আছে। বুধগুপ্তের আমলেও গুপ্তরাজাদের শাসনপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ এই সময়ে উপরিক ব্রহ্মদত্তের শাসনাধীন ছিল। বুধগুপ্তের পরে বৈন্যগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে বৈন্যগুপ্ত বঙ্গদেশে রাজত্ব করতেন, ভানুগুপ্ত মালবে এবং নরসিংহগুপ্ত মগধে।[১] ত্রিপুরা জেলার গুনাইঘরে প্রাপ্ত অনুশাসনে সমতটে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে। বৈন্যগুপ্ত ৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।[২]

যদিও রাঢ় বা বর্ধমান অঞ্চলে গুপ্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নেই, তথাপি সমুদ্রগুপ্ত যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাতে সমগ্র বঙ্গদেশ—পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, রাঢ় সবই তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল বলে মনে করা অযৌক্তিক হবে না। বৈন্যগুপ্ত পর্যন্ত এই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়। বুধগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তাচলের পথে অগ্রসর হতে থাকে। তথাপি পরবর্তী গুপ্তরাজাদেরও শাসন বঙ্গদেশে ছিল বলে অনুমিত হয়। দ্বাদশাদিত্য ভানুগুপ্ত (৩য়) এবং বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্যের মুদ্রা কালিঘাটে পাওয়া গেছে। হূণ আক্রমণ ও মৌখরী রাজবংশের উত্থান পরবর্তী গুপ্তরাজাদের পক্ষে বিপদের কারণ হয়েছিল। মৌখরীরাজ ঈশান বর্মন দামোদর গুপ্তকে পরাজিত ও নিহত করেন আঃ ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। হরহ অনুশাসন (৫৫৪ খ্রীঃ) অনুসারে মৌখরীরাজ সমুদ্রতীরবর্তী গৌড়বাসীদের (গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ান্) পরাজিত করেছিলেন। মৌখরীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত

১। Bakataka Gupta age,—p-176.
২। Ibid—p, 194.

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ গৌড়ে আধিপত্য করতেন। তৃতীয় কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে শূলিক (বা চালুক্য) এবং মৌখরীরা পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই সময় প্রয়াগ থেকে পুণ্ড্রবর্ধন এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত গৌড় সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।[১]

পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের শাসনকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ বা পুণ্ড্রবর্ধন, কিন্তু তাঁদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল সমুদ্র পর্যন্ত। বৈন্যগুপ্তের মৃত্যুর অল্প পরে বঙ্গদেশ স্বাধীন হয় এবং কয়েকটি স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। এই সময়ে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথক একটি রাজবংশের উত্থান ঘটেছিল। ফরিদপুর জেলায় চারটি ও ও বর্ধমান জেলার দামোদর তীরবর্তী মল্লসারুল গ্রামে একটি অনুশাসন পাওয়া গেছে। দুটি অনুশাসনে মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ফরিদপুরের একটি অনুশাসনে এবং মল্লসারুল লিপিতে গোপচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র বর্ধমান ভুক্তির অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ করদ নৃপতি ছিলেন মহারাজ বিজয় সেন। তাঁর রাজ্য অন্ততঃপক্ষে ফরিদপুর থেকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ডঃ হর্ণাল (Hoernle) এবং পার্জিটারের মতে গোপচন্দ্র নরসিংহ বালাদিত্যের পৌত্র এবং কুমার গুপ্তের পুত্র। তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে গোবিন্দচন্দ্র বালাদিত্যের পৌত্র ছিলেন।

রাজা গোপচন্দ্র

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শতাব্দীতে কর্ণ-সুবর্ণ গৌড়ের রাজধানী ছিল। একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে মহারাজ জয়নাগ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে গৌড়াধিপতি জয়নাগের উল্লেখ আছে। জয়নাগ এবং তাঁর পুত্র গৌড়রাজ শশাংকের অল্প কিছুকাল পূর্বে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে সম্ভবতঃ জয়নাগের আমলেই মৌখরীরাজ ঈশান বর্মন গৌড়ীয়দের সমুদ্রতটের দিকে বিতাড়িত করেছিলেন।[২]

কর্ণ-সুবর্ণ

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মগধে রাজত্ব করেছিলেন পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশ। কিন্তু রাজবংশের মধ্যে পারস্পারিক সংঘাত ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে এই বংশের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়।

১। Historical Aspets of Bengal Inscriptions, p-246.

২। History of North Eastern India, p. 112.

বাক্‌পতি রাজের প্রাকৃত মহাকাব্য 'গৌড়বহো'-তে কনৌজের রাজা যশোবর্মণ (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ) কর্তৃক গৌড়রাজের পরাজয় ও হত্যা বর্ণিত হয়েছে। এই সময়ে গৌড় ও মগধ একই শাসনের অধীনস্থ ছিল। এই গৌড় মগধের অধিপতি পরবর্তী গুপ্ত রাজবংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় জীবিত গুপ্ত বলে অনুমান করা হয়েছে।[১] যশোবর্মণ সমুদ্রতট পর্যন্ত বিহার ও বঙ্গ অধিকার করেছিলেন। যশোবর্মণের দিগ্বিজয়কাল ৭২৫-৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।[২]

শশাংকের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ—উত্তর রাঢ় অঞ্চলে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বহরমপুরের নিকটে রাঙ্গামাটি বা কানসোনা। পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত শশাংকের রাজ্যভুক্ত ছিল। মহাসেন গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের কাছ থেকে শশাংক পুণ্ড্রবর্ধন অধিকার করেছিলেন। আদি গুপ্ত রাজবংশ হূণদের আক্রমণে এবং মালবরাজ যশোবর্মনের (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ) আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী গুপ্তরাজাদের মধ্যে কুমারগুপ্ত এবং দামোদর গুপ্তের পুত্র মহাসেন গুপ্ত মৌখরীরাজ ঈশান বর্মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

আফ্‌সাদ প্রস্তরলিপি অনুসারে মহাসেন গুপ্তের পুত্র মাধব সেন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। এই সময়ে গৌড়ীয়গণ পুণ্ড্রবর্ধন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। মহারাজাধিরাজ ধর্মাদিত্য গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ বঙ্গে প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেন। হিউ-এন্‌-সাঙের বিবরণ অনুসারে শশাংক পূর্ববঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে গৌড়াধিপ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। যশোর জেলার একটি গ্রাম থেকে অন্যান্য গুপ্ত রাজাদের মুদ্রার সঙ্গে শশাংকেরও তিনটি সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মুদ্রায় অংকিত নরেন্দ্রাদিত্য নাম পণ্ডিতদের মতে শশাংকেরই নামান্তর। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প অনুসারে জয়নাগ শশাংকের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতানুসারে জয়নাগ ও তাঁর পুত্র থানেশ্বরের রাজা আদিত্যবর্ধন বা তাঁর পুত্র প্রভাকর বর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন।

শশাংকের রাজধানী যদিও কর্ণসুবর্ণে অবস্থিত ছিল, কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে উত্তরে পুণ্ড্রবর্ধন, দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ, রোহিতাস্তগিরি (রোটাস পর্বত) পর্যন্ত, পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত এবং দক্ষিণে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলায়

১। ibid.—p. 131

২। History of Bengal, Vol. I. Ed, p. 82.

কোঙ্গদ রাজ্য অধিকার করেছিলেন। সাহাবাদ জেলায় রোটাসগড় গিরিদুর্গে প্রাপ্ত লিপি অনুসারে শশাংক ছিলেন প্রথমে মহাসামন্ত অর্থাৎ জায়গীরদার মাত্র। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প অনুসারে সোম বা শশাংকের রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত ছিল। মহারাজ মহাসামন্ত দ্বিতীয় মাধবরাজের গঞ্জাম তাম্রশাসন অনুসারে মাধবরাজ ৩০০ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে মহারাজাধিরাজ শশাংকের রাজ্যান্তর্গত কোঙ্গদ রাজ্য থেকে ভূমিদান করেছিলেন।

শশাংকের রাজ্যবিস্তার

প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর শশাংক মালব রাজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে থানেশ্বর রাজবংশকে উৎখাত করে উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মালবরাজ গ্রহবর্মার সাহায্যে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। এই সময়ে রাজ্যবর্ধন শশাংকের দ্বারা নিহত হন। শশাংক উত্তর ভারতে অধিকার বিস্তার করতে সমর্থন হন নি। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প অনুসারে হর্ষবর্ধন শশাংককে পরাজিত করেছিলেন এবং পরস্পরের রাজ্য অনাক্রমণের শর্তে সন্ধি করেছিলেন।[১] ডঃ স্মিথের মতে শশাংকের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন শশাংকের রাজ্য অধিকার করেছিলেন। হর্ষবর্ধন বাঁশখেরা তাম্রশাসনে (৬২৮ খ্রীঃ) উল্লিখিত বর্ধমান জয়স্কন্ধাবার অনেকের মতে বর্ধমান শহর কামরূপের অধীশ্বর ভাস্করবর্মা হর্ষবর্ধনের সহায়ক হয়েছিলেন। ভাস্করবর্মা কর্ণ-সুবর্ণ অধিকার করে কর্ণ-সুবর্ণের জয়স্কন্ধাবার থেকে অনুশাসন প্রচার করেছিলেন (নিধনপুর তাম্রশাসন)। মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের মতে শশাংকের গৌড় সাম্রাজ্য সতেরো বৎসর কয়েক মাস বর্তমান ছিল। কামরূপের অধিপতিরা দীর্ঘকাল কর্ণসুবর্ণ অধিকারে রাখতে পারেন নি। গৌড় এবং মগধে পালবংশীয় রাজাদের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্ত সাম্রাজ্য শশাংকের অভ্যুদয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

হিউ-এন্-সাঙ্ সমগ্র বঙ্গভূমিকে—কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ—এই পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। রাজ্যগুলির রাজাদের নাম তাঁর বিবরণে অনুল্লিখিত। সম্ভবতঃ রাজ্যগুলি হর্ষবর্ধনের অধিকার-ভুক্ত হয়েছিল। হিউ-এন্-সাঙের বিবরণ অনুসারে কর্ণসুবর্ণের আয়তন সম্পর্কে জেনারেল কানিংহাম লিখেছেন, "The territory was from 4400 li or

১। **Historical Aspects of Bengal Insciptions, p. 269.**

from 733 to 750 miles in circuit. It must therefore have comprised all the petty hill, states lying between Medinipur Sirguja on the east and west between the sources of Damuda and Vaitarani".[১]

হিউ-এন্-সাঙ্ ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শশাংকের মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি নামক রাজ্যগুলি ভ্রমণ করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ অবশ্যই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলা নিয়ে গঠিত ছিল।[২] কানিংহামের মতে মেদিনীপুরও কর্ণসুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্ণসুবর্ণ অবশ্যই বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই হিসাবে শশাংকের গৌরবময় ইতিহাস বর্ধমানেরই গৌরবময় অতীত।

কর্ণসুবর্ণের আয়তন

"কজঙ্গল রাজমহল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা—প্রাচীন উত্তর রাঢ়ের পশ্চিমতম অংশ। ভবিষ্যপুরাণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে অজলা উষর জঙ্গলময় ভূমি। সেখানে কিছু কিছু লৌহ আকর আছে। সেখানে তিনভাগ জঙ্গল ও একভাগ গ্রাম, স্বল্পভূমিমাত্র উর্বর। ভট্টভবদেবের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) লিপিতেও এই ভূমিকে বলা হইয়াছে উষর ও জঙ্গলময়। ইহাই য়ুয়াঙ্ চুয়াঙ্ কথিত কজঙ্গল।"[৩]

কজঙ্গল

ফরিদপুর এবং মল্লসারুল (বর্ধমান) লিপি থেকে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেব—এই তিন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা নব্যাবকাশিকা, বাক মণ্ডল এবং বর্ধমান ভুক্তির অধীশ্বর ছিলেন। বপ্পঘোষবাট লিপিতে জয়নাগ নামে রাজা কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। এই রাজাদের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ থেকে বোঝা যায় যে এঁরা গুপ্ত রাজাদের প্রভাবমুক্ত সার্বভৌম নরপতি ছিলেন।

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে পাঁচটি এবং বর্ধমান অঞ্চলে একটি —এই ছয়টি পট্টোলি থেকে এই তিন মহারাজাধিরাজদের সংবাদ পাওয়া যায়। "তিন জনে মিলিয়া অন্যূন ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই রাজত্বের

১। Ancient Geography of India, p. 378.
২। History of Bengal, Vol. I, Ed. R. C, Mazumdar, p. 77.
৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৮৫

কাল মোটামুটি ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তৃতীয় পাদ পর্যন্ত। লিপি প্রমাণ হইতে মনে হয়, গোপচন্দ্রই ইঁহাদের মধ্যে প্রথমতম এবং প্রধানতম এবং ইঁহাদের রাজ্য বর্ধমান অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে ত্রিপুরা পর্যন্ত ছিল—কেন্দ্রস্থল ছিল বোধ হয় ফরিদপুর অথবা ত্রিপুরা অঞ্চলে। রাজ্যের ছিল দুইটি বিভাগ, একটি বর্ধমান ভুক্তি, অপরটি নব্যাবকাশিকা (নূতন অবকাশ বা নবসৃষ্টভূমি—ফরিদপুরের কোটালি পাড়া অঞ্চল)। বর্ধমান অঞ্চলের যে বিজয় সেন একদা ছিলেন মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সামন্ত, তিনি এখন সামন্ত হইলেন গোপচন্দ্রের। আবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রা হইতে মনে হয়, সমাচার দেবের পরও আরও কয়েকজন রাজা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম পৃথুজবীর (মতান্তরে পৃথুবীর অথবা পৃথুবীরজ) ও আর একজনের নাম সুধন্যা (বা সুধন্যাদিত্য)।”[১]

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম / ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গভূমি গুপ্ত রাজবংশের অধীনতা স্বীকার করে। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতট সমুদ্রগুপ্তের প্রত্যন্ত রাজ্য হিসাবে বর্ণিত হওয়ায় প্রতীত হয় যে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়দেশ সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীন ছিল।

শশাংকের মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প অনুসারে শশাংকের উত্তরাধিকারীরা সিংহাসন নিয়ে পরস্পর বিবাদে মত্ত হয়েছিলেন। শশাংকের এক পুত্র কর্ণসুবর্ণের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণসুবর্ণের অধিকার চলে গিয়েছিল জয়নাগের হাতে।

শশাংকের পরে বঙ্গদেশ

যদিও ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে জয়নাগ শশাংকের অল্প পূর্বে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে জয়নাগ শশাংকের পরে কর্ণসুবর্ণের অধিপতি হয়েছিলেন। জয়নাগের মুদ্রা ও কর্ণসুবর্ণ থেকে প্রচারিত অনুশাসন পাওয়া গেছে। ডঃ মজুমদারের মতে জয়নাগের রাজত্বকাল ৫৫০ থেকে ৫৬০ খ্রীষ্টাব্দ।[২]

একটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে শৈলরাজ জয়বর্ধন পুণ্ড্রবর্ধনের রাজাকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করেছিলেন আঃ ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে। কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্মণ গৌড়রাজকে হত্যা করেন। কাশ্মীরের অধীশ্বর ললিতাদিত্য

১। বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৫৫২-৫৩।

২। History of Bengal, Vol. I, Ed. : R. C. Mazumdar, p. 80.

মুক্তাপীড় যশোবর্মণকে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর সমগ্র রাজ্য অধিকার করেছিলেন আঃ ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। কলহনের রাজতরঙ্গিণী অনুসারে তিনি কলিঙ্গ পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। গৌড়মণ্ডলের অধীশ্বর হস্ত্যারোহী সৈন্য দিয়ে ললিতাদিত্যকে সাহায্য করেছিলেন। ললিতাদিত্য গৌড়েশ্বরকে কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিলেন।[১] সুতরাং গৌড়রাজ্য ললিতাদিত্যের পদানত হয়েছিল। গৌড়েশ্বরের হত্যার প্রতিশোধকল্পে কয়েকজন রাজভক্ত বীর ছদ্মবেশে কাশ্মীরে প্রবেশ করে একটি মন্দিরে দেব বিগ্রহ ধ্বংস করে কাশ্মীর সৈন্যদের দ্বারা নিহত হন।[২] ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় একাকী পুণ্ড্রবর্ধনে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি পুণ্ড্রবর্ধনে গৌড়েশ্বরের শাসনকর্তা জয়ন্তর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। গৌড়রাজকে পরাজিত করে জয়াপীড় শ্বশুর জয়ন্তকে গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।[৩] নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জয়দেবের অনুশাসনে (৭৫৯ বা ৭৪৮ খ্রীঃ) জয়দেবের শ্বশুর ভগদত্ত বংশীয় হর্ষকে গৌড়ের অধীশ্বর বলা হয়েছে। সুতরাং গৌড় আর একবার বিদেশী আক্রমণের শিকার হয়েছিল।

তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের মতে ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে (৭ম শতাব্দীর শেষ ও অষ্টম শতাব্দীর শুরু) যশোবর্মণ বঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন।

পালরাজাদের আমলে বঙ্গদেশ

বঙ্গেশ্বর ললিতচন্দ্রের পরে গৌড়-বঙ্গে কোন উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন না। দেশব্যাপী অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় দেখা দিয়েছিল। মাৎস্যন্যায় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রজারা গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেছিলেন আঃ ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ফলে বঙ্গে পালবংশের রাজত্বের সূচনা হয়।

ধর্মপালের খালিমপুর অনুশাসনে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা দ্বৈতবিষ্ণুকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের টীকায় বলা হয়েছে যে গৌড় রাজ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপালের মুঙ্গের অনুশাসনে বলা হয়েছে যে তিনি আসমুদ্র পৃথিবী জয় করেছিলেন। সুতরাং গৌড় রাজ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ অনুমান নিরর্থক নয়। সুতরাং রাঢ় অঞ্চল বা বর্ধমান ভুক্তি পালরাজাদের অধিকারে ছিল।

১। Historical Aspects of Bengal Inscriptions, p. 310.
২-৩। History of Bengal, vol. I (D. U.) Pp. 84-85.

পাল রাজাদের প্রকৃত বাসভূমি ছিল বরেন্দ্র ভূমি বা উত্তরবঙ্গ। বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল, রামচরিতে বরেন্দ্রভূমিকে পাল রাজাদের জনকভূঃ বা পিতৃভূমি বলা হয়েছে। এখান থেকেই ধর্মপাল ও দেবপাল উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত অঞ্চল জয় করেছিলেন। দেবপালের আমলে যবদ্বীপের (জাভা) শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গ যে দেবপালের শাসনাধীন ছিল ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের শাসনকর্তা বলবর্মণের মাধ্যমে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য ভূমি প্রার্থনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিশাল সাম্রাজ্যের অনেকটাই হাতছাড়া হয়ে যায়। কাম্বোজরাজ ধর্মপাল খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীতে দণ্ডভুক্তিতে রাজত্ব করতেন। মহারাজাধিরাজ নয়পাল গৌড় অধিকার করেছিলেন। অবশ্য পালবংশীয় রাজা মহীপাল গৌড় পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ইর্দা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল কাম্বোজদের অধিকারে ছিল। কাম্বোজবংশীয় রাজ্যপাল, নারায়ণ পাল এবং এবং নয়পালের আমলে দণ্ডভুক্তি মণ্ডল সহ বর্ধমান ভুক্তি তাঁরা অধিকারে রেখেছিলেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করতেন।[১] বর্ধমান ভুক্তির অধীশ্বর হলেও কাম্বোজদের প্রতাপ বহু বিস্তৃত হয়েছিল। প্রথম মহীপাল বরেন্দ্রভূমি কাম্বোজদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। মহীপালের পর দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজ্য লাভ কালে পাল সাম্রাজ্য বিহারের অংশবিশেষ ও রাঢ়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মহীপালের রাজত্বের শেষ দিকে চোল বংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোল এবং তাঁর পুত্র রাজরাজদেবের (রাজ্যলাভের কাল ১০১১—১২খ্রীঃ) সময়ে চোলগণ কোশল, ওড্র বিষয় (উড়িষ্যা), তণ্ডভুতি (দণ্ডভুক্তি—দাঁতন মেদিনীপুর), তক্কণ লাঢ়ম্ (দক্ষিণ রাঢ়), বাঙ্গালা দেশ এবং উত্তির লাঢ়ম্ (উত্তর রাঢ়) অধিকার করেছিলেন। রাজেন্দ্র চোল গাঙ্গেয় উপত্যকা জয় করার জন্য গঙ্গৈকোণ্ড উপাধি ধারণ করেছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছিল। দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল—তৃতীয় বিগ্রহপালের এই তিন পুত্রের মধ্যে বিবাদের সুযোগে কৈবর্তরাজ দিব্যোক ও ভীম বিদ্রোহ করে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করেছিলেন। মহীপাল যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে

১। Historical Aspects of Bengal Inscription, p. 381.

রাজা হন শূরপাল। তিনিও অল্পকাল পরে নিহত হন। রামপাল রাজা হয়ে বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে সামন্তরাজগণের সহায়তা লাভ করেছিলেন। এই সামন্তরাজগণের মধ্যে ছিলেন দণ্ডভুক্তির শাসক জয়সিংহ, অপরমন্দারের শাসনকর্তা লক্ষ্মী শূর, উচ্ছলের শাসক ময়গল সিংহ, ঢেক্করিয়ার অধীশ্বর প্রতাপ সিংহ, কয়জঙ্গলের মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জুন, সংকট গ্রামের চণ্ডার্জুন এবং নিদ্রাবলের রাজা বিজয়রাজ রাঢ় অঞ্চলের লোক। উচ্চাল বা উচ্ছল বীরভূম জেলার উঝিয়ল পরগণা। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ঢেক্করিয়া অজয় নদীর অপর পাড়ে বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্তী। নিদ্রাবল রাঢ়দেশের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্তী। বল্লালসেনের নৈহাটী অনুশাসন থেকে জানা যায় যে নিদ্রাবলের রাজারা রাঢ়ের অলংকার ছিলেন। বালবলভী ভুজঙ্গ ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতেও এই তথ্য উল্লিখিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অঞ্চলকে বগড়ী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই স্থান রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত। বালবলভীভুজঙ্গ ভট্টভবদেব রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। অপরমন্দারে শূরবংশ রাজত্ব করেছেন। এই স্থানটি পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে।[১] ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "অপরমন্দার হ'ল মান্দারণ (মন্দারবন বা মন্দারাণ), আধুনিক হুগলী—দক্ষিণ বর্ধমান—মেদিনীপুর—বাঁকুড়া।[২] সংকট গ্রাম বল্লালচরিত গ্রন্থের সংকোট, আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের সকোট, সম্ভবতঃ হুগলী জেলায়।[৩] পদুবল্লার সোম ও রামপালের সহায়ক সামন্তরাজারা "পদুবল্লা পাবনা হইতে পারে, কিন্তু হুগলী জেলায় পৌলান পরগণা হওয়াই সম্ভব।[৪]

রামপালের সাহায্যকারী রাঢ়ীয় সামন্তরাজগণ

কুলজী গ্রন্থ থেকে আদিশূর নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনিই শূরবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বেনারস কনৌজ ইত্যাদি থেকে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনিয়েছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। যদিও আদিশূরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না, তথাপি বিভিন্ন অনুশাসনে শূরবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুলজী গ্রন্থে শূরবংশের

শূরবংশ

১। Dynastic History of Northern India—pp. 342-43.

২। বঙ্গভূমিকা—পৃঃ ১২০

৩। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৪৯০

৪। তদেব

বিবরণ আছে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে আদিত্য শূর থেকে দশজন শূরবংশীয় নৃপতির উল্লেখ আছে। চোল অনুশাসনে রণশূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে অপরমন্দারের রাজা লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি রামপালের অধীনস্থ রাজা ছিলেন এবং দিব্য ও ভীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন।

মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত রাজা একটি ভূমিদান অনুশাসন প্রচার করেছিলেন। তিনি এই অনুশাসনে একজন স্বাধীন রাজার মতই নিজেকে জাহির করেছেন। ঈশ্বর ঘোষের এই তাম্রশাসনে ২৯ জন অফিসারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে পাঁচজন মহাতন্ত্রাধিকৃত (সম্ভবতঃ উচ্চশ্রেণীর পুরোহিত), মহাকরণাধ্যক্ষ (করণিকদের প্রধান), শিরোরক্ষিক (রাজকীয় দেহরক্ষীর প্রধান), অন্তঃপ্রতিহার (অন্তঃপুরের রক্ষক), আভ্যন্তরিক (অন্তঃপুরের অধিকর্তা)। এই তাম্রশাসনে কোন তারিখ উল্লিখিত নেই। কিন্তু অনুশাসন প্রচারিত হয়েছে বর্ধমানের ঢেক্করি থেকে। এই অনুশাসনটিকে খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীর এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের আমলের বলে অনুমান করা হয়েছে।[১] কৈবর্ত যুদ্ধে রামপালের সাহায্যকারী ঢেক্করিয়ার এই ঢেক্করির সামন্তরাজা হওয়াই সম্ভব। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ঢেঁকুরগড়ের রাজা ইছাই ঘোষ ঐতিহাসিক ঈশ্বর ঘোষ হওয়াই সম্ভব। পাল সাম্রাজ্যের দুর্বলতায় সুযোগে অনেক সামন্ত রাজা স্বাধীন রাজার মত আচরণ করতেন। ঈশ্বর ঘোষ তাঁদের অন্যতম। "There can be hardly any doubt that chiefs like Isvaraghosh were independent rulers for all practical purposes, though they did not openly assume royal epithet."[২]

ঈশ্বর ঘোষ

অপরমন্দার অবশ্যই রাঢ় অঞ্চলে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত। তিরুমালাই লিপিতে (১০২৩ খ্রীঃ) শূরবংশের উল্লেখ না থাকায় শূরবংশের সূচনা খ্রীঃ একাদশ শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। শূর রাজারা রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে বর্মণ রাজবংশ রাজত্ব করতেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সিংহলী মহাবংশে উল্লিখিত লাল (রাঢ়) বঙ্গ ও মগধের মধ্যবর্তী

শূরবংশ

বর্মণবংশ

১। History of Bengal, R. C. Mazumdar, Vol. I Pp. 146, 282.

২। History of Bengal, Vol. I, p. 275.

সিহপুর বর্মণদের রাজধানী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ভোজবর্মণের বেলভ তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ়ে সিদ্ধল গ্রাম-নিবাসী রামদেব শর্মাকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। সিদ্ধলগ্রাম সিহপুর বা সিংহপুর হওয়া অসম্ভব নয়।

মহীপালের পরে রাজা হয়েছিলেন নয়পাল। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে চেদিবংশীয় রাজা লক্ষ্মীকর্ণ (রাজ্যলাভ ১০৪১ খ্রীঃ) পালরাজ্য আক্রমণ করেন। তিব্বতী কাহিনী অনুসারে লক্ষ্মীকর্ণ মগধ জয় করেছিলেন। বীরভূম জেলায় পৈকোরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে জানা যায় যে রাজা কর্ণের আদেশে একটি দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং অন্ততঃ রাঢ়ের উত্তরাংশ চেদিরাজের অধিকারে এসেছিল। উৎকলাধিপতি চোড়গঙ্গ (২০৭৬-১১৪৭ খ্রীঃ) গঙ্গাতীরবর্তী দেশগুলি জয় করেছিলেন এবং মন্দারের রাজাকে পলায়নে বাধ্য করেছিলেন। মুঙ্গেরের নিকটবর্তী জয়নগরে প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় যে, পালবংশের অন্তিম পূর্ব রাজা মদন পাল রাজত্বের ১৯ বৎসর পর্যন্ত (১১৩৪ খ্রীঃ) গৌড় অধিকারে রেখেছিলেন। মদন পালের পুত্র পাল পালের রাজ্য ছিল মুঙ্গের জেলায়। সুতরাং গৌড়বঙ্গ থেকে পালেদের রাজত্ব অবসিত হয়েছিল। অতঃপর গৌড়বঙ্গে সেন রাজাদের অভ্যুদয় হয়।

চেদিবংশ

চোড়গঙ্গ ও শেষ পালরাজা

সেনবংশীয় রাজগণ নিজেদের কর্ণাটকাগত এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই বংশের প্রথম রাজা সামন্ত সেন "ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ"।[১] দেওপাড়া প্রশস্তি অনুসারে এই বংশের পূর্বপুরুষ বীরসেন দাক্ষিণাত্য-নিবাসী—"দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিভিঃ।"[২] সামন্তসেন কর্ণাটকের লক্ষ্মী অপহরণকারী শত্রুদের ধ্বংস করেছিলেন—"দুর্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মীলুণ্ঠকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।"[৩] কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে সেনেদের রাঢ়ের অধিবাসী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে—বংশে তস্যামুদয়িনি সদাচারচর্যানিরূঢ়িপ্রৌঢ়া রাঢ়ামকলিত চরৈর্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ।"[৪] এই বংশ সদাচার ও আচরণের জন্য বিখ্যাত অনুপম মহিমায় ভূষিত রাঢ়-

সেনবংশীয় রাজাদের রাজত্ব

১-৩। বিজয় সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি—Inscription of Bengal vol. III, Ed N. G. Mazumdar ৪। বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসন ibid

দেশের অধিবাসী। নৈহাটী অনুশাসনে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত উত্তর রাঢ়মণ্ডলে অবস্থিত স্বল্পদক্ষিণবীথিতে বাল্যহিট্ঠা নামে গ্রামদানের বিবরণ আছে। আবার লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে সামন্ত সেনকে কর্ণাটক ক্ষত্রিয়দের শিরোমালা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই দুই বিরুদ্ধ তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে সেনবংশ কর্ণাটক থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং কর্ণাটকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। এই বংশের সামন্তসেন প্রথম জীবন কর্ণাটকে যাপন করেছেন এবং কর্ণাটকে বিভিন্ন যুদ্ধে কীর্তি অর্জন করেছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি রাঢ়ে বসবাস করেছিলেন। তাঁর বীরত্ব সেনপরিবারকে এমন শক্তিশালী করেছিল যে তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ রাজকীয় উপাধি হেমন্ত সেন থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে।[১] বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসনে হেমন্ত সেনকে পৃথ্বীপতি বলা হয়েছে। মোটের উপর সেন রাজারা যে কর্ণাটক থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এ বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই একমত। ডঃ হেমচন্দ্র রায় লিখেছেন, "From these passages it is quite clear that the Senas came from Karṇāta in the Deccan and settled in Rāḍhā in West Bengal."[২] ডঃ বিনয় সেন লিখেছেন, "The conclusion may be arrived at that the ancestors of Sāmanta formed a fighting group from the South, settled in Rāḍhā, whose assistance was useful to kings, and that during the time of Sāmanta Sena they set themselves to a serious attempt to increase their political influence in the territory."[৩]

আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন, "বাংলায় এঁদের মূল নিবাস ছিল রাঢ়ে, দামোদর ও অজয়ের উপত্যকায়। এই অঞ্চলের এক বিশেষ অংশ, বর্ধমান জেলার উত্তর পশ্চিমের মধ্যভাগ সেনভূম নামে পরিচিত হয়ে এসেছে।"[৪]

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১। History of Bengal vol. I. p. 206

২। Dynastic History of Northern India, p. 355.

৩। Historical Aspects of Bengal Inscriptions, p. 459.

৪। বঙ্গভূমিকা—পৃঃ ১২৫

বিজয় সেনের ব্যারাকপুর অনুশাসন অনুসারে হেমন্ত সেন মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন যশোদেবী। বিজয় সেনের পাইকোরা অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, বীরভূম ও নিকটবর্তী অঞ্চল হেমন্ত সেনের রাজ্যান্তর্গত ছিল। বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রশাসন উত্তর রাঢ়মণ্ডলে বর্ধমানভুক্তিতে তাঁদের আধিপত্য বিজ্ঞাপিত করে। প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ হেমন্ত সেনের আমলে সেনরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল।[১] সুতরাং সেনবংশীয় রাজাদের মূলতঃ বর্ধমান-ভুক্তির অধীশ্বর বলা চলে।

হেমন্ত সেনের রাজত্ব

হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (আঃ ১০৯৫-১১৫৮ খ্রীঃ) সেন বংশের প্রতাপ ও রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি শূরবংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন। রামপালকে সাহায্য করতে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের অন্যতম নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে বিজয়রাজ ও বিজয় সেন একই ব্যক্তি। অপর-মন্দারের শূরবংশের কন্যাকে বিবাহ করে শূররাজ্যের সাহায্যে বিজয় সেন শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। ৬২তম বৎসর রাজত্বের পূর্বে (আঃ ১১৫৯ খ্রীঃ) বিজয় সেন বিক্রমপুর থেকে ব্যারাকপুর তাম্রশাসন প্রচার করেছিলেন। ঐ বৎসরেই একই স্থানে ভোজবর্মণ জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেছিলেন। সুতরাং বিজয় সেন ঐ বৎসরই বর্মণদের রাজ্য পূর্ববঙ্গ অধিকার করেছিলেন। রাঢ়ের অন্যান্য সামন্ত রাজাদের তিনি পরাজিত করেন এবং পালরাজাদের কাছ থেকে উত্তরবঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিজয় সেন নান্য এবং বীরকে পরাজিত করেছিলেন (নান্যবীর বিজয়ীতি), গৌড়-রাজকে বিতাড়িত করেছিলেন (গৌরেন্দ্রমপাদ্রবৎ), কামরূপ ও কলিঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেছিলেন (কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিজায়), নান্য রাঘব, বর্ধন, বীর প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে কারারুদ্ধ করেছিলেন এবং সমগ্র গঙ্গাপ্রবাহের উপর দিয়ে নৌবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। পণ্ডিতরা গৌড়রাজকে মদন পাল (আঃ ১১৩০-১১৫০ খ্রীঃ) বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

বিজয় সেনের রাজ্য

বিজয়সেনের ব্যারাকপুর অনুশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গ অবশ্যই বিজয় সেনের রাজ্যান্তর্গত ছিল। নান্য

১। Historical Aspects of Bengal Inscriptions, p. 461.

ত্রিহুত ও নেপালের রাজা নান্যদেব (আঃ ১০৯৭-১১৫০ খ্রীঃ), রাঘব চোড়গঙ্গের পুত্র কলিঙ্গাধিপতি রাঘব (আঃ ১১৫৬-১১৭০ খ্রীঃ), বীর কোটাটবীর রাজা বীরগুণ এবং বর্ধন কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্ধন বলে নির্ণীত হয়েছেন। নান্যদেব কর্ণাটক দেশীয় রাজা, ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলা জয় করেছিলেন। সুতরাং গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গসহ বিস্তৃত রাজ্য বিজয় সেন অধিকার করেছিলেন।

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন (আঃ ১১৫৮-১১৭৯ খ্রীঃ) সেনবংশের গৌরব বর্ধিত করেছিলেন। বল্লালচরিত অনুসারে বল্লাল সেনের রাজ্য বঙ্গ, বাগড়ী, বরেন্দ্র, রাঢ় ও মিথিলা, এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাঁর তিনটি রাজধানী ছিল—গৌড়পুর, বিক্রমপুর ও সুবর্ণগ্রাম। প্রয়োজনমত তিনি এক এক রাজধানীতে বাস করতেন। তিনি দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বল্লাল সেনের রাজ্য

বল্লাল সেনের পুত্র রামদেবীর গর্ভজাত লক্ষ্মণ সেন আঃ ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ অনুশাসন বিক্রমপুর থেকে প্রচারিত হয়। মাধাইনগর অনুশাসন ধার্য্যগ্রামের জয়স্কন্ধাবার থেকে প্রচারিত হয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে ধার্য্যগ্রাম বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনার নিকটবর্তী ধাত্রিগ্রাম।[১] অনুশাসনগুলিতে উল্লিখিত স্থাননাম থেকে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের আভাস পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি এবং বর্ধমান ভুক্তি তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ব্যাঘ্রতটী, খাড়ি মণ্ডল ও বরেন্দ্রী পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর অনুশাসনগুলি দিনাজপুর, ২৪ পরগণা, ঢাকা, নদীয়া ও পাবনাতে পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণ সেনের পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের মাধাইনগর অনুশাসনে লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন যেখানে মুষলধর (বলরাম) এবং গদাপাণি (জগন্নাথ) বিরাজ করছেন। তিনি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বিশ্বনাথ ক্ষেত্রে এবং যেখানে বরুণা অসি ও গঙ্গা মিলিত হয়েছে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে (এলাহাবাদ)। সুতরাং পুরী, বারাণসী এবং এলাহাবাদে লক্ষ্মণ সেনের আধিপত্য প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়ে কামরূপের রাজা ছিলেন সম্ভবতঃ বল্লভদেব, যাঁর আসাম অনুশাসন (আঃ ১১৮৪—৮৫ খ্রীঃ) পাওয়া গেছে।

লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য

১। বঙ্গ ভূমিকা—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৩৫

গাড়োয়াল রাজবংশ মগধ ও উত্তর বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলো। গাড়োয়াল রাজ গোবিন্দ চন্দ্রের মানের লিপি (Maner Plates) ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনার নিকটবর্তী অঞ্চলে ভূমিদানের তথ্য বিজ্ঞাপিত করে। গোবিন্দচন্দ্রের লার অনুশাসন (Lar Plates) জানায় যে রাজা গোবিন্দচন্দ্র তখন (১১৪৬ খ্রীঃ) মুঙ্গেরে অবস্থান করছিলেন। গাড়োয়াল বংশের রাজা জয়চন্দ্রের তারা-চণ্ডী শিলালিপি সাহারাবাদে গাড়োয়াল বংশের রাজ্য বিস্তারের কথা জানিয়ে দেয়। জয়চন্দ্রের বুদ্ধগয়া লিপিতে (১১৪০ খ্রীঃ) জয়চন্দ্রের গয়া জেলায় প্রভাব বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং গাড়োয়ালেরা মগধ অধিকার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। জয়চন্দ্র (আঃ ১১৭০—১১৯৩ খ্রীঃ) ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের (১১৮৫-১২০৬) সম-সাময়িক। গাড়োয়াল ও সেনেদের সংঘর্ষের ফলে তুর্কী সৈন্যের বঙ্গবিজয় সহজ হয়েছিল। লক্ষণ সেন গাড়োয়াল রাজ জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে কাশী, এলাহাবাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি অরিরাজ-মর্দনশংকরগৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেছিলেন।

গাড়োয়ালদের সঙ্গে সংঘর্ষ

লক্ষ্মণ সেন নিজে কবি ছিলেন। শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলন গ্রন্থে তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। পিতা বল্লাল সেনের অসম্পূর্ণ গ্রন্থ অদ্ভুত সাগর তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। তিনি জ্ঞানী-গুণী কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব, পবন দূতের কবি ধোয়ী, ব্রাহ্মণসর্বস্ব নামক স্মৃতিগ্রন্থের লেখক হলায়ুধ, সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলক শ্রীধর দাস, কবি গোবর্ধন আচার্য, কবি শরণ প্রভৃতি তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেনের সাহিত্যানুরাগ

মিন্‌হাজ-উদ্দিনের বিবরণ অনুসারে ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করেন। বখ্‌তিয়ার ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গজনীতে সিহাবুদ্দিন ঘোরীর সৈন্যদলে যোগ দিতে এসে ব্যর্থকাম হয়ে দিল্লীতে মালিক কুতুবুদ্দিন আইবকের সৈন্যদলে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এখানেও ব্যর্থকাম হয়ে তিনি ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসাবুদ্দিন তাঁকে আধুনিক মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বে দুটি পরগণা জায়গীর দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

বখ্‌তিয়ার খিলজির নদীয়া জয়

তুর্কী ও খিলজিদের একত্র করে বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন। উত্তর বিহারে তখন মিথিলার শক্তিশালী কর্ণাটক বংশীয় রাজাদের প্রতাপ। উত্তর বিহারে সুবিধা করতে না পেরে বখ্‌তিয়ার দক্ষিণ বিহারের দিকে অগ্রসর হন। তিনি হিন্দুরাজ্য লুণ্ঠন করতে থাকেন এবং ওদন্তপুর বিহার লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার দ্বিতীয়বার দক্ষিণ বিহার আক্রমণ করে জয় করেছিলেন। এক বৎসর পরে (১২০১ খ্রীঃ) তিনি বিহার সরিফ থেকে গয়া ও ঝাড়খণ্ডের পথে নদীয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেন।[১]

লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি নৌকাযোগে পলায়ন করে পূর্ববঙ্গে সাংকনাত এবং বঙ্গদেশে (Bang) উপনীত হন। তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের বিক্রমপুর অনুশাসন থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেন ও তাঁর পুত্ররা বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করেছেন। লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল গৌড় লক্ষ্মণাবতী। তাঁর অপর রাজধানী ছিল নদীয়া বা নবদ্বীপ এবং বিজয়পুর। ডঃ সুকুমার সেনের মতে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল ধার্য্যগ্রাম, আধুনিক ধাত্রিগ্রাম।[২] ধোয়ীর পবনদূতে শুহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমার পরে পবনদূত গঙ্গা ও যমুনার মুক্তবেণীর নিকটে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী বিজয়পুরে উপনীত হয়েছিল। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটবর্তী কোন স্থানে বিজয়পুর অবস্থিত ছিল।

বখ্‌তিয়ার খিলজির আক্রমণের সময়ে লক্ষণ সেন নদীয়াতে অবস্থান করছিলেন। কবি শরণ লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক ম্লেচ্ছরাজের পরাজয়ের উল্লেখ করেছেন—

স্বেচ্ছাম্লেচ্ছান্ বিনাশং নয়তি বিনয়তে কামরূপাভিমানম্।
কাশীভর্তুঃ প্রকাশং হরতি বিহরতে মূর্দ্ধ্নি যো মাগধস্য ॥

—তিনি স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদের বিনাশ করেছিলেন, কামরূপরাজের দর্প চূর্ণ করেছিলেন, মগধরাজের মস্তকে বিচরণ করেছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কাশী কামরূপ মগধ জয়ের উল্লেখ তাম্রশাসনেও পাওয়া যায়। সুতরাং ম্লেচ্ছ ধ্বংস করার কাহিনী অলীক নয়। লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে

১। History of Bengal—vol. II, Ed. Sir Jadunath Sarkar Pp. 1-4.
২। বঙ্গভূমিকা—পৃঃ ১৩৫

ম্লেচ্ছ অর্থাৎ তুর্কী সৈন্যের সংঘর্ষ ও তুর্কী সৈন্যের পরাজয় অবশ্যই সম্ভব হয়েছিল। তবে লক্ষ্মণ সেনের তুর্কী বিজয় কোন সময়ে হয়েছিল, তুর্কীদের দ্বারা নবদ্বীপ বিজয়ের পূর্বে অথবা পরে, তা বলা সম্ভব নয়।

লক্ষ্মণ সেন বখ্‌তিয়ারের আক্রমণকালে নবদ্বীপে অবস্থান করলেও নবদ্বীপ তাঁর প্রধান রাজধানী ছিল না। এ সম্বন্ধে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত—"নবদ্বীপ সেন রাজাদের রাজধানী ছিল না, ছিল গঙ্গাতীরবর্তী একটি তীর্থস্থান এবং সেখানে একেবারে গঙ্গার কূল ঘেঁষিয়া ছিল রাজার প্রাসাদ। এই প্রাসাদ সুদৃঢ় অট্টালিকা নয়। তদানীন্তন বাংলার রুচি ও অভ্যাস অনুযায়ী কাঠ ও বাঁশের তৈরী সমৃদ্ধ বাংলা বাড়ী। নবদ্বীপ দুর্গও নয়, একটি তীর্থ নগর মাত্র এবং নগর প্রাচীর বা দ্বার বলিতে বাঁশ ও কাঠের তৈরী বেড়া ও দরজা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

যাই হোক, মিন্‌হাজ উদ্দিনের বিবরণ অনুসারে অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে সতেরো জন অশ্বারোহী বখ্‌তিয়ারের নেতৃত্বে নদীয়া জয় করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে ১২০০ বা ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ারের সৈন্যদল নবদ্বীপ আক্রমণ করেছিল। সেক্ শুভোদয়ার মতে এই যুদ্ধ হয়েছিল ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়ের মতে এই ঘটনা ঘটেছে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।[২]

ডঃ বিনয় সেনের মতে মিন্‌হাজ কথিত রায় লক্ষ্মণেয় শব্দের অর্থ লক্ষ্মণ সেনের বংশধর। তাঁর মতে বখ্‌তিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনের পৌত্রকে নদীয়াতে পরাজিত করেছিলেন। মদনপাড়া তাম্রশাসনে, সাহিত্য পরিষদ অনুশাসনে এবং ইদিলপুর অনুশাসনে বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনকে গৌড়েশ্বর বলা হয়েছে। তাঁরা পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের ভূমিদানপত্র পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গ থেকে প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বরূপ সেনের চতুর্দশ রাজত্ববর্ষ এবং কেশব সেনের তৃতীয় রাজত্ববর্ষের পূর্বে অন্ততঃপক্ষে গৌড় রাজ্য সেনেদের হস্তচ্যুত হয় নি। বিশ্বরূপ সেনের পরিষদ অনুশাসনে সূর্য সেন এবং পুরুষোত্তম সেন নামে দুই কুমারের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ তাঁরা বিশ্বরূপ সেনের পুত্র। কেশব সেনের মৃত্যুর পর এঁদেরই একজন গৌড়ের অধীশ্বর হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ মিন্‌হাজ কথিত বখ্‌তিয়ার খিলজি

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃঃ ৫-১১
২। Dynastic History of Northern India—p. 374

কর্তৃক পরাজিত গৌড়েশ্বর এঁদেরই একজন। মিনহাজ তাঁকেই রাই লখ্‌মনিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।[১] বিশ্বরূপ সেনের এই পুত্রই সাংকনাত ও বঙ্গে (Bang) চলে গিয়েছিলেন। মিনহাজের সাক্ষ্য অনুসারে সাংকনাত এবং বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে সেনেরা আরও কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন।[২] ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান, বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত রায়নার নিকটবর্তী শাঁকনাড়া গ্রামই সাংকনাত।[৩]

আইন-ই-আকবরী ও রাজাবলী গ্রন্থে আরও কয়েকজন সেন বংশীয় রাজার নাম উল্লিখিত আছে। এঁদের মধ্যে মাধব সেন এবং শূর সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চরক্ষা নামে একটি পাণ্ডুলিপিতে পরম সৌগত পরম রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর মধু সেনের রাজত্বের (১২৮৯ খ্রীঃ) উল্লেখ আছে।

শেষ সেনরাজগণ

ইনিই সম্ভবতঃ সেন উপাধিধারী শেষ রাজা। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ইনি দক্ষিণ অথবা পশ্চিম বঙ্গের কোন অখ্যাত স্থানে রাজত্ব করতেন অথবা পূর্ববঙ্গের দেব বংশের দশরথ দেব বা তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে পূর্ববঙ্গ অধিকার করেছিলেন।[৪] খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাঢ়ে মঙ্গলকোটে একটি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠার শিলালিপিতে 'শ্রী চন্দ্রসেন নৃপ'র নাম পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ধমান অঞ্চলে সেন রাজাদের প্রভুত্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকেও বর্তমান ছিল।[৫]

বখ্‌তিয়ার নদীয়া লুণ্ঠন করে গৌড়ে উপনীত হন এবং গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষ্মণ সেন অন্ততঃ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিব্বত ও লক্ষ্মণাবতীর (গৌড়) মধ্যে কোচ, মেচ এবং থারু বা তিঙারু জাতি বাস করতো। মেচ জাতির প্রধানকে বখ্‌তিয়ার বন্দী করে ইসলাম ধর্মে

বখ্‌তিয়ারের রাজ্যবিস্তার

দীক্ষিত করেন এবং মেচ আলি নামে পরিচিত করেন। মেচ আলির সাহায্যে তিনি তিব্বত অভিযান করেছিলেন। তিব্বত অভিযানের পূর্বে তিনি মহম্মদ সেরান ও আহম্মদ সেরান—দুই ভ্রাতাকে সেনাপতি করে লখনোর (বীরভূম জেলার নগর বা

১। Historical Aspects of Bengal Inscriptions—pp. 483-84
২। Ibid—p. 485
৩। বঙ্গভূমিকা, পাদটীকা পৃঃ ১৩৭
৪। History of Bengal, vol. I, Page 228
৫। বঙ্গভূমিকা—পৃঃ ১৩৮

রাজনগর) এবং যাজনগর (উড়িষ্যা) জয় করতে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর সৈন্যদল দেবকোট (দিনাজপুর জেলা) অধিকার করে। দেবকোট থেকে বখ্‌তিয়ার তিব্বত অভিযান করেন। তিব্বত অভিযান কালে তাঁর সৈন্যদল পনেরো দিন উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে কাতর হওয়া সত্ত্বেও অগ্রসর হয়ে হিমালয়ের একটি উপত্যকায় পার্বত্যজাতিদের প্রবল বাধার ফলে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। দেবকোটে তিনি মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হন এবং এই সময়ে আলি মর্দান খিলজি তাঁকে হত্যা করেন (১২০৬ খ্রীঃ)।

বখ্‌তিয়ার লখ্‌নোর বা নগর (বীরভূম) আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর সেনাপতি মহম্মদ শিরনি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল অধিকার করেন। আলি মর্দান ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। সুলতান গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ খিলজি আলি মর্দানের কাছ থেকে লক্ষণাবতী (গৌড়) অধিকার এবং লখ্‌নো জয় করেন ১২১৪ খ্রীষ্টাব্দে। গিয়াসুদ্দিন অজয় নদের তীর থেকে দামোদর বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের সীমানায় দামোদর পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বরূপ সেনের কাছ থেকে রাঢ় অধিকার করেছিলেন।[১]

গিয়াসুদ্দিন ইয়াজের রাজ্য

গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ খিলজির রাজ্য কয়েকটি সরকারে বিভক্ত ছিল—সরকার লক্ষণাবতী, পূর্ণিয়া, তাজপুর, পঞ্জরহ, ঘোরাঘাট, বরবকাবাদ, গঙ্গার উত্তরপূর্বে বাজুহা (রাজশাহী ও বগুড়ার অংশবিশেষ), তান্দ, শরিফাবাদ (নগর বীরভূম), এবং গঙ্গানদীর দক্ষিণে সুলাইমানাবাদ (বর্ধমান)।[২] বখ্‌তিয়ার খিলজি বর্ধমানে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন বলে জানা যায় না। যদিও বর্ধমান-ভুক্তির অংশবিশেষ তাঁর অধিকারে থাকা সম্ভব। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন বর্ধমান জেলায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দিন বঙ্গের প্রথম স্বাধীন সুলতান। তাঁর নির্মিত মুদ্রাও পাওয়া গেছে। তিনি লখ্‌নোর (নগর,-বীরভূম) থেকে দেব কোট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিসের পুত্র নাসিরুদ্দিন মহমুদ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১২২৭-২৯ খ্রীঃ)।

১। History of Bengal, Sri Jadunath Sarkar Vol II-Pp. 20-23
২। History of Bengal, Sir Jadunath Sarkar vol. II, p. 29.

নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর মালিক ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বলকা খিলজি লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন (১২২৯-৩০ খ্রীঃ)। ইলতুতমিস ইখ্‌তিয়ার উদ্দিনকে বিতাড়িত করে সৈফ্‌-উদ্দিন আইবেককে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিন বৎসর রাজত্বের পর সৈফ্‌-উদ্দিনের মৃত্যু হয়। দিল্লীতে সুলতান ইলতুতমিস মারা যান ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। ওরখান আইবক নামে এক তুর্কী এই সুযোগে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। তিনি লখনোর দখল করেছিলেন। এই সময়ে বিহারের শাসনকর্তা তুঘরল খানের সঙ্গে ওরখানের সংঘর্ষ হয় এবং ওরখান নিহত হন। তুঘরল খান লক্ষ্মণাবতীর রাজা হন (১২৩৬-৪৫ খ্রীঃ)। তুঘরল খান অযোধ্যা, কারা মানিকপুর এবং গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা অধিকার করেছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার অধিপতি গঙ্গবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব গঙ্গার পূর্বাঞ্চল অধিকার করেন। তুঘরল প্রথমে দামোদর অজয় পার হয়ে উড়িষ্যার সৈন্যদের বিতাড়িত করলেও পরবর্তী আক্রমণে উড়িষ্যাধিপতি লখনোর অধিকার করেন এবং রাঢ় অঞ্চলকে তুর্কী শাসন থেকে মুক্ত করেন (১২৪৫ খ্রীঃ)। উড়িষ্যার সৈন্যদল লক্ষ্মণাবতীর সন্নিহিত অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেছিল। এই সুযোগে অযোধ্যার শাসনকর্তা তমর খান লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। তমরখান দুই বৎসর রাজত্বের পরে মারা যান।

গিযাসুদ্দিনের পরবর্তী শাসকগণ

অতঃপর মালিক জালালুদ্দিন মাসুদ জানি দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদের শাসনকর্তারূপে চার বৎসর লক্ষ্মণাবতীর অধীশ্বর হয়েছিলেন। তারপর অযোধ্যার শাসনকর্তা মুগিসউদ্দিন উজবক লক্ষ্মণাবতীর রাজা হন। তাঁর রাজত্বকালে উড়িষ্যাধিপতি নরসিংহ দেবের সঙ্গে তিনবার যুদ্ধ হয়। প্রথম দুবার উজবক জয়লাভ করেছিলেন। বরেন্দ্র অধিকার করে তিনি রাঢ় আক্রমণ করেছিলেন। এই সময়ে মন্দারণে (হুগলী জেলায়) উড়িষ্যাধিপতির সামন্তরাজা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তৃতীয় বারের যুদ্ধে উজবক পরাজিত হন। দুই বৎসর পরে উজবক পুনরায় রাঢ় আক্রমণ করেছিলেন (১২৫৫ খ্রীঃ) তিনি মন্দারণ, সমগ্র রাঢ় এবং নদীয়া অধিকার করেছিলেন। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের উত্তর সীমান্ত তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। মুগিস-উদ্দিনের মুদ্রায় নদীয়া ও অরজবর্ধন থেকে রাজস্ব আদায়ের উল্লেখ আছে। অরজবর্ধনকে কেউ কেউ বর্ধনকোট, কেউ বর্ধমান; কেউ উমর্দন বা মন্দারণ

বলে মনে করেন। কামরূপ বিজয়কালে মুগিস-উদ্দিন সপরিবারে বন্দী ও নিহত হন।

দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন আমিন খাঁকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা এবং তুঘরল খাঁকে আমিন খাঁর সহায়ক নিযুক্ত করেন। উজবক প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সুলতানের মত রাজত্ব করেছেন। বলবনের আমলে বঙ্গদেশ দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনে আসে। বলবন বিহার ও বঙ্গদেশকে পৃথক করে পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আমিন খাঁ নামেমাত্র শাসনকর্তা ছিলেন। প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন তুঘরল খাঁ। জিয়াউদ্দিন বরণী তাঁর তারিখই ফিরুজশাহী গ্রন্থে তুঘরলের বিভিন্ন সামরিক অভিযানের বিবরণ দিয়েছেন। তুঘরল ত্রিপুরায় রাজা রাজফাকে বিতাড়িত করে তাঁর ভ্রাতা রত্নফাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। বরণীর মতে তুঘরল দক্ষিণ রাঢ় আক্রমণ করেছিলেন। এই সময়ে বীরভূম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলীর বিশাল ভূভাগ উড়িষ্যারাজের অধিকার ভুক্ত ছিল। এই ভূখণ্ড আক্রমণ করে তুঘরল প্রচুর ধন-সম্পদ অধিকার করেছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গে সোনার গাঁ নিজের অধিকারে এনেছিলেন।

তুঘরল খাঁর রাজত্ব

এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপে (অধুনা বরিশাল) দনুজ রায় কায়স্থ নামে এক হিন্দুরাজা রাজত্ব করতেন। তুঘরলের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল। তুঘরল দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন তুঘরলকে আক্রমণ করেন। সোনার গাঁও এর রাজা রায় দনুজ বলবনকে সহায়তা করেছিলেন। বলবন তুঘরলের পশ্চাদ্ ধাবন করে তাঁকে হত্যা করেন। বলবনের আমলে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়রাজ্য লক্ষ্মণাবতী, সাত গাঁও (সপ্তগ্রাম, হুগলী), সোনার গাঁও চাট গাঁও—এই চারটি বিভাগে বিভক্ত ছিল।

তুঘরল খাঁর মৃত্যুর পর বলবন তাঁর কনিষ্ঠপুত্র নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ শাহ বা বুঘরা খানকে লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। বুঘরা খানের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রুকনুদ্দিন কৈকায়ুস বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর 'বঙ্গ' (Bang) নামাংকিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কৈকায়ুসের সময়ে ত্রিবেণী জয় করেন জাফর খাঁ। বিহারও কৈকায়ুসের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রুকনুদ্দিনের পুত্র সামসুদ্দিন

ফিরুজশাহ (১৩০১- ২২ খ্রীঃ) লক্ষ্মণাবতী শাসন করেছিলেন। সামসুদ্দিনের রাজত্বকালে বলবনী বংশের সাম্রাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছিল। সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) মৈমন সিংহ, সোনার গাঁও, শ্রীহট্ট পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ত্রিবেণী-বিজয়ী জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম জয় করেন। শাহ্ জালাল নামে এক দরবেশ শ্রীহট্ট জয় করেন। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে সপ্তগ্রামের রাজা ভূদেব এবং শ্রীহট্টের রাজা গৌর-গোবিন্দ দেব ফিরুজের সৈন্যদলের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন।[১]

তুঘরল খানের পরবর্তী শাসকগণ

ফিরুজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে গৃহবিবাদ সুরু হয় এবং গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বঙ্গভূমি অধিকার করেন। তিনি নাসিরুদ্দিন ইব্রাহিমকে বঙ্গভূমির শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তাতার খাঁ সোনার গাঁও এবং সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বঙ্গদেশ থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পরে পুত্র জুনাখানের দ্বারা নিহত হন (১৩২৫ খ্রীঃ)। জুনাখান মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে দিল্লী থেকে পিণ্ডার খি্লজিকে কদর খান উপাধি দিয়ে লক্ষ্মণাবতীর অধিকর্তা হিসাবে প্রেরণ করেন। বাহাদুর শাহকে সোনার গাঁও এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। ইজ্-উদ্দিন-ইয়াহা সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা হন। বঙ্গভূমিকে উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। দশ বৎসর তাঁরা লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও শাসন করেছিলেন মহম্মদ-তুঘলকের অধীনস্থ শাসক হিসাবে।

বহরাম খানের মৃত্যুর পর ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯ খ্রীঃ), ইখতিয়ারুদ্দিন গাজী শাহ (১৩৪৯-৫২) এবং আলাউদ্দিন আলি শাহ (১৩৫২-৫৯) বঙ্গদেশে রাজত্ব করেছিলেন। আলাউদ্দিন আলি শাহকে হত্যা করে তাঁর কর্মচারী মালিক ইলিয়াস হাজী সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম নিয়ে লক্ষ্মণাবতীর মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নেপাল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন, সোনারগাঁও এবং কামরূপের অংশ বিশেষ জয় করেন এবং বারাণসী পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেছিলেন। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইলিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে ত্রিহুত

ইলিয়াস শাহের আমল

১। History of Mediaeval Bengal—R. C. Mazumdar pp. 17—19.

(মিথিলা) ও নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি অধিকার করেন। তিনি পাণ্ডুয়াও অধিকার করেছিলেন। সামসুদ্দিন দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একডালা দুর্গ (মালদহের নিকটে) বর্ষাকালে জয় করা অসম্ভব জেনে ফিরোজ শাহ সামসুদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরোজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পরে সামসুদ্দিন সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন এবং সমগ্র হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ইলিয়াস শাহ প্রকৃতপক্ষে দিল্লীর অধীনতাপাশ মুক্ত বঙ্গের স্বাধীন সুলতান।

সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-৮৯ খ্রীঃ) বঙ্গদেশের সুলতান হন। তাঁর সময়ে বঙ্গদেশে শান্তি বিরাজ করছিল। তিনি পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক মসজিদ স্তম্ভ ইত্যাদি তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। হুগলী জেলার মোল্লা সিমলাতে একটি মসজিদ তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এই সময়ে মুকুট রায় নামে এক হিন্দুরাজা রাঢ়ের পূর্বাঞ্চল শাসন করতেন। তাঁর রাজ্য পাবনা ফরিদপুর যশোর নদীয়া থেকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সিকন্দর শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের দুর্বলতার সুযোগে রাজা গণেশ দনুজ মর্দনদেব উপাধি ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে (১৪১৭-১৮ খ্রীঃ) বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত চণ্ডীপরায়ণ দনুজ মর্দনদেব ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা পাওয়া গেছে। মহেন্দ্র দেব সম্ভবতঃ রাজা গণেশের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি অল্প কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। "গণেশের রাজ্যের আয়তন যে বিশাল ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া, উত্তরপূর্ব বঙ্গের সোনার গাঁও এবং দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের চট্টগ্রাম থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল। এ ছাড়া মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের কতকাংশও তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১]

রাজা গণেশ

গণেশের জ্যেষ্ঠপুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪১৮ খ্রীঃ)। জালালুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সামসুদ্দিন আহমদ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৩১ খ্রীঃ)। "জালালুদ্দিনের রাজ্যের আয়তন খুবই বিশাল ছিল। ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়া,

১। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৪১

সোনার গাঁও, ময়াজ্জমাবাদ, সাতগাঁও, চাটগাও, ফতেহাবাদ ও রোটাসপুর থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবটাই, দক্ষিণবঙ্গের এক বৃহৎ অংশ এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।...১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান জালালুদ্দিনের সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল।"[১]

যদু ও পরবর্তী মুসলমান রাজগণ

আহমদ শাহ অল্প কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি নিহত হন। অতঃপর ইলিয়াসশাহী বংশের নাসিরুদ্দিন মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বালিয়াঘাটা (জঙ্গীপুর), গৌড়, সাতগাঁও, হজরৎ, পাণ্ডুয়া, নসওয়ালাগলি (ঢাকা), ভাগলপুর, মুঙ্গের, ঘঘরা (মৈমনসিংহ) ও কিওয়ার জোরে (ময়মনসিংহ) তাঁর শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া নরিণ্ডা (ঢাকা), ত্রিবেণী ও বাগেরহাটে তাঁর তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।[২] এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল উড়িষ্যার অধিকারভুক্ত ছিল। রাজা কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৩৬-৭০ খ্রীঃ) একটি অনুশাসনে (১৪৪৭ খ্রীঃ) কপিলেন্দ্রদেব নিজেকে গৌড়েশ্বর বিশেষণে ভূষিত করেছেন। মাহমুদ শাহের মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, ভাগলপুর, সাতগাঁও, বাগেরহাট, ফরিদপুর এবং মুসরতবাদ (করতোয়া নদীর তীরে ঘোরাঘাট সরকারে অবস্থিত) তাঁর শাসনাধীনে ছিল। ত্রিবেণী লিপি (১৪৫৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে ২৪ পরগণার অংশবিশেষ সপ্তগ্রাম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।[৩]

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ

পরবর্তী সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের পুত্র রুকনুদ্দিন বরবক শাহের আমলে (১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ) সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী-মন্দারণ মুসলমান শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। "তাঁর বহু শিলালিপি এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এগুলি এই সমস্ত স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে—ত্রিবেণী (হুগলী), বারা (বীরভূম), গৌড়, মহীসন্তোষ (দিনাজপুর), হাটখোলা (শ্রীহট্ট), দেওতলা (মালদহ), পেরিল (ঢাকা), মীর্জাগঞ্জ (বাখরগঞ্জ), শুরাই (ময়মন-

রুকনুদ্দিন বরবক শাহ

১। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, ২য়, সং পৃঃ ১৫২-৫৩
২। তদেব পৃঃ ১৮১
৩। History of Bengal, vol. II, p. 132

সিংহ), বসিরহাট (২৪ পরগণা), জোবরা (চট্টগ্রাম)...এর থেকে বোঝা যাবে, বরবক শাহের রাজ্যের আয়তন কত বিশাল ছিল। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এবং বিহারের কতকাংশ তাঁর বাক্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"[১]

বরবক শাহের পুত্র সামসুদ্দিন ইউসুফের (১৪৭৪-৮১ খ্রীঃ) আমলে পাণ্ডুয়ার (হুগলী) সূর্যমন্দিরকে মসজিদ ও মীনারে পরিণত করা হয়। ইউসুফ শাহের পরে গৌড়ের সুলতান হয়েছিলেন জালালুদ্দিন ফতে শাহ (১৪৮১-৮৭ খ্রীঃ)।

জালালুদ্দিন ফতে শাহ

তাঁর সময়ে সোনার গাঁও ও সাতগাঁওতে যে লিপি পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় যে, তিনি শ্রীহট্ট ও ২৪ পরগণার অধীশ্বর ছিলেন। সপ্তগ্রাম লিপিতে লৌবল (২৪ পরগণা) এবং সেলিমাবাদের উল্লেখ আছে। সেলিমাবাদকে বর্ধমান জেলায় দামোদর তীরবর্তী বর্ধমানের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত সেলিমাবাদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। এই বিবরণগুলি থেকে দেখা যায় যে বর্ধমান অঞ্চল (পূর্ববর্তী বর্ধমান ভুক্তি) ইলিয়াস শাহী বংশের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে মুসলমান রাজাদের অধিকারভুক্ত হয় নি। ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম ও বর্ধমান অঞ্চল ইলিয়াস শাহের আমল থেকে মুসলমান শাসকদের অধিকারে আসে।

মুসলমান রাজাদের আমলে বর্ধমান

কিন্তু মুসলমান আমলে বর্ধমানের প্রাধান্য ছিল না। তাই মুদ্রায় বা শিলা-লিপিতে বর্ধমানের নাম পাওয়া যায় না। এই সময়ে গৌড়-পাণ্ডুয়ার পরই সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। হিন্দু আমলের বর্ধমানভুক্তি (অন্ততঃ অংশতঃ) মুসলমান শাসকদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

জালালুদ্দিন ফতে শাহের পরে পর পর কয়েকজন হাবসী রাজা গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলেন। হাবসী রাজাদের মধ্যে সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের শিলালিপি কালনায় পাওয়া গেছে। সুতরাং বর্ধমান অঞ্চল সৈফুদ্দিনের রাজ্যভুক্ত ছিল। হাবসী রাজাদের শেষ রাজা শামসুদ্দিন মুজফ্ফর শাহের পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে রাজত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সব অঞ্চলে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল না।[২] তাঁর রাজ্য গৌড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হাবসী রাজাদের রাজত্ব

১। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃঃ ২০৯

২। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃঃ ২৬৭

সম্ভবতঃ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ মুজাফ্ফর শাহকে হত্যা করে। উদার প্রকৃতির সুলতান হিসাবে হোসেন শাহের নাম সুবিখ্যাত। তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে মন্দারণ, ত্রিবেণী, মঙ্গলকোট (বর্ধমান), বাদশাহী সড়ক (বীরভূম), ব্যাণ্ডেল (হুগলী) এবং মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি জেলার বহু স্থানে এবং বিহারে। "এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের প্রায় সবটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।"[১] সুতরাং হোসেন শাহের রাজত্বকালে বর্ধমান অঞ্চল তাঁর রাজ্যের সীমানাভুক্ত ছিল।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজ্য

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর নসরত শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) এর সময়ে দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাবর গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন (১৯২৯ খ্রীঃ ২রা ও ৬ মে) এবং দুবারই পরাজিত হয়েছিলেন। তৃতীয় বারে বাবর জয়ী হলেও নসরতের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। গৌড় রাজ্য অবশ্যই বাবরের রাজ্যভুক্ত হয় নি। নসরত শাহের আমলে মঙ্গলকোটে বড়বাজার নূতনহাটের মসজিদ (১৫২৪ খ্রীঃ), সপ্তগ্রামে মসজিদ (১৫৩০ খ্রীঃ) নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং বর্ধমান নসরতের শাসনাধীন ছিল। নসরতের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৫৩২- ৩৩ খ্রীঃ) কয়েকটি মুদ্রা এবং একটি শিলালিপি (২৭শে মার্চ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ) পাওয়া গেছে। ফিরোজ শাহের অনুরোধে কবি শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেছিলেন। সুতরাং বর্ধমান যে ফিরোজ শাহের শাসনাধীন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

নসরত শাহের রাজত্ব

ফিরোজ শাহের রাজ্য

ফিরোজ শাহকে হত্যা করে হোসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮ খ্রীঃ) গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে শের খাঁ গৌড় অধিকার করেছিলেন ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল। গৌড়বঙ্গে স্বাধীন সুলতানদের দুশো বছরের রাজত্বের অবসান হোল। মাহমুদ শাহ হুমায়ুনকে শের খাঁর হাত থেকে রক্ষার জন্য আহ্বান জানান। হুমায়ুন যখন তেলিয়াগড়ি অধিকার করে অগ্রসর হচ্ছিলেন,

মাহমুদ শাহের আমল

১। তদেব পৃঃ ৩৮৪-৮৫

সেই সময়ে মাহমুদ শাহের মৃত্যু হয়। হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই ১৫৩৮ খ্রীঃ)। হুমায়ুনকে মাহ্‌মুদ জানিয়েছিলেন যে, গৌড় ছাড়া সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁর অধিকারে ছিল। গিয়াসুদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য বিস্তারের অনুমতি লাভ করে। পর্তুগীজ সেনাপতি দিওগো রেবেলো গোয়া থেকে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন। মাহ্‌মুদ শাহ রেবেলোকে অভ্যর্থনা করার জন্য সপ্তগ্রামের শাসনকর্তাকে আদেশ দেন। পর্তুগীজরা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যঘাঁটি স্থাপন করে। মাহ্‌মুদ পর্তুগীজদের বসবাসের জন্য জমি বাড়ী ও খাজনা আদায়ের অধিকার দান করেছিলেন। পর্তুগীজদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সাতগাঁও অঞ্চল মাহ্‌মুদ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমা মুঙ্গের ও পাটনার মধ্যবর্তী সুরজগড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আকবরনামা থেকে জানা যায় যে দক্ষিণপূর্বে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল চট্টগ্রাম পর্যন্ত।[১] হোসেন শাহ্‌ ও তাঁর বংশধরদের আমলে "বাঙ্গালার মুসলমান রাজ্য সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। উত্তরে কামরূপ ও কামতাপুর, দক্ষিণপূর্বে ত্রিপুরা ও পশ্চিমে যুক্ত প্রদেশের (উত্তর প্রদেশ) পূর্বসীমা পর্যন্ত গৌড়রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল।"[২]

হুমায়ুন জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর শের খাঁ গৌড় জয় করেন। জাহাঙ্গীর কুলি বেগ পরাজিত ও নিহত হন। শের খাঁ ফরিদউদ্দিন আবুল মুজাফর শেরশাহ্‌ নাম গ্রহণ করে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন (১৫৩৯ খ্রীঃ)। বাঙ্গালাদেশে অবিরত বিদ্রোহের প্রকাশ বন্ধ করার জন্য শেরশাহ সমগ্র বঙ্গদেশকে কয়েকটি জায়গীরে বিভক্ত করে নিজের অনুগত ব্যক্তিদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সমগ্র রাজ্যকে তিনি ১১৬০০ পরগণায় বিভক্ত করে প্রতি পরগণায় পাঁচজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শেরশাহের রজতমুদ্রা বহু স্থান থেকে মুদ্রিত হয়েছিল, তন্মধ্যে সপ্তগ্রাম থেকে নির্মিত মুদ্রাও পাওয়া যায়।[৩] বর্ধমান যে শেরশাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ বর্ধমান শহরের পুরাতন চক্ এলাকায় কালমসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে।[৪]

শেরশাহের আমলে বঙ্গদেশ

১। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃঃ ৪৫২
২। তদেব ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫
৩। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬৬
৪। বর্ধমান: ইতিহাস ও সংস্কৃতি—২য় খণ্ড—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃঃ ৮৪

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে বাঙ্গালার পাঠান শাসনকর্তা সামসুদ্দিন মহম্মদ শাহ গাজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে মহম্মদ শাহ আমলের সেনাপতি হিমুর দ্বারা নিহত হন। শামসুদ্দিন মহম্মদ শাহের পুত্র খিজির খাঁ বঙ্গদেশের মসনদ অধিকার করেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)। বঙ্গদেশের শাসনকর্তা শাহাবাজ খাঁকে হত্যা করে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহ বঙ্গের অধীশ্বর হন। তিনি বঙ্গদেশ ও ত্রিহুত নিজ অধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে কালনায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই অঞ্চল তাঁর অধিকার ভুক্ত ছিল।

শেরশাহের পরবর্তী মুসলমান শাসকগণ

শের শাহের সৈন্যাধ্যক্ষ তাজ খাঁ করণানি গৌড় অধিকার করেন। তাজ খাঁ বিহারের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চল অধিকার করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাজ খাঁর পুত্র সুলেমান করণানি (১৫৬৫-৭২ খ্রীঃ)। সুলেমানের রাজ্য বিস্তৃত ছিল দক্ষিণে পুরী, পশ্চিমে শোন ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত। সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যার বহু মন্দির ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করেছিলেন।

সম্রাট আকবরের সৈন্যদল পুনরায় গৌড় উদ্ধার করে। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুলাই রাজমহলের নিকট আকবরের সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁ তুর্কমান ও রাজা তোডরমল সুলেমান করণানির পুত্র দাউদ শাহকে পরাজিত, বন্দী ও নিহত করেন। দাউদ শাহ গৌড়ের শেষ স্বাধীন সুলতান। অতঃপর গৌড়রাজ্য বা বঙ্গদেশ মোঘলদের পদানত হয়। এই সময়ে বর্ধমান হয়েছিল মোঘল সৈন্যদের প্রধান ঘাঁটি। রাজা তোডরমল বর্ধমান থেকে গড় মান্দারণে (হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমায়) দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করে ছিলেন। দাউদ মেদিনীপুরের দেব্রকেশরী অভিমুখে পলায়ন করলে, তোডরমল মান্দারণ থেকে মেদিনীপুরের গজহরিপুর (দাঁতন ষ্টেশনের নিকটে) উপস্থিত হন। মেদিনীপুরে মহম্মদ কুলির মৃত্যু হওয়ায় তিনি মান্দারণে ফিরে আসেন এবং বর্ধমান থেকে পুনরায় সৈন্য প্রেরণ করেন। অবশেষে দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

মোঘল আমলে বর্ধমান

১। History of Bengal. vol. II p. 190

স্বাধীন সুলতানদের আমলে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় নামের পরিবর্তে বাঙ্গালা নাম ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল আকবর খান্-ই-আজমকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মোঘল শাসনের প্রথম যুগে মানসিংহের পূর্ব পর্যন্ত (আঃ ১৫৯০ খ্রীঃ) বাঙ্গালার রাজধানী ও প্রধান সামরিক ঘাঁটি ছিল মালদহ শহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপূর্বে তান্দা। এখান থেকে উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ শাসন করা সুবিধাজনক ছিল। বর্ধমান থেকে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত দক্ষিণাংশ বর্ধমান থেকে শাসিত হোত। সপ্তগ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সহ আরামবাগ মহকুমা পর্যন্ত মন্দারণ সরকার নামে পরিচিত ছিল। মেদিনীপুর জেলা এবং উড়িষ্যার অংশ বিশেষ জলেশ্বর সরকার নামে পরিচিত হয়।[১]

দাউদ খাঁর মৃত্যুর পর উড়িষ্যার পাঠান সুলতান কতলু খাঁ সসৈন্যে মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী অধিকার করে দামোদর পার হয়ে বর্ধমানে উপস্থিত হন।

কতলু খাঁ

এই সময়ে তিনি বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। কিন্তু বিপুল মোঘল বাহিনী দামোদর অতিক্রম করে পাঠানদের পরাজিত করলে কতলু সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং সুযোগমত দামোদর অতিক্রম করে উড়িষ্যা থেকে আগত পাঠান সৈন্যের সাহায্যে হুগলী ও বর্ধমান জেলায় লুণ্ঠন চালাতে থাকেন। এই সময়ে শাহবাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন।

শাহবাজ খাঁর নেতৃত্বে মোঘলবাহিনী পাঠান সৈন্যদের বিতাড়িত করে মঙ্গলকোটে উপস্থিত হয়। মঙ্গলকোটে মোঘল সৈন্য পাঠানদের হাতে পরাজিত হয়। তাণ্ডা থেকে অধিকসংখ্যক মোগল উপস্থিত হওয়ায় মঙ্গলকোটের যুদ্ধে কতলু খাঁ পরাজিত হয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন।

মানসিংহের নেতৃত্বে বিশাল মোঘলবাহিনী সেলিমাবাদ ও জাহানাবাদে (আরামবাগ) শিবির স্থাপন করেন। মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহ একদল মোগল সৈন্যসহ গড় মান্দারণ দুর্গ রক্ষা করছিলেন। কতলু খাঁর কৌশলে তিনি বন্দী হন এবং বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীর তাঁকে উদ্ধার করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কতলুর মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্র মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করেন। ওসমান খানের নেতৃত্বে পাঠানগণ একত্রিত হয়ে মেদিনীপুর ও বর্ধমান অধিকার করে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত সেরপুর-আতাই এর যুদ্ধে মানসিংহের নেতৃত্বে মোঘল বাহিনী পাঠানদের পরাজিত করে

১। Ibid p. 201

উড়িষ্যায় বিতাড়িত করে। এই সময়ে বর্ধমান শহর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ফতে সিং পরগণা পর্যন্ত সরিফাবাদ সরকার বিস্তৃত ছিল।

দাউদের মৃত্যুর পর বাঙ্গালাদেশে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে কুড়ি বৎসর সময় লেগেছিল। সম্রাট আকবর সমগ্র রাজ্যকে কতকগুলি সুবাতে বিভক্ত করেছিলেন। প্রতিটি সুবায় শাসনকর্তা ছিলেন সুবাদার বা সিপাহশালার। বাঙ্গালার সুবাদার খান-ই-জাহান মাত্র তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। তারপরে মুজাফর খান সুবাদার হন।

আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ

১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে আকবর মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ৭ই নভেম্বর রাজমহলের নিকটে আকবর নগর নামে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুই পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে মানসিংহ সম্রাটের অনুমতিক্রমে আজমীরে প্রত্যাবর্তন করেন (১৫৯৮ খ্রীঃ)। মানসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎসিংহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে জগৎ-সিংহের আগ্রায় মৃত্যু হওয়ায় জগৎসিংহের পুত্র মহাসিংহ উপ-সুবাদার হিসাবে বাঙ্গালায় প্রেরিত হন। কিন্তু মানসিংহের অনুপস্থিতিতে বাঙ্গালায় ও উড়িষ্যায় বিদ্রোহ দেখা দিলে মানসিংহকে পুনরায় বাঙ্গালায় আসতে হয় (১৬০১ খ্রীঃ)।

আকবরের মৃত্যুর পর (১৬০৫ খ্রীঃ) সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসার পর মানসিংহকে পুনরায় বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন (১০ই নভেম্বর ১৬০৫ খ্রীঃ)। পরে মেহের উন্নিসাকে লাভ করার জন্য জাহাঙ্গীর তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন (২রা সেপ্টেম্বর ১৬০৬ খ্রীঃ) এবং মানসিংহকে বাঙ্গালা থেকে সরিয়ে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন।[১] শের আফগান ইষ্টালজু (Sher Afgan Istalju) সে সময়ে বর্ধমানের ফৌজদার (তুর্কীদেশীয় ক্ষুদ্র জায়গীরদার) ছিলেন। তাঁর পত্নী ছিলেন অনুপম রূপের অধিকারিণী মেহের উন্নিসা। কিম্বদন্তী অনুসারে সেলিম মেহের উন্নিসার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাট আকবর শের আফ্‌গানের সঙ্গে মেহের উন্নিসার বিবাহ দিয়ে শের আফ্‌গানকে বর্ধমানের

জাহাঙ্গীরের আমলে বঙ্গদেশ

বর্ধমানের ফৌজদার শের আফ্‌গান

১। History of Bengal, vol. II pp. 213-15

ফৌজদার করে পাঠিয়েছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদে জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে বসার এক পক্ষকাল পরেই জাহাঙ্গীর মানসিংহকে বাঙ্গালা থেকে সরিয়ে দিলেন। পরিবর্তে তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে শের আফগানকে হত্যার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কুতুবুদ্দিন শের আফগানের সঙ্গে বর্ধমানে সাক্ষাৎ করেন এবং পারস্পরিক কথাবার্তার সময়ে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করেন। ফলে শের আফগান এবং কুতুবুদ্দিন উভয়েই নিহত হন (১৬০৭ খ্রীঃ)। বর্ধমানে এখনও উভয়ের সমাধি বিদ্যমান। শের আফ্গান নিহত হওয়ার পর জাহাঙ্গীর মেহের উন্নিসা বা নূরজাহানকে দিল্লীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনবদ্য ভাষায় এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—

দিনের পরে দিন গেল ঢের ছ'টা ঋতুর ফুলবোনা,
বাদশাজাদা বাদশা হ'ল তোমায় তবু ভুলল না ;
অন্যায়ের সে বৈরী চির, ভুলল হঠাৎ ধর্ম ন্যায়
ডুবে গেল তলিয়ে গেল রূপের মোহের কি বন্যায়।
কুচক্রে তার প্রাণ হারাল সরল পাঠান মহাপ্রাণ
উদারচেতা সিংহজেতা সিংহতেজা শের আফগান।
সেলিমের দুধমায়ের ছেলে সুবাদারীর তৃষ্ণাতে
মারতে এসে পড়ল মারা শেরের অসি-সংঘাতে ;
তেজস্বী শের ঘৃণ্য কুতুব পাশাপাশি ঘুমায় আজ
রাঢ়ের মাটি রাঙিয়ে দ্বিগুণ জাগছে জাহাঙ্গীরের লাজ !

(কবর-ই-নূরজাহান)

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইসলাম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হয়েছিলেন। মানসিংহ ঢাকায় দুই বৎসর ছিলেন (১৬০২—০৪ খ্রীঃ)। ইসলাম খাঁ বারো ভুঁইয়াদের দমন করে পাঠান সর্দারদের সায়েস্তা করে বঙ্গদেশে মোঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন পাঁচ বৎসরের মধ্যে। ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাসিম খাঁ সুবাদার হন (১৬১৪—১৭ খ্রীঃ)। কাসিম খাঁর দুর্বল শাসনে জমিদাররা অনেকেই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে। পরবর্তী সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ (১৬১৭—২৩ খ্রীঃ) মোঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পরবর্তী সুবাদার ইসলাম খাঁ ও কাসিম খাঁ

মানসিংহের আমলে ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানীতে পরিণত হয়। ইসলাম খাঁ নানাভাবে ঢাকাকে সুরক্ষিত করেন এবং উন্নয়ন সাধন করেন। পুরাতন রাজধানী রাজমহল ক্রমে পরিত্যক্ত হয়। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় ও নূতন নামকরণ হয় জাহাঙ্গীর নগর।

১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরম (শাহ্‌জাহান) দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ করেন। জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মহাবত খান ও শাহজাদা পরভেজ-এর দ্বারা তাড়িত হয়ে তিনি সসৈন্যে বাঙ্গালায় উপস্থিত হন। ইব্রাহিম খাঁ জাহাঙ্গীরের পক্ষে থাকা সত্ত্বেও প্রথমে শাহ্‌জাহানকে বাধা দেন নি। শাহজাহান বিনা বাধায় মেদিনীপুর ও বর্ধমান অধিকার করেন। বর্ধমানে প্রথম তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন ফৌজদার মীর্জা আলি। শাহজাহানের সৈন্যদল বর্ধমান শহর অবরোধ করেন এবং বাদশাহী সৈন্যদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। পরে শাহজাহান বর্ধমান অধিকার করে বৈরাগ বেগকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন, পরে রাজমহল বা আকবর-নগর এবং জাহাঙ্গীর নগর অধিকার করে স্বাধীন সুলতান হিসাবে বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন (অক্টোবর ১৬২৪ খ্রীঃ)। ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হন।

শাহজাহানের বর্ধমান অধিকার

শাহজাহান দিল্লীর অধীশ্বর হওয়ার পর পুত্র সুজাকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন (১৬৩৯—১৬৫৯ খ্রীঃ)। শাহজাহানের রাজত্বের মধ্যভাগে সরকার সুলেমানাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন করা খাঁ। ক্ষমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গলে করা খাঁর উল্লেখ আছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে পানাগড় ষ্টেশনের দু' মাইল দক্ষিণে সিলামপুর গ্রামে করা খাঁর সমাধি আছে।

শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগে তাঁর পুত্রদের সিংহাসনলাভের জন্য কলহের ফলে সুজা বাঙ্গালাদেশ থেকে আরাকানে বিতাড়িত হন। সুজার পরে ঔরঙ্গজেব মীরজুমলাকে (১৬৬০-৬৩ খ্রীঃ) বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মীরজুমলার মৃত্যুর পর (৩১শে মার্চ ১৩৬৩ খ্রীঃ) সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সায়েস্তা খাঁর পরে ইব্রাহিম খান হন বাঙ্গালার সুবাদার। মোঘল আমলে বর্ধমান চাকলা মোঘল শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল সমগ্র বঙ্গদেশের সঙ্গে। তথাপি মোঘল আমলে বর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিল। প্রকৃতপক্ষে বর্ধমানের স্বতন্ত্র ইতিহাস বর্ধমানের জমিদার বা রাজবংশের ইতিহাস।

ঔরঙ্গজেবের আমলে বঙ্গদেশ

বর্ধমানের রাজবংশের ইতিহাস ঃ

বর্ধমানের রাজবংশের পূর্বপুরুষ সঙ্গম রায় বা সঙ্গম রাই পাঞ্জাবের লাহোর চাকলার কোট্‌লী মহল্লার অধিবাসী ক্ষেত্রী বা ক্ষত্রিয় জাতীয় ছিলেন। এঁরা ক্ষত্রিয় হলেও ছিলেন ব্যবসায়ী। কিম্বদন্তী অনুসারে সঙ্গম রায় পুরীতে জগন্নাথ দর্শনের পরে প্রত্যাবর্তনকালে পথ ভুলে বর্ধমানে উপস্থিত হন এবং গাংপুরের কাছে তৎকালীন বাদশাহী রোডের বা জি. টি. রোডের পাশে বল্লুকা নদীর তীরে তাঁবু ফেলেছিলেন ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন শের আফগান ছিলেন বর্ধমান চাকলার ফৌজদার। সঙ্গম রায় আর পাঞ্জাবে ফিরে যান নি। শাল, কম্বল ইত্যাদির ব্যবসা করতেন এবং তেজারতি কারবার চালাতেন। তিনি বর্ধমান থেকে পাঁচ মাইল দূরে বাণিজ্যক্ষেত্র বৈকুণ্ঠপুরে বসতি স্থাপন করেন। সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায়। তৎপুত্র আবুরাম রায় বর্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে বর্ধমান নগরের অন্তর্গত যোগলটুলি, ইব্রাহিমপুর ও রেকাবে বাজারের চৌধুরী ও কোতোয়ালের পদ লাভ করেন ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পুত্র বাবুরাম রায় বর্ধমান ও অন্য তিনটি মহালের অধিকার লাভ করেন বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার খাজনার বিনিময়ে। বাবুরাম রায়ের পুত্র ঘনশ্যাম রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায় এই জমিদারী প্রসারিত করেন ও সেন পরগণা নিজের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের এক ফরমান অনুসারে কৃষ্ণরাম পরগণা বর্ধমানের জমিদার ও চৌধুরী পরিচয়ে সম্মানিত হন। কৃষ্ণরাম বর্ধমান শহরে একটি বিশাল দীঘি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই দীঘি কৃষ্ণসায়র নামে অদ্যাপি বিদ্যমান।[1] ঘনশ্যাম রায় শ্যামসায়র নামে একটি দীঘি খনন করিয়েছিলেন ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সঙ্গম রায়

সঙ্গম রায়ের বংশধরগণ

মেদিনীপুরের ঘাটাল-চন্দ্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত চেতো বরদার জমিদার শোভা সিংহ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিবেশী জমিদারের অধিকারভুক্ত জনপদসমূহ লুণ্ঠন করতেন। কৃষ্ণরাম স্বল্প পিরিমিত সৈন্য নিয়ে শোভা সিংহকে বাধা দিতে গিয়ে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পরাজিত ও নিহত হন।

শোভা সিংহির বর্ধমান অধিকার

১। বর্ধমান পরিচিতি– নারায়ণ চৌধুরী—পৃঃ ৩৭।

শোভা সিংহের হাতে কৃষ্ণরামের স্ত্রী ও কন্যাগণ বন্দী হন। শোভা সিংহ সমস্ত ধনসম্পদসহ বর্ধমান নগর অধিকার করে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন।

উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খান সসৈন্যে শোভা সিংহের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় শোভা সিংহের শক্তি বর্ধিত হয়। শোভা সিংহ হুগলী নদীর পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ মাইল দীর্ঘ একটি পথ অধিকার করেন।

কৃষ্ণরাম রায়ের হত্যার পর তাঁর পুত্র জগৎরাম রায় ঢাকায় পলায়ন করেন ও সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে শোভা সিংহের বিদ্রোহের কাহিনী বিজ্ঞাপিত করেন।

শোভা সিংহের হুগলী অধিকার

ইব্রাহিম খাঁ প্রথমে এই ঘটনাকে গুরুত্ব দেন নি। পরে ইব্রাহিম পশ্চিমবঙ্গের ফৌজদার নুরুল্লা খানকে শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমন করতে আদেশ দেন। নুরুল্লা খান শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর মিলিত বাহিনীকে ভয় পেয়ে হুগলী দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিদ্রোহী সৈন্যদল হুগলী দুর্গ দখল করে। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই ফৌজদার সসৈন্যে হুগলী দুর্গ থেকে পলায়ন করেন। শোভা সিংহের সৈন্যদল হুগলী লুণ্ঠন করেন। ফৌজদারের আবেদনক্রমে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ শক্তি ৩০০ সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন স্থলপথে হুগলী আক্রমণ করতে। সেই সঙ্গে ওলন্দাজরা দুটি রণতরী পাঠিয়েছিলেন নদীবক্ষ থেকে গোলাবর্ষণ করার জন্য। বিদ্রোহী সৈন্য ২০০ অশ্বারোহী ও ১০০ পদাতিক সহ পলায়ন করেন।

হুগলী থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর (জুলাই ১৬৯৬ খ্রীঃ) শোভা সিংহ বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজা কৃষ্ণরামের বন্দিনী সুন্দরী কন্যা সত্যবতীকে

শোভা সিংহের মৃত্যু

শোভা সিংহ ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে তেজস্বিনী সত্যবতী শোভা সিংহকে ছুরিকা দ্বারা হত্যা করেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করেন।

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হিম্মৎ সিং সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সৈন্যগণ রহিম খাঁকেই নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন। রহিম খাঁ রহিম শাহ নাম গ্রহণ করে রাজা হয়ে বসলেন। এই সময়ে বহু লোক রহিমের

রহিম খাঁর বর্ধমানের রাজ্যাধিকার

সৈন্যদলে যোগ দেয়। দশ হাজার অশ্বারোহী ও ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে রহিম নদীয়ার মধ্য দিয়ে মনসুরাবাদ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ) অভিমুখে অগ্রসর হন।

স্থানীয় জায়গীরদার নমৎ খান ও তাঁর ভাইপো তাহাওয়ার খান রহিমকে বাধা দিতে গিয়ে নিহত হন। রহিম মনসুরাবাদ লুণ্ঠন করে রাজমহল ও মালদহ অধিকার করেন (মার্চ ১৬৯৭ খ্রীঃ)।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খাঁর উপরে বিরক্ত হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন এবং সম্রাটের পৌত্র আজিম উদ্দিন (আজিম-উস্-সান নামে পরিচিত)-কে বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করেন। জবরদস্ত খাঁ রহিম শাহকে পরাজিত করে রাজমহল, মালদহ, মকসুদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করেন। বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় যুদ্ধ বন্ধ থাকে। জবরদস্ত বর্ধমানে এবং আজিম উদ্দিন মুঙ্গেরে বর্ষা যাপন করেন। নভেম্বর মাসে শাহজাদা আজিমউদ্দিন বর্ধমানে উপস্থিত হন। তিনি জবরদস্ত খানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় জবরদস্ত পিতার সঙ্গে বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন।

আজিমউদ্দিন একবৎসর কাল বর্ধমানে যাপন করেন। জবরদস্ত বঙ্গদেশ ত্যাগ করার ফলে মোঘল বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে রহিম খাঁ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি নদীয়া ও হুগলী লুণ্ঠন করার পরে বর্ধমানের নিকটে উপস্থিত হন। আজিমউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা রহিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হন।

আজিম-উস্-সানের আমলে বর্ধমান

এইভাবে ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে বিদ্রোহদমন সম্পূর্ণ হয়। আজিম-উস্-সান ১৬৯৭ থেকে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। তিনি তিন বৎসর বর্ধমানে অবস্থান করে শান্তি স্থাপন করেছিলেন। বিদ্রোহীদের অধিকৃত জমিদারী, জায়গীর, আয়মা প্রভৃতি পূর্বাধিকারীদের প্রত্যপর্ণ করে, কোথাও নূতন বন্দোবস্তের দ্বারা প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করে তিনি নিরুপদ্রবে বর্ধমান থেকে ঢাকা যাত্রা করেন।[১] তুর্কী-পাঠান আমলে বর্ধমান কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে নি। কিন্তু মোঘল আমলে বর্ধমান আবার শাসনকেন্দ্র হিসাবে প্রধান্য লাভ করে।

কৃষ্ণরাম নিজস্ব শক্তিতে অধিকৃত অঞ্চল ও মোঘল সম্রাটের সনন্দ বলে বিশাল জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম রায় কৃষ্ণরামের পরে বর্ধমানের জমিদার হন। জগৎরাম দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিকট

১। বাঙ্গালার ইতিহাস--কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সং ১৩১৫ পৃঃ ২২-৩২

থেকে দ্বিতীয় সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে জগৎরাম কৃষ্ণসায়রের নিকটে শত্রু-কর্তৃক নিহত হন। জগৎরামের সময়ে চম্পানগরী, জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) এবং পাণ্ডুয়া বর্ধমানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। জগৎরামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কীর্তিচন্দ্র জমিদারীর মালিক হন। কীর্তিচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা। তিনি চন্দ্রকোণা বর্দা, বালিগড়ি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের জমিদারীর অংশবিশেষ অধিকার করেন। চেতুয়া, ভুরশুট, বরদা, ও মনোহরশাহী তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে বিষ্ণুপুরের রাজাদের সঙ্গে সন্ধি করে তিনি নবাব আলিবর্দির পক্ষে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কীর্তিচাঁদের জমিদারির আয়তন ছিল ৫০০০ বর্গ মাইল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র পরলোক গমন করলে তাঁর উত্তরাধিকারী হন পুত্র চিত্রসেন। তিনি মণ্ডলঘাট, আরসা ও চন্দ্রকোণা পরগণা নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। বীরভূম, পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তাঁদের জমিদারীর অংশবিশেষ তিনি স্বীয় জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি রাজগড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। বীরভূমের প্রান্তে অজয়ের তীরে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করে দুর্গের নামকরণ করেন সেনপাহাড়ী। তিনি দিল্লীর বাদশাহের নিকট তৃতীয় সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন (১৭৪০ খ্রীঃ)।

জগৎরাম রায় ও কীর্তিচন্দ্র

চিত্রসেন নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর (১৭৪৪ খ্রীঃ) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তিলকচাঁদ রায় রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের কাছ থেকে তিনি চতুর্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে বাদশাহ শাহ আলম তাঁকে মহারাজাধিরাজ ও পঞ্চহাজারী খেতাব দান করেন। বর্গীর হাঙ্গামায় রাজস্ব আদায়ের অভাবে রাজকোষ শূন্য হওয়ায় অনাদায়ী করের জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় অবস্থিত বর্ধমান রাজ্যের সম্পত্তি ক্রোক করেন। এই ঘটনার প্রতিশোধকল্পে তিলকচাঁদ বর্ধমানে অবস্থিত কোম্পানীর সমস্ত কুঠি অধিকার করেন। পরে এই বিবাদের মীমাংসা হয়। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দির মৃত্যু ও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীরজাফরকে বাঙ্গালার মসনদে বসিয়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কার্যতঃ বাঙ্গালার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। এই সময়ে বর্ধমান কোম্পানীর হস্তে অর্পিত হয়। তখন বর্ধমানের

তিলকচাঁদ

আয়তন ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমান জেলার প্রায় দ্বিগুণ। বর্ধমান ছিল বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী জমিদারী। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ বর্ধমানের উপর দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করেন ও গঙ্গা অতিক্রম করে পলাশীতে উপস্থিত হন।

নবাব মীরজাফর প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অসমর্থ হওয়ায় বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্বের অংশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করেন। মহারাজ তিলকচাঁদ এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। ফলে কোম্পানীর সঙ্গে মহারাজের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মহারাজ তিলকচাঁদ কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রভুত্ব বা রাজস্ব আদায়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ মেনে নিতে পারেন নি। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কোম্পানীর সিপাহীদের সংঘর্ষে কোম্পানী পরাজিত হয়।

মীরজাফর গদিচ্যুত হলে (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁর জামাতা মীরকাসেম বাঙ্গালার নবাব হন। তিনি যুদ্ধের খরচ চালনার জন্য কোম্পানীর হাতে মেদিনীপুর চট্টগ্রাম ও বর্ধমান চাকলা অর্পণ করেন খাজনা আদায়ের অনুমতি সহ। তখন বর্ধমানের রাজস্ব স্থির হয় ৩১,৭৫৪০৬ সিক্কা। মীরজাফরের শোষণ, বর্গীর হাঙ্গামা ইত্যাদি কারণে তখন বর্ধমানের রাজকোষ শূন্য। সুতরাং মহারাজা কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব পরিশোধ করতে পারেন নি। কোম্পানী মহারাজকে হিসাবপত্র নিয়ে কলিকাতায় হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয় ও পরে তাঁকে গদিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অবশেষে কোম্পানীর সঙ্গে মহারাজার সন্ধি হয় এবং বকেয়া রাজস্ব বাবদ এগার লক্ষ টাকা কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কিস্তির টাকা ও মহারাজা শোধ করতে পারেন নি।

এই সময়ে মেদিনীপুর ও বীরভূমের রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মেজর হোয়াইট নামক একজন ইংরাজ সেনাপতি সসৈন্যে মেদিনীপুর আক্রমণ করে মেদিনীপুর অধিকার করেন। মেজর ইয়র্ক নামে আর একজন ইংরাজ নবাবী ফৌজ নিয়ে বীরভূম যাত্রা করেন। মেজর হোয়াইটও সসৈন্যে মেদিনীপুর থেকে বীরভূমের উদ্দেশ্যে রওনা হল। বর্ধমানের মহারাজার দশ হাজার সৈন্য মেজর ইয়র্কের পথ রোধ করে। এই সংঘর্ষে বর্ধমানের সৈন্যদল পরাজিত হয় (১৭৬০ খ্রীঃ)। মহারাজ তিলক চাঁদকে গদিচ্যুত না করে তাঁকে স্বপক্ষে রাখার ও রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে

কোম্পানীর একজন রেসিডেন্ট প্রেরণ করা হয়। এরপর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জনষ্টোন নামে এক ইংরাজ বর্ধমানের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ নিযুক্ত হন। জনষ্টোন প্রতি বৎসর নিলামে জমিদারীর অংশ বিলি করেও রাজস্ব আদায়ের উন্নতি করতে পারেন নি। তিনি নিজে বার্ষিক আশি হাজার টাকা বৃত্তি আদায় করতেন।

হে (Hay) এবং বোল্‌ট্‌স্‌ (Bolts) নামে আরও দুইজন সুপারিনটেন্‌ডেন্ট একই রীতিতে রাজস্ব আদায় করার চেষ্টা করেও উন্নতি করতে পারলেন না। ফলে তিন বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকার বেশী রাজস্ব অনাদায়ী থাকে। কোম্পানি ভেরেলস্ট্‌ (verelst) নামে আর এক ইংরাজকে বর্ধমানের সুপার-ভাইজার নিযুক্ত করেন। ভেরেলস্ট্‌ নিলাম প্রথার বিলোপ সাধন করে পুরাতন রীতিতে উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এই রীতিতে রাজস্ব আদায়ে উন্নতি দেখা দেয়। বাণিজ্যশুল্ক নিয়ে মীরকাসেমের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধের পরিণামে মীরকাসেমের পরাজয় ও মীরজাফরের পুনরায় মসনদপ্রাপ্তি ঘটলে মীরজাফর কোম্পানীর হাতে মেদিনীপুর চট্টগ্রাম ও বর্ধমানে কোম্পানীর অধিকারকে স্বীকৃতি দান করেন। ১৭৬৯-৭০ সালে বর্ধমানে প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। এই সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রকোপে বর্ধমানেরও দুর্দিন ঘনীভূত হয়।

মীরকাসেমের পরাজয়ের পর ইংরাজের সঙ্গে তিলকচাঁদের আপোষ মীমাংসা হয়। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের এক ফরমান অনুসারে তিনি রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ১৭৬৮ সালে তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি এবং পাঁচ হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন। এই সঙ্গে কামান ও রণবাদ্য ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন।

তিলকচাঁদের আমলে বর্ধমান জেলায় বহু মন্দির ও দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিলকচাঁদের মাতা লক্ষ্মীকুমারী কালনায় শ্রীকৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করান। চিত্রসেন রায়ের পত্নী ছত্রকুমারী কালনায় জগন্নাথ মন্দির ও জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ছত্রকুমারী জগন্নাথ বাটীতে রামেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। কীর্তিচাঁদের মাতা ব্রজকিশোরী কালনায় বৈকুণ্ঠনাথ শিবের মন্দির স্থাপন করেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিলকচাঁদের

মাতা লক্ষ্মীকুমারী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাঁইহাটে তিলকচাঁদ অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। খাস হাভেলীতে গঙ্গাতীরে তিলকচাঁদের অন্যতমা মহিষী বিষণকুমারী একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া তাঁর অনুগত আশ্রিত অনেকেই মন্দির ও দেববিগ্রহ স্থাপন করে তিলকচাঁদের ধর্মানুরাগের প্রমাণ রেখেছেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা তিলকচাঁদের মৃত্যুর পর জমিদারীর মালিক হন তাঁর ছয় বৎসর বয়স্ক নাবালক পুত্র তেজচন্দ্র। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এলাহাবাদের দরবার থেকে তেজচন্দ্রকে মহারাজা উপাধি এবং ৫০০০ পদাতিক সৈন্য, ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, কামান, সামরিক বাদ্য ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর সঙ্গে মহারাণীর মতবিরোধ হয়। মহারাণীর আপত্তি সত্ত্বেও তিলকচাঁদের দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর পরিবর্তে চুপী নিবাসী ব্রজকিশোর রায়কে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। মহারাণী তৎকালীন বর্ধমানের রেসিডেণ্ট্ হেষ্টিংসের বন্ধু গ্রেহাম ও ব্রজকিশোরের মাধ্যমে হেষ্টিংস্-এর বিরুদ্ধে নাবালক রাজার কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ কাউন্সিলে করলেও তা প্রমাণিত হয় নি। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারীর ভার ১৫ বৎসর বয়স্ক তেজচন্দ্রের হাতে অর্পণ করা হয়।

তেজচন্দ্র ও মহারাণী বিষণকুমারী

মহারাণী বিষণকুমারীর পরিচালনা কালে ছয় লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ায় হেষ্টিংস শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ মুন্সীকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট বর্ধমানের সাঁজোয়াল নিযুক্ত করেন। নবকৃষ্ণ তেজচন্দ্রকে রাজস্ব পরিশোধের জন্য বারো লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। নবকৃষ্ণ রাজস্ব আদায়ে বিশেষ উন্নতি করতে পারেন নি। আঠারো মাস পরে নবকৃষ্ণ পদচ্যুত হন এবং তেজচন্দ্র জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিষণকুমারী মাসিক ৪০০০ টাকা ভাতা নিয়ে অম্বিকা কালনায় বসবাস করতে থাকেন। রাজস্ব পরিশোধে অসমর্থতাহেতু তেজচন্দ্রকে গৃহবন্দী করা হয়। তাঁর জমিদারীর কয়েকটি পরগণা নিলাম হয় এবং রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশে তাঁর বহু মূল্যবান আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত হয়। তৎকালীন কালেক্টর সামুয়েল ডেভিসের পরামর্শে মহারাণী বিষণকুমারীকে জমিদারী পরিচালনার আংশিক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মাতা ও পুত্র পৃথক-

ভাবে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বিষণকুমারীর মৃত্যু হয়।

তেজচন্দ্রের জমিদারীর অংশ সিঙ্গুরের দ্বারিকানাথ সিংহ, ভাসতারার ছকু সিং, জনাই এর মুখোপাধ্যায় পরিবার ও তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার নিলামে ক্রয় করেছিলেন। জমিদারীর বেশী অংশ মহারাজা বেনামীতে ক্রয় করেছিলেন।

এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তেজচন্দ্র ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলেন, তদনুসারে বার্ষিক ৪০,১৫১০৯ সিক্কা রাজস্ব ধার্য হয়। এ ছাড়া পুলবন্দি বা বাঁধ মেরামত বাবদ মহারাজার দেয় ধার্য হয় ১,৯৩৭২১ সিক্কা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরও জমিদারীর আয় বর্ধিত হয় নি। বরঞ্চ অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৭৯৯ সালে তেজচাঁদ কোম্পানীর অমতে পত্তনি প্রথার প্রবর্তন করে আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পত্তনি আইন বিধিবদ্ধ হয়। পত্তানদার আবার রাজস্ব আদায়ের জন্য তালুক বণ্টন ও বন্দোবস্ত করতে থাকেন। এইভাবে দর-পত্তনি, সে-পত্তনি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এই প্রথায় রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারী রক্ষা পায় এবং বার্ষিক আয় আশি লক্ষ টাকায় উপনীত হয়। এই সময়ে তেজচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ধনী জমিদারে পরিণত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের জমিদারীর সীমানা নির্ধারিত হয় পূর্বে গঙ্গার পশ্চিম সীমা, দাক্ষণে কংসাবতী ঘাট, উত্তরে মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ প্রান্ত এবং পশ্চিমে পূর্ব পঞ্চকোট। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তেজচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

প্রথম জীবনে মহারাজ তেজচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল। তিনি আটবার বিবাহ করেন। এ ছাড়া তাঁর একটি বিদেশিনী রক্ষিতা ছিল। আট মহিষীর মধ্যে একমাত্র নানকী দেবীর গর্ভে তাঁর একমাত্র সন্তান প্রতাপচাঁদের জন্ম হয় (১৭৯১ খ্রীঃ)। তেজচাঁদ বিদ্যোৎশাহী ও প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। তাঁর অর্থানুকল্যে এবং উদ্যমে বর্ধমানে বহু পাঠশালা, টোল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ধমানে মিশনারীদের ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনেও তাঁর সহায়তা ছিল। কলকাতার হিন্দু কলেজে তিনি অর্থদান করেছেন। বর্ধমানে কমল সায়র, বর্ধমানের নবাব হাটে ও কালনা শহরে একশ আট শিবমন্দির স্থাপন, বর্ধমানে বাঁকা নদীর উপরে সেতুর সংস্কার, মগরায়

সরস্বতী নদীর উপরে সেতু নির্মাণ, চুঁচুরায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি তেজচাঁদের উজ্জ্বল কীর্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে তিনি শক্তি উপাসনায় উৎসাহী হন ও সাধক কমলাকান্তকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন।

তেজচাঁদের পত্নীগণের মধ্যে কমলকুমারী অত্যন্ত প্রভাবশালিনী ছিলেন। তাঁরই প্রভাবে কমলকুমারীর ভ্রাতা পরাণচাঁদ কাপুরকে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। পরাণচাঁদ তাঁর বালিকা কন্যাকে তেজচাঁদের হাতে সমর্পণ করে বর্ধমান রাজের দেওয়ান, শ্যালক ও শ্বশুররূপে সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করেন। তেজচাঁদের একমাত্র পুত্র প্রতাপচাঁদ কুস্তিগীর, তীরন্দাজ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। পিতার জীবিতকালেই তিনি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্যের ভার পেয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে পত্তনিপ্রথা আইনসিদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ পারিবারিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলেই ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপচাঁদ নিরুদ্দিষ্ট হন।

প্রতাপচাঁদের অন্তর্ধানের পর কমলকুমারী ও পরাণচাঁদের প্ররোচনায় তেজচাঁদ মৃত্যুর পূর্বে পরাণচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র চুনিলালকে দত্তক গ্রহণ করেন। তেজচাঁদের মৃত্যুর পরে চুনিলাল মহতাবচাঁদ নামে বর্ধমানের জমিদারীর মালিক হন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিংক কমলকুমারীর অভিভাবকত্বে মহতাপচাঁদকে বর্ধমানের জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ১৮৪৪ সালে মহতাবচাঁদের সিংহাসনে অভিষেক হয়। প্রতাপ-চাঁদের অন্তর্ধানের চোদ্দ বৎসর পরে এক ব্যক্তি প্রতাপচাঁদ পরিচয়ে বর্ধমানের জমিদারীর মালিকানা দাবী করে মোকদ্দমা করেন। কিন্তু তাঁর দাবী প্রমাণিত হয় নি। ইতিহাসে তিনি জাল প্রতাপচাঁদ নামে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনা অবলম্বনে জাল প্রতাপচাঁদ উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

প্রতাপচাঁদ ও মহতাবচাঁদ

মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী বসন্তকুমারী নাবালিকা থাকায় মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থাবর অস্থাবর বিপুল সম্পত্তি পরাণচাঁদ ও কমলকুমারী ভোগ দখল করতে থাকেন এবং বসন্তকুমারীকে নজরবন্দী করে রাখেন। একুশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি নিজ সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগ দখল করার জন্যে মোকদ্দমা করে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। মামলা চলার সময়ে তাঁর উকিল দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রণয় সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণারঞ্জনের

মহারাণী বসন্তকুমারী

সঙ্গে হিন্দুমতে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়। তিনি কলকাতা থেকে আর বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করেন নি। শেষ জীবনে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ-এ বসবাস করেন।

তেজচাঁদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গম রায়ের বংশের বিলোপ ঘটে। মহতাবচাঁদ থেকে পরাণ কাপুরের বংশ জমিদারীর মালিক হন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক মহতাব চাঁদকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ব্যবহারের অনুমতি দেন। মহতাব চাঁদ ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) এবং সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সময়ে তিনি বৃটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁকে ছোটলাট ও বড়লাটের কাউনসিলে সাম্মানিক সদস্যপদ প্রদান করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধিতে ভূষিত করার সময়ে (১৮৭৭) তিনি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি নামের পূর্বে হিজ্‌ হাইনেস উপাধি ব্যবহারের ও তেরোটি কামান রাখার অধিকার লাভ করেন। পরিবর্তে তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার শ্বেতমর্মর মূর্তি জনগণকে উপহার দেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। মহতাব চাঁদের সময়ে বর্ধমানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বহু গুণ বর্ধিত হয়। উড়িষ্যার কুজঙ্গ ও মেদিনীপুরের সুজমুথা জমিদারী তিনি ক্রয় করেছিলেন। তাঁর আমলে সাধারণ প্রজার সঙ্গে বর্ধমানরাজের সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন হয়। পত্তনিদার দরপত্তনিদার ইত্যাদিদের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নি।

মহতাপচাঁদ বর্ধমানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এই চিকিৎসালয় বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হয়েছে। তিনি বিদ্যানুরাগীও ছিলেন। তেজচাঁদ প্রতিষ্ঠিত (১৮১৭) এ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুলকে তিনি হাইস্কুলে পরিণত করেন (১৮৫৪)। তাঁর উদ্যোগে কালনায় ও বর্ধমানে দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে **First man of Bengal** বলে সম্মানিত করেছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আনুকূল্যে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম

বয়েজ স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয় বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল নামে পরিচিত হয়।

মহতাব চাঁদ নিজে কয়েকটি শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। প্রভূত অর্থ ব্যয় করে তিনি মহাভারত, রামায়ণ, হরিবংশ, সিকন্দরনামা, চাহার দরবেশ প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়ে বিতরণ করেছিলেন।

পাঞ্জাব থেকে আগত বর্ধমানবাসী কেদারনাথ নন্দের কন্যা নারায়ণকুমারীর সঙ্গে মহতাব চাঁদের বিবাহ হয়। তাঁদের কোন সন্তান না থাকায় নারায়ণকুমারীর ভ্রাতা বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দকে তাঁরা দত্তক গ্রহণ করেন (১৮৬৬)। তিনি আফ্‌তাব চাঁদ নামে পরিচিত হন। এখন থেকে বর্ধমানের রাজারা মহতাব উপাধি ব্যবহার করতে থাকেন। আফ্‌তাব চাঁদ মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে জমিদারীর মালিক হন এবং মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৫ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় বনবিহারী কাপুর জমিদারী পরিচালনা করতেন। অল্পকালের মধ্যে আফ্‌তাব চাঁদ অনেক জনহিতকর কার্য করেছিলেন। তেজচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী হাইস্কুলটিকে তিনি ৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করেন। বর্ধমান শহরের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে লাকুর্ডিতে জলের কল প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি একটি পাবলিক লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আফ্‌চাঁদের উইল অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর বর্ধমানের জমিদারীর ভার **Court of Wards**-এর উপর অর্পিত হয়। আফ্‌তার চাঁদ ছিলেন অপুত্রক। তিনি পত্নী বিনোদেয়ী দেবীকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বে। তদনুসারে তাঁর মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পরে বিনোদেয়ী দেবী বনবিহারী কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারী কাপুরকে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দত্তক গ্রহণ করেন।

আফ্‌তাব চাঁদ

আফ্‌তাব চাঁদের দত্তক পুত্র হিসাবে বর্ধমানের জমিদারীর মালিক হওয়ার সময়ে বিজনবিহারীর বয়স ছিল ছয় বৎসর। তাঁর নাম হয় বিজয়চাঁদ মহতাব। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সাবালক হওয়ার পর তিনি কোর্ট অফ্‌ ওয়ার্ডস্‌ এর কাছ থেকে জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। এই বৎসরই তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে

বিজয়চাঁদ

লাহোর নিবাসী ঋগুামল মেহেরার কন্যা রাধারাণী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়চাঁদের আমন্ত্রণে তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল বর্ধমানে আসেন। এই উপলক্ষ্যে বিজয়চাঁদ বর্ধমান শহরে প্রবেশপথে ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া নামে একটি সুদৃশ্য তোরন নির্মাণ করান। এই তোরণ কার্জন গেট নামে প্রসিদ্ধ। স্বাধীনতার পরে নাম হয় বিজয় তোরণ।

বিজয়চাঁদ ছিলেন আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত। বর্ধমান রাজবংশে তিনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর পুত্র উদয়চাঁদ বংশের প্রথম গ্রাজুয়েট। বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। ১৯০৬ সালে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি Impression নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৮ সালে লেফ্‌ট্‌ন্যান্ট গভর্ণর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারকে কলিকাতায় ওভারটুন হলে এক বিপ্লবীর গুলি থেকে রক্ষা করার জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে K. C. I. E. এবং Indian order of Merit (Class III) উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিজয়চাঁদ সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন। তিনি বিজয় গীতিকা, এয়োদশী কাব্য, রণজিৎ (নাটক), মানস লীলা (বিজ্ঞান বিষয়ক নাটক), Impression, Meditation, The Indian Horizon, Studies প্রভৃতি কুড়িটি গ্রন্থের লেখক। তাঁর উদ্যোগে এবং অর্থ সাহায্যে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন হয়েছিল। বর্ধমান রাজকলেজকে তিনি ডিগ্রী কলেজে উন্নীত করেন। বর্ধমান শহরে ফ্রেজার হাসপাতাল (স্বাধীনতার পরে বিজয়চন্দ্র হাসপাতাল নামে পরিচিত), টেকনিক্যাল স্কুল, বিজয় চতুষ্পাঠী, টাওয়ার ক্লক, কলিকাতার আলিপুরে বিজয়মঞ্জিল নামে প্রাসাদ, ঢাকা শহরে কালীবাড়ী ও বর্ধমান হাউস, বোরহাট অঞ্চলে বিজয় থিয়েটার, পীর বাহরামে অবস্থিত শের আফ্‌গান, কুতুবুদ্দিন ও পীর বাহরামের সমাধির সংস্কারসাধন, লাহোরে নুরজাহানের সমাধির সংস্কার সাধন, পত্নী রাধারানীর ইচ্ছানুসারে হরিসভা বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান মেডিকেল স্কুল ও ছাত্রাবাস, হরিসভা, সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি বিজয়চাঁদের স্মরণীয় কীর্তি।

বিজয়চাঁদ ইংরাজের অনুগত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেস এবং বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বর্ধমানে আগমন

করার সময়ে (১৯২৫) বিজয়চাঁদ তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। আবার মিউনিসিপ্যাল ইলেকৃসনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করতে এলে তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন (১৯২৮)। রাজা হওয়ার পরই তিনি দুর্ভিক্ষত্রাণে দশ হাজার টাকা দান করেন, প্রজাদের দেড় লক্ষ টাকা খাজনা মকুব করেছিলেন। পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের জন্য বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিকে তিনি ৪০ হাজার টাকা দান করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট বিজয়চাঁদ পরলোক গমন করেন।

বিজয় চাঁদের দুই পুত্র—উদয়চাঁদ ও অভয়চাঁদ। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়চাঁদ জমিদারীর মালিক হন। সে সময়ে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রায় চরম পর্যায়ে উপনীত। ১৯৩৬ সালে উদয়চাঁদ লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলে গান্ধীবাদী নেতা বিজয় ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে বর্ধমান বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা বিনয় চৌধুরীর নিকট পরাজিত হন। এই পরাজয়ে ব্যথিত হয়ে তিনি বর্ধমান ত্যাগ করে কলিকাতাবাসী হন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথার বিলোপ হয়। ফলে মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতাবের বিশাল জমিদারী সরকারের হাতে চলে যায়। উদয়চাঁদ কলিকাতার আলিপুরে বিজয়মঞ্জিলে বসবাস করতে থাকেন।

উদয়চাঁদ

জমিদারী উচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্বে উদয়চাঁদ তাঁর সকল কর্মচারীকে বসতবাটীর জন্যে চার কাঠা করে জমি দান করেছিলেন। রাজার সকল আত্মীয় জ্ঞাতি প্রভৃতিকে নিজ নিজ বাসগৃহের মালিকানা সত্ব দান করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য তিনি বারোদুয়ারীর পশ্চিমে ভূমি দান করেন। এই উদ্বাস্তু পল্লীর নাম হয় উদয়পল্লী। টেকনিক্যাল স্কুল সাধনপুরে স্থানান্তরিত করে ঐ গৃহে তিনি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। এই গ্রন্থাগারের নাম হয় উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার। শ্যাম সায়রের পূর্বে রামকৃষ্ণ আশ্রম ও দক্ষিণপূর্বে সাহিত্য পরিষদ তাঁরই অর্থানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বর্ধমানের রাজবাড়ী সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ও প্রভূত সম্পত্তি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের চেষ্টায় ১৯৬০ সালে বর্ধমান রাজবাড়ীতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ীর মহিলা মহল উদয়চাঁদ দান করেন মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য।

উদয়চাদের পত্নী মহারানী রাধারানী মহতাব কংগ্রেসের পক্ষে বিধানসভার

নির্বাচনে কমিউনিস্ট নেতা বিনয় চৌধুরীকে পরাজিত করে নির্বাচিত হন এবং কারা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রী হন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধারাণী পরলোক গমন করেন। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই অক্টোবর বর্ধমান রাজবংশের শেষ রাজা উদয়চাঁদ মহতাব পরলোক গমন করেন। ১৯৮২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত করে।

উদয়চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র প্রণয়চাঁদ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ডক্টরেট্। উদয়চাঁদের উইল অনুসারে তাঁর তিন কন্যা ও তিন পুত্রের মধ্যে প্রণয়চাঁদ দেবসেবা, মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হন। তিনি বিজয়মঞ্জিলেই বসবাস করেন। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালন সমিতির সদস্য।

জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে অন্যান্য জমিদারদের মতই বর্ধমানের রাজাদের প্রতাপ ও জৌলুষ ম্লান হয়ে যায়। ভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রায় সাড়ে তিন শ বৎসর প্রাচীন এই রাজবংশ আজও বর্ধমান জেলায় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় এই রাজবংশের ধারা প্রবাহিত হলেও রাজারা বর্ধমান শহরে, বর্ধমান জেলার গ্রামে, এমন কি ভিন্ন প্রদেশেও বহু কীর্তি রেখে গেছেন। বর্ধমান শহরে কৃষ্ণসায়র, রানীসায়র, শ্যামসায়র প্রভৃতি দীঘি, বর্ধমান রাজকলেজ, উদয়চাঁদ লাইব্রেরী, বিজয় চতুষ্পাঠী, বিজয় তোরণ, ঘোষ বাগ, গোলাপ বাগ, ১০৮ শিব মন্দির প্রভৃতি তাঁদের স্মরণীয় কীর্তি। এ ছাড়া বহু দেবমন্দির তাঁদের কীর্তির সাক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান। কালনার রাজবাড়ী, সমাজবাড়ী, লালজীর মন্দির, রাজস্কুল, ১০৮ শিবমন্দির প্রভৃতি এই বংশেরই কীর্তি। জমিদারী বিলোপের পর এই সকল কীর্তি অধিকাংশই পরহস্তগত অথবা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণদশাপ্রাপ্ত।

বর্গীর হাঙ্গামায় বর্ধমান

নবাব আলিবর্দির সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা ভীতিপ্রদ আকার ধারণ করেছিল। আলিবর্দির দ্বারা নিহত নবাব সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ উড়িষ্যার নায়েব নাজিম ছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি কটক থেকে সসৈন্যে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হন। আলিবর্দি রুস্তমকে পরাজিত করে তাঁর ভাইপোকে উড়িষ্যার নায়েব নাজিম নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন

করেন। রুস্তম জঙ্গ্ মারাঠা সৈন্যদের সাহায্যে উড়িষ্যা অধিকার করেন। নূতন নাজিম সপরিবারে বন্দী হন। আলিবর্দি উড়িষ্যা আক্রমণ করে রুস্তমজঙ্গ্‌কে পরাজিত করেন (ডিসেম্বর ১৭৪১ খ্রীঃ)।

উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথেই আলিবর্দি খবর পান যে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে মারাঠা সৈন্য পাঞ্চেত অতিক্রম করে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করেছে এবং লুটপাট সুরু করেছে। এই সংবাদ শুনে নবাব দ্রুত তিন হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক নিয়ে বর্ধমানে উপনীত হন (১৫ই এপ্রিল ১৭৪২ খ্রীঃ)। পরদিন প্রভাতে তিনি দেখলেন যে মারাঠা সৈন্য তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সমস্ত রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। কোন প্রকারে তিনি মারাঠা সৈন্য ভেদ করে কাটোয়ায় পলায়ন করতে সক্ষম হন (২৬শে এপ্রিল)। রুস্তম জঙ্গের নায়েব মীর হবিবের প্ররোচনায় মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত মারাঠা সৈন্য নিয়ে নবাবের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মারাঠা সৈন্যদল পথের দুদিকে দশ মাইলের মধ্যে গ্রামগুলি লুণ্ঠন করে ও অগ্নিসংযোগ করে।

সাতশ মারাঠা অশ্বারোহী মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে ধানিপাড়ায় উপস্থিত হয় (৬ মে ১৭৪২ খ্রীঃ) এবং বাজারে অগ্নিসংযোগ করে। তারা নবাবের অনুপস্থিতিতে বিনা বাধায় মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করে এবং জগৎ শেঠের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা আদায় করে। নবাব ৭ই মে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন এবং মারাঠা সৈন্য পশ্চাদবর্তী হয়ে কাটোয়ায় উপস্থিত হয়। সমস্ত জুন মাস কাটোয়া মারাঠাদের প্রধান ঘাঁটি হয়েছিল। মীর হবিব হয়েছিলেন মারাঠাদের প্রধান উপদেষ্টা। মারাঠারা হুগলী অধিকার করে এবং সুবেশ রাও-এর অধীনে একদল সৈন্য সেখানে মোতায়েন করা হয়। রাজমহল থেকে ভাগীরথীর সমস্ত পশ্চিম তীর মারাঠাদের অধিকারভুক্ত হয়। সুবেশ রাও মারাঠা অধিকৃত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মীর হবিব মারাঠাদের দেওয়ান হয়ে জমিদার-দের রাজস্ব দিতে বাধ্য করেন। অধিকৃত সমস্ত প্রদেশে মারাঠারা বিপুলভাবে লুণ্ঠন চালায় এবং ভয়াবহ ধ্বংসকার্যে মেতে ওঠে? তারা বীরভূম এমন ভাবে লুণ্ঠন করে যে, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায় এবং বণিক ও তাঁতীরা পলায়ন করে। গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণে মারাঠাদের এই ভয়াবহ অত্যাচারের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

মাঘে ঘেরিয়া বর্গী তবে দেয় সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বেঁধে দেয় তার গলা এ॥
এক জনে ছাড়ে তারে অন্য জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে।

*   *   *   *

কাহুকে বাঁধে বরগী দি আ পিঠ মোড়
চিত কইরা মারে লাথি পা এ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ ২ বেলে বারে বারে॥
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥

বর্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালংকার মারাঠাদের বীভৎস অত্যাচার সম্পর্কে লিখেছেন যে, সাহু রাজের সৈন্যদল গর্ভবতী নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র সকলকেই নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ছাড়াও যে কোন রকমের পাপকার্য সম্পাদন করেছে।[১] বাঙ্গালাদেশ মারাঠাদের এই অত্যাচার বর্গীর হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ। বর্গির শব্দের অর্থ মহারাষ্ট্রের সাধারণ সৈন্যদের নিম্নতম শ্রেণী। এদের অস্ত্র এবং অশ্ব যোগান দিত রাজ সরকার। সিলাহদার নামে অপর মারাঠা সৈন্যরা নিজেরাই অশ্ব ও অস্ত্র সংগ্রহ করতো। বর্ষার সময়ে দুই পক্ষই সৈন্যসংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। শরতের সূচনাতেই রাস্তা শুকনো হওয়ার আগেই আলিবর্দি উদ্ধারণপুরের ঘাট দিয়ে নৌ সেতুর দ্বারা গঙ্গা পার হয়ে মারাঠাদের আক্রমণ করেন। ভাস্কর পণ্ডিত জমিদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে কাটোয়ায় সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা করছিলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর নবমী পূজার রাত্রিতে আড়াই হাজার সাহসী সৈন্য নিয়ে তিনি নিদ্রিত মারাঠাদের আক্রমণ করেন। অপ্রস্তুত মারাঠা সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে মেদিনীপুরে পলায়ন করে। তারা কটকের শাসনকর্তা সেখ মসুমকে হত্যা করে কটক অধিকার করে। আলিবর্দি সসৈন্যে যাত্রা করে

১। **History of Bengal, Vol II, P. 458.**

মারাঠা সৈন্যদের চিল্কা হ্রদের পরপারে বিতাড়িত করেন এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলে ভাস্কর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়ায় উপস্থিত হলেন। মোঘল সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী রাজা সাহু চৌথ আদায়ের যে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যায় সেই চৌথ আদায় করতে লাগলেন। দিল্লীর সম্রাট পেশওয়া বালাজী রাওকে অনুরোধ করেন রঘুজী ভোঁসলেকে বাঙ্গালা থেকে বিতাড়িত করতে। পেশওয়া বালাজীরাও বিহারের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালায় উপস্থিত হন। তাঁর সৈন্যদল পথের চতুর্দিকে হত্যা ও লুণ্ঠন নির্বিচারে চালাতে থাকে। নবাব আলিবর্দি বহরমপুর থেকে দশ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে চৌরিয়া গাছিতে পেশোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (৩০ শে মার্চ, ১৭৪৩ খ্রীঃ)। চুক্তি অনুসারে রাজা সাহুকে নবাব চৌথ দিতে স্বীকৃত হন এবং পেশোয়ার সৈন্যদলের খরচ বাবদ বাইশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। পরিবর্তে পেশোয়া রঘুজী ভোঁসলেকে বাঙ্গালা থেকে বিতাড়িত করার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করেন। রঘুজী কাটোয়া থেকে বীরভূম চলে যান এবং মানভূম হয়ে সম্বল পুরের দিকে পলায়ন করেন। পেশোয়া পাঞ্চেত পর্যন্ত রঘুজীর পশ্চাদ্ধাধাবন কবে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

পর বৎসর (মার্চ ১৭৪৪) ভাস্কর পণ্ডিত উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর অতিক্রম করে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। নবাব আলিবর্দির রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল, সৈন্যগণও ক্লান্ত হয়েছিল। তিনি সন্ধি চুক্তির নিমিত্ত ভাস্কর পণ্ডিতকে শিবিরে আমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই সময়ে তিনি ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁর একুশ জন অনুগামী সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করেন। অতঃপর মারাঠা সৈন্য ভীত হয়ে স্বদেশে প্রস্থান করে।

আলিবর্দির সেনাপতি গুলাম মুস্তাফা ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নবাব তাঁকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু নবাব তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করায় গুলাম মোস্তাফা রঘুজী ভোঁসলেকে বাঙ্গালা আক্রমণ করতে আহ্বান করেন। রঘুজী বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে ট্রেজারি থেকে সাত লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেন এবং বর্ষাকাল বীরভূমে অতিবাহিত করেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বিহারে বিদ্রোহী গুলাম মোস্তাফার সঙ্গে যোগ দেন এবং মীর হবিবের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মুর্শিদাবাদ

আক্রমণ করেন (২১ শে ডিসেম্বর ১৭৪৫ খ্রীঃ)। আলিবর্দি দ্রুত মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হলে রঘুজী কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন, কাটোয়া থেকে তিনি নাগপুর গমন করেন। মীর হবিব মারাঠা সৈন্য নিয়ে কাটোয়ায় অবস্থান করতে থাকেন এবং নবাব সৈন্যের নিকট পরাজিত হন (এপ্রিল ১৭৪৬)।

আলিবর্দির সেনাপতি মীরজাফর উড়িষ্যা জয় করতে অগ্রসর হন এবং মেদিনীপুরের নিকটে মীর হবিবকে পরাজিত করেন (ডিসেম্বর ১৭৪৬)। মীর হবিব মারাঠা সৈন্য সহ বালাসোর থেকে বর্ধমানে উপস্থিত হন। ৭১ বৎসর বয়স্ক নবাব আলিবর্দি স্বয়ং মারাঠা সৈন্যসহ মীর-হবিবকে পরাজিত করেন এবং সমগ্র বর্ধমান জেলা নবাবী শাসনের অধীনে আনয়ন করেন (মার্চ ১৭৪৭ খ্রীঃ)। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মীর হবিব পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। এই সময়ে সিরাজদ্দৌলা পাটনা পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলেন। আলিবর্দি পাটনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময়ে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কাটোয়ায় অবস্থান করেন। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি হওয়ায় মারাঠা সৈন্যের অত্যাচারের অবসান ঘটে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে মারাঠা সৈন্যদের প্রধান ঘাঁটি হয়েছিল বর্ধমান ও কাটোয়া। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র আলিবর্দির পক্ষ নিয়ে মারাঠা সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

মধ্যযুগীয় কাব্যে বর্ধমান

একদা বর্ধমানের যে বিপুল সমৃদ্ধি ছিল রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে সেই সমৃদ্ধির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বারো ভুঁইয়ার অন্যতম যশোরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য মোঘল সেনাপতি মানসিংহ বঙ্গদেশে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেই সময়ে মানসিংহ বর্ধমানে উপনীত হন।

নদীবন এড়াইয়া নানা দেশ বেড়াইয়া
উপনীত হৈল বর্ধমান।

নদীয়ার জমিদার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে সাহায্য করার জন্য বর্ধমানে উপনীত হয়ে ছিলেন। এই সময়ে মানসিংহের ইচ্ছানুসারে ভবানন্দ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বিবৃত করেছিলেন। বিদ্যাসুন্দর

কাব্য অনুসারে বর্ধমানের রাজা ছিলেন বিদ্যার পিতা বীরসিংহ। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় সেই সময়ে বর্ধমান শহরের অবস্থা :

দেখি পুরী বর্ধমান   সুন্দর চৌদিকে চান
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।
রাজা বড় ভাগ্যধর   কাছে নদ দামোদর
ভাল বটে জানিনু বিশেষ।
চৌদিকে সহরপনা   দ্বারে চৌক কতজনা
মুরুচা বরুজ শিলাময়।
কামানের হুড়াহুড়ি   বন্দুকের ছড়াছড়ি
সম্মুখে বাণের গড় হয়॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল   নৌবত ঝাঁঝর রোল
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীরগুলি শনশনি   গজঘণ্টা ঠনঠনি
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি।
ঢালী-খেলে উড়াপাকে   ঘন ঘন হান হাঁকে
রায়বেঁশে লোকে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে   ফুটি যেন মাটি ফাটে
দূর হৈতে শুনিতে তরাস॥
নদী জিনি গড়খানা   দ্বারে হাবসীর থানা
বিকট দেখিয়া লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্বমঙ্গলার   লঙ্ঘিতে শকতি কার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা॥

এই বর্ণনা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের—পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বকালের। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (খ্রীঃ ১৭ শ শতাব্দী) চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মানসিংহের সুবাদারীর কালে বর্ধমান অঞ্চলে ভয়াবহ অরাজকতার বর্ণনা দিয়েছেন। মানসিংহের সুবাদারীর কাল ১৫৯৪ থেকে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে শাসনকর্তা ছিলেন ডিহিদার মামুদ সরিপ।

ধন্য রাজা মানসিংহ   বিষ্ণু পদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।

যে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
হৈল রাজা মামুদ সরিপ।[১]

এই অংশটিরই পাঠান্তর—

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে
বিলাত পাইল মামুদ সরিপ।[২]

শেষ পংক্তিটির পাঠান্তর—ডিহিদার মামুদ সরিপ।

এই সময়ে মুকুন্দরামের বাসভূমি দামিন্যা অঞ্চলে অরাজকতার বর্ণনায় মুকুন্দরাম লিখেছেন—

উজির হলো রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনের কাঠায় কূড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকায় আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হৈল বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
পেয়াদা সভার কাছে প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজারা হৈয়া ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥[৩]

১। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বসুমতীসং
২। চণ্ডীমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত।
৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী-বঙ্গবাসী সং

কবি মুকুন্দরামের পৈতৃক বাসভূমি ছিল বর্ধমান জেলার দামিন্যা বা দামুন্যা গ্রামে। অধুনা বর্ধমান জেলার রায়না থানার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত। কবি এই অরাজকতার সময়ে সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। কবির বন্ধু তালুকদার গোপীনাথ নন্দী রাজরোষে পতিত হয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। সেলিমাবাদ নিবাসী গোপীনাথ নন্দী দামিন্যার তালুকদার ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘণরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়।

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান।[১]

মহারাজ তেজচন্দ্রের উল্লেখও ঘনরাম করেছেন—

নিরঞ্জন চরণ স্বরজ করে ধ্যান
মহারাজা তেজচন্দ্রের করয়ে কল্যাণ।[২]

অঘৈরা-শ্রীরামপুর নিবাসী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতা অকিঞ্চন চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন—

মহারাজ চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র কৃতকীর্তি
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে।
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাবে
ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে।

গোপভূম পরগণার বসুধাগ্রাম নিবাসী ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি নরসিংহ বসু লিখেছিলেন—

অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়
জগজ্জনে যাহার যশের গুণ গায়॥

রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবী সর্বমঙ্গলার বন্দনা করেছেন—

বর্ধমানে বন্দো দেবী সর্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান হন দেবী ঠিক দুপুর বেলা॥

১-২। শ্রীধর্মমঙ্গল--আখড়া পালা--পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (ক. বি.)

মাড়োগ্রাম নিবাসী কবি রঘুনন্দন গোস্বামী রাম রসায়ন কাব্যে আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে স্বগ্রামের উল্লেখ করেছেন'—

বর্ধমান সন্নিধান গ্রাম মাড়ো অভিধান
তাহাতেই আমার নিবাস।
সন্তোষিত বন্ধুজন এই গ্রন্থ বিরচন
করিলাম পাইয়া প্রয়াস ॥

এছাড়া বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামের উল্লেখ বা বিবরণ বিভিন্ন কাব্যে পাওয়া যায়। ক্ষমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ধমানের পূর্বাঞ্চলে বাঁকা-দামোদর গাঙ্গুর বেহুলার তীরবর্তী গাঙ্গপুর, বৈদ্যপুর, নারিকেলডাঙ্গা, উদয়পুর প্রভৃতি বিভিন্ন সমৃদ্ধ গ্রামের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে ও পদে শ্রীখণ্ডের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে, দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের কাব্যে এবং চৈতন্য জীবনী কাব্যে ইন্দ্রাণী ও কাটোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

গোপভূম

বাঁকুড়া থেকে বীরভূমের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত—বরাকর, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়, কাঁকসা, মানকর, অমরাগড়, ভাল্কী, বুদবুদ, গৌরাঙ্গপুর, রাজগড়, গুসকরা, মঙ্গলকোট পর্যন্ত পাথুরে মাটি ও আরণ্যক ভূমি এক সময়ে গোপভূম নামে পরিচিত ছিল। এখনও এই অঞ্চল গোপভূম পরগণা নামে পরিচিত। সদ্গোপরা ছিলেন এই অঞ্চলের অধিবাসী। দুর্গাপুরে খননকার্যের ফলে প্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষের সিদ্ধান্ত অনুসারে সদ্গোপ জাতি এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী; এঁরা আদিতে ছিলেন পশু-পালক জাতি। পরে জীবিকার জন্য কৃষিকর্ম গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে রাজা হয়েছিলেন। গোপভূমের সদ্গোপ রাজবংশের ইতিহাস বর্ধমান তথা রাঢ়ের গৌরবময় যুগের ইতিহাস। গোপ রাজাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি আজও বহন করছে ভাল্কী, অমরার গড়, কাঁকসা, রাজগড়, গৌরাঙ্গপুর প্রভৃতি। গোপ রাজাগণ ছিলেন শৈব। শিব ও শক্তির প্রভাব এই অঞ্চলে ব্যাপক। এঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ধর্মরাজও।[১]

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম সং—১৯৫৭, পৃঃ ১৯০-৯৩।

কিম্বদন্তী অনুসারে পাল রাজারা সদ্‌গোপবংশীয় ছিলেন। প্রবাদ এবং কুলপঞ্জী অনুসারে মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব পাল গড় অমরাবতীর কাছে দিগ্‌নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অমরার গড় এবং দিগ্‌নগর গোপভূমের অন্তর্গত বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। প্রসিদ্ধি আছে যে সদ্‌গোপরাজ মহেন্দ্রনাথ (মাহিন্দি রাজা নামে পরিচিত) তাঁর মহিষী অমরাবতীর নামে দুর্গের নামকরণ করেছিলেন অমরার গড়।

অমরার গড়

ভাল্কী ও অমরার গড়ের সদ্‌গোপ রাজবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত তদনুসারে ভল্লুপাদ (ভল্লুপদ বা ভল্লুকপদ) নামে এক ঋষি আঃ দশম একাদশ শতাব্দীতে গোপভূমে যে স্থানে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, সেই স্থানের নাম ভাল্কী। ভল্লুপাদের পুত্র গোপাল। গোপালের পৌত্র (মতান্তরে প্রপৌত্র) মহেন্দ্র। মহেন্দ্রের রাজ্য কাটোয়া থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি খেজুরডিহির উগ্রক্ষত্রিয় রাজা জগৎ সিংহের বাড়ী থেকে বলপূর্বক দশভুজা সিংহবাহিনী দেবীকে নিয়ে এসে নিজের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই দেবীই শিবাখ্যা দেবী নামে অমরার গড়ে অদ্যাপি পূজিতা হচ্ছেন।

ভাল্কী

রাজা মহেন্দ্রের দুই বা তিন মহিষী ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা—কালিন্দী ও যমুনা। সিউড়ের রাজবংশ মহেন্দ্রের এক কন্যা থেকে উদ্ভূত, আর এক কন্যা থেকে উৎপত্তি হয় কাঁকসার রাজবংশ। তৃতীয়া মহিষীর সন্তান থেকে দিগ্‌নগরের রাজবংশের উৎপত্তি। প্রবাদ অনুসারে রাজা লাউসেন ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষকে পরাজিত করে মহেন্দ্রের রাজ্যবিস্তারে সহায়ক হয়েছিলেন। মহেন্দ্র তাঁর রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এক অংশের রাজধানী ছিল অমরার গড়, অপর অংশের রাজধানী ছিল দিগ্‌নগর। আঃ ত্রয়োদশ/চতুর্দশ শতাব্দীতে সৈয়দ বোখারি কাকসার গড় ও দুর্গ দখল করে রাজাকে হত্যা করেছিলেন এবং জমিদারী কোন এক মুসলমানকে আয়সা দিয়েছিলেন। অমরার গড়ের রাজতন্ত্র সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্তমান ছিল। বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে গোপরাজা পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে অমরার গড়ের রাজকীয় প্রতাপ বিলীন হয়ে যায়। অমরার

গোপরাজা মহেন্দ্র

গড়ে শিবাখ্যা দেবী, তুঙ্কেশ্বর শিব, পঞ্চরত্ন নারায়ণ মন্দির, বাংলো ঘরের আদর্শে নির্মিত কারুকার্যখচিত দুর্গামন্দির এখনও বর্তমান।

কাঁকসা রাজবংশের কুলদেবতা কঙ্কেশ্বর মহাদেব। জীবতকুণ্ড নামে পুষ্করিণীর পাড়ে কঙ্কেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। গোপভূমের সর্বত্র সদ্‌গোপ রাজাদের কীর্তিগাথা প্রচলিত। মাহিন্দি রাজার বীরত্বের কাহিনীও এই অঞ্চলে জনপ্রিয়। কবি দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এইরূপ কাহিনী অবলম্বনে শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্য রচনা করেছিলেন।[১]

অজয়নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহাড়ীর অন্তর্গত গৌরাঙ্গপুর গ্রাম। বিষ্ণুপুর মৌজার অন্তর্গত দামোদরপুর, গৌরাঙ্গপুর ও থেরওয়াড়ী নামে তিনটি গ্রাম আছে। বিষ্ণুপুর ও থেরওয়ারীর মাঝামাঝি শ্যামারূপার গড়। শ্যামারূপার গড়ই ত্রিষষ্ঠী গড় বা ঢেকুর গড় নামে পরিচিত। ত্রিষষ্ঠী গড়ের ভবানীভক্ত রাজা ইছাই ঘোষ ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের বিখ্যাত দেউল আছে। দেউলটি রেখ দেউলের নিদর্শন। শ্যামারূপার গড়ের পাশে জঙ্গলের মধ্যে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। লোহার অস্ত্র নির্মাতা ঢেকারু নামে এক জাতি এখানে বাস করতো। এই জাতির অস্তিত্ব এখনও আছে। সম্ভবতঃ এই জাতির নামানুসারে ঢেক্করী বা ঢেকুর গড় নাম হয়েছে। দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জ গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এই তাম্রশাসনটিকে পালযুগের অন্তিম পর্বের বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ঢেক্করী থেকে প্রচারিত এই তাম্রশাসনে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ একটি গ্রাম দান করেছেন। রাম পালকে পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ঢেক্করীর প্রতাপ। উক্ত তাম্রশাসনের ঈশ্বর ঘোষ ধবল ঘোষের পুত্র, বাল ঘোষের পৌত্র ও ধূর্ত ঘোষের প্রপৌত্র। ধর্মমঙ্গল কাব্য অনুসারে ঈশ্বর ঘোষ সোম ঘোষের পুত্র। ঈশ্বর ঘোষ পালবংশের রাজা মহীপালের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) আমলে পালবংশের সামন্ত রাজা ছিলেন। মহীপালের রাজত্বকালে চোল ও কলচুরীদের আক্রমণে বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে

শ্যামারূপার গড়

ইছাই ঘোষ ও কেুটর গড়

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম সং পৃঃ ২০৪-২০৮

ঈশ্বর ঘোষ সম্ভবতঃ বর্ধমানের গোপভূমে বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে ঢেকুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

কর্ণসেন ও তৎপুত্র লাউসেন সম্ভবতঃ মেদিনীপুর অঞ্চলের সামন্ত রাজা ছিলেন। দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। এই সময়ে রাঢ় অঞ্চলে ডোম জাতি যোদ্ধা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই সব কাহিনী লোককথায় পল্লবিত আকারে স্থান পেয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী আছে, আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে সেই হরিশ্চন্দ্র রাজা বর্ধমান জেলায় অমরার (অমরার গড়) রাজা ছিলেন।[১] বর্ধমান জেলায় গোপভূমের দুজন গোপ রাজা ছিলেন, একজনের রাজধানী ছিল ঢেকুরে, অপরজনের রাজধানী ছিল অমরায়। ইছাই ছিলেন ভবানীভক্ত, আর হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ধর্মঠাকুরের ভক্ত। এইভাবে বর্ধমান জেলাতেই গড়ে ওঠে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী।

মুসলমান অধিকারের কালে ভরতপুর ও কাঁকসা অধিকৃত হলেও অমরার গড় স্বাধীনতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন রায় সমগ্র গোপভূম অধিকার করেন। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং শিবাখ্যা ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান।

বর্ধমান পরিচিতি

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সমগ্র বঙ্গদেশ পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি ও বর্ধমান ভুক্তি নামে দুটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গলসীর নিকটবর্তী মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত মহারাজ গোপচন্দ্রের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, বর্ধমান ভুক্তি একজন উপরিকের দ্বারা শাসিত হোত। নয়পালের ইর্দা লিপি অনুসারে দণ্ডভুক্তি অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলা বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালয় লিপি থেকে অনুমান হয়, বর্ধমান ভুক্তি উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়—এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত ছিল।

মুসলমান আমলে বর্ধমান ভুক্তির বিশাল আয়তন খর্বীকৃত হয়ে বর্ধমান চাকলায় পরিণত হয়। ইংরাজ আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত বর্ধমান একটি জেলায় পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে

১। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৩৮ খণ্ড পৃঃ ৭৭

মহারাজ তেজচন্দ্রের আমলে বর্ধমান জেলা যে আয়তন লাভ করে তা-ই স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত বর্ধমান জেলা। কবি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 'বর্ধমান বন্দনা'য় বর্ধমান ভুক্তি সম্পর্কে লিখেছেন—

মালভূমি আর মল্লভূম
সেনভূমি সেরগড় বীরভূমি আর গোপভূম
বর্ধমান ভুক্তি সনে ভুক্ত ছিল সবে একদিন
গঙ্গার পশ্চিমে বঙ্গ বর্ধমান অঙ্গে ছিল লীন।

বর্তমান বর্ধমান জেলা দামোদর অজয় ও ভাগীরথী নদীর দ্বারা বিধৌত। জেলার পূর্বসীমায় ভাগীরথী। ভাগীরথীর পূর্বতীরে নদীয়া জেলা। ভাগীরথীর পশ্চিমে নবদ্বীপ বাদে কাটোয়ার উত্তর-পূর্ব থেকে অম্বিকা কালনা পর্যন্ত বর্ধমান জেলার পূর্বসীমা। বর্ধমান জেলার দক্ষিণে হুগলী জেলা এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অংশ বিশেষ। গাঙ্গুর নদী বর্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্যে সীমারেখার কাজ করেছে। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জেলা। দামোদর নদ পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মধ্যবর্তী সীমা নির্ণায়ক। অজয়নদ কাটোয়া মহকুমার প্রান্ত পর্যন্ত বীরভূমকে বর্ধমান থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু অজয়ের উত্তরে কেতুগ্রাম থানা বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার সংযোগস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্ধমান জেলার পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর। বরাকর নদ দিশের গড়ের নিকটে দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কিন্তু দামোদরের অপরতীরে হুগলী জেলার প্রান্তদেশ পর্যন্ত বর্ধমান জেলা প্রসারিত। কবি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের বর্ণনায়—

বর্ধমান জেলার সীমা

পূর্বে তার বহে ভাগীরথী
উত্তরে অজয়নদ দক্ষিণেও মদমত্তমতি
দুরন্ত দুর্জয় নদ—দামোদরে যথা যশোমতী
বাঁধে দামোদরে তথা অষ্টেপৃষ্ঠে বিজ্ঞান ভারতী
দামাল দম্ভিতা তার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর রেনলের জরিপে বর্ধমানের আয়তন ৫১৭৪ মাইল। তখন বর্ধমান জেলায় আট হাজারেরও বেশী গ্রাম ছিল এবং লোকসংখ্যা ছিল তেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। বর্তমানে বরাকর থেকে কালনার প্রান্তে ভাগীরথী পর্যন্ত বর্ধমান জেলার দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল, কালনা ও

কাটোয়া মহকুমা বরাবর প্রস্থ প্রায় ৫০ মাইল, কিন্তু আসানসোল মহকুমার প্রস্থ গড়ে বারো মাইল। ১৮৭২ সালের জরিপে বর্ধমানের আয়তন নির্দিষ্ট হয় ৩৫৮৮ বর্গমাইল। ১৯২৭-৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জরিপে আয়তন নির্দিষ্ট হয় ২৭০১ বর্গ-মাইল।

মোগল সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবায় বিভক্ত করা হয়। পনেরোটি সুবার অন্যতম বাঙ্গালা সুবা। বাঙ্গালা সুবা উনিশটি সরকারে বিভক্ত হয়। আইন-ই-আকবরীতে সরকার সরিফাবাদ, সরকার সাত গাঁও, সরকার সুলেমানাবাদ এবং সরকার মাদারণের (মান্দারণ) উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সরকার কয়েকটি মহালে বিভক্ত ছিল আইন-ই-আকবরীতে বর্ধমান সরিফাবাদ পরগণার অন্তর্গত একটি মহল। সরিফাবাদ সরকারের আয়তন ছিল বর্ধমান শহর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ফতে সিং পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সম্রাটের পুত্র ফারুক সিয়র জাফর খাঁ বা মুর্শিদকুলি খাঁকে বাঙ্গালা সুবায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। জাফর খাঁ সমগ্র বঙ্গদেশকে তেরোটি চাকলায় বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে বর্ধমান একটি চাকলা। সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ বা সেলিমবাদের অধিকাংশ, মান্দারণের প্রায় অধিকাংশ এবং সাতগাঁও-এর কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত হয় বর্ধমান চাকলা। বর্ধমান চাকলায় ৬১টি পরগণা ছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান চাকলার রাজারূপে চিত্রসেন রায় দিল্লীর মোঘল সম্রাট মহম্মদ শাহের সনন্দ লাভ করেছিলেন।

মহারাজা কীর্তিচাঁদ কয়েকটি পরগণা অধিকার করায় বর্ধমান চাকলার আয়তন বর্ধিত হয়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার অংশবিশেষ, দক্ষিণে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী রূপনারায়ণ নদের মোহানা পর্যন্ত, পূর্বে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর ও সরস্বতী নদীর পশ্চিম তীর (সাত সৈকা পরগণা বাদে), পশ্চিমে পঞ্চকোট পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সরস্বতী নদীর পূর্বতীর ও সাতসৈকা পরগণা বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চাকলা বর্ধমানের দেওয়ানি লাভ করে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সার্ভেয়ার জেম্‌স্ রেণলের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ধমান চাকলার আয়তন ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাকলাগুলির আয়তন খর্ব করে জেলা গঠিত হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার সৃষ্টি হয় এবং বগড়ী পরগণা বর্ধমান থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরে পাণ্ডুয়া ও অন্যান্য কিছু অঞ্চল হুগলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ১৮৩৭ সালে বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান, কাটোয়া, কালনা, জাহানাবাদ, বুদবুদ ও রাণীগঞ্জ এই ছয়টি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয় বর্ধমান জেলা। এই সময়েই পরগণার উপবিভাগ হিসাবে থানার প্রচলন হয়।

বর্ধমান নামকরণের হেতু

বর্ধমান শব্দে বোঝায়, যা ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে। একটি মতানুসারে উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সময়ে এই অঞ্চল আর্যীকরণের সীমারূপে নির্ধারিত হয়। এই অঞ্চল ছিল কৃষিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ। প্রত্যন্ত অঞ্চলটি তাই বর্ধমান নামে পরিচিত হয়। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত মত এই যে, জৈন তীর্থংকর মহাবীর বর্ধমানের নামানুসারে বর্ধমান নামকরণ হয়েছে। খ্রীঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর বর্ধমান বর্ধমানের অস্থিক নগরে অবস্থানের পরে জম্ভীর গ্রাম বা জৌগ্রামে কৈবল্য লাভ করেছিলেন। মহাবীরের নামে এই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয়। অপর একটি মতে বোড়ো ডোমন বা বড়ডমন শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে বর্ধমান। গ্রীক ভৌগলিক টলেমি ব্রডমন শব্দটির উল্লেখ করেছেন। ব্রডমন শব্দটি অষ্টিক বোড়োডামন শব্দেরই রূপান্তর। দামোদরের শাখা নদী বল্লুকার তীরে মেমারির কাছে বরোঁয়া নামে গ্রামটিই প্রাচীন বর্ধমান। বোড়ো ও ডোম জাতি প্রধান হওয়ায় বোড়ো ডমন থেকে বর্ধমান শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে।

চতুঃসীমা

বর্ধমান জেলার উত্তরে সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্বে নবদ্বীপ বাদে নদীয়া জেলা, দক্ষিণে হুগলী বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া, পশ্চিমে বিহারের ধানবাদ জেলা। পশ্চিমে বরাকর নদী বর্ধমান তথা পশ্চিম বঙ্গের সীমা নির্ধারণ করেছে। উত্তরে অজয় নদ বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণাকে পৃথক করেছে। পূর্বে ভাগীরথী নদীয়া ও বর্ধমান জেলার স্বাভাবিক সীমারেখা। নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত হলেও নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। দামোদর পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যে স্বাভাবিক সীমারেখা। বরাকর থেকে কালনায় ভাগীরথী পর্যন্ত জেলার দৈর্ঘ্য ২০৮ কি. মি., উত্তর-দক্ষিণে-সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত ১১২ কি. মি.।

বর্ধমান জেলাকে পাঁচটি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়েছিল যেমন,—বর্ধমান সদর, দুর্গাপুর, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়া। বর্ধমান, খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর, মেমারি, গলসি, ভাতার ও আউস গ্রাম থানা নিয়ে বর্ধমান সদর মহকুমা গঠিত। সালানপুর, কুলটি, হীরাপুর, আসানসোল, বরবনি, জামুরিয়া ও রাণীগঞ্জ নিয়ে আসানসোল মহকুমা। কালনা, পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর থানা কালনা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। কাটোয়া মঙ্গলকোট এবং কেতুগ্রাম থানা নিয়ে কাটোয়া মহকুমা। দুর্গাপুর, ফরিদপুর, কাঁকসা, বুদবুদ এবং অণ্ডাল থানা দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৮১ সালে দুর্গাপুর থানাকে ভাগ করে দুর্গাপুর, কোক ওভেন ও নিউ টাউনশিপ নামে তিনটি থানা গঠিত হয়। বর্ধমান সদর মহকুমাকে ভাগ করে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ধমান নামে দুটি মহকুমার সৃষ্টি হয়। সুতরাং বর্তমানে বর্ধমান জেলায় ছয়টি মহকুমা। এই জেলায় মোট ৩৩টি ব্লক। বর্ধমান, কালনা, দাঁইহাট, কাটোয়া, রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও গুসকরা—পৌরসভার এলাকাধীন। ১৯৮১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী বর্ধমান জেলার আয়তন ৭০২৪'৪৫ বর্গ কি. মি., জনসংখ্যা ৪৮,৩৫,৮৮৬, গ্রামের সংখ্যা ২৭২৮, পঞ্চায়েতের সংখ্যা ২৯৩। সমগ্র জেলায় গ্রামাঞ্চল ৬৫৪৮'৬ বর্গ কি. মি., জন সংখ্যা ৩৪.১৪,২১৯, শহরের সংখ্যা—৪৯, অধিবাসীর সংখ্যা ১৪,২১,১৬৯।

মহকুমা ও থানা

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বর্ধমান জেলাকে দুটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল। আসানসোল মহকুমা ও বর্ধমান সদর মহকুমার পশ্চিম-ভাগ নিয়ে পশ্চিম অঞ্চল। পশ্চিমে বরাকর থেকে পানাগড় পর্যন্ত মালভূমি সদৃশ পাথর-কাঁকর রাঙ্গামাটির রুক্ষ উচ্চাবচ ভূমি। কোথাও ভূমি সমতল, কোথাও ক্ষুদ্র পাহাড় বা টিলার অবস্থিতি। কাঁকর-মাটির স্তূপ বরাকর, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, কুলটি, অণ্ডাল রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত। এক সময়ে দুর্গাপুরের সন্নিহিত অঞ্চল কাঁকসা ফরিদপুর, আউসগ্রাম থানা অঞ্চলে শাল পলাশের ঘন অরণ্য ছিল, যা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। এই অঞ্চল কয়লার খনির জন্য প্রসিদ্ধ। আসানসোল মহকুমায় মাটির নীচে প্রচুর কয়লা সঞ্চিত আছে।

ভূ-প্রকৃতি

বর্ধমানের পূর্বাঞ্চল বর্ধমান দক্ষিণ, কালনা, কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীর পলিমাটি দিয়ে গঠিত উর্বর ভূমি প্রভূত শস্য উৎপাদনের উপযোগী।

প্রভূত বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর ধান পাট এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। রবিশস্যের উৎপাদন ও যথেষ্ট পরিমাণে হয়ে থাকে।

দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী বর্ধমান জেলার প্রধান নদ নদী। এ ছাড়া বরাকর, ব্রাহ্মণী, খড়ি বাঁকা, কুনুর গাঙ্গুর, বেহুলা, খণ্ডেশ্বরী, গৌরী প্রভৃতি ছোট বড় নদীগুলি এই জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত। দামোদর হাজারিবাগ জেলার পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অতিক্রম করে দিসের গড়ের কাছে বরাকর নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। খুদিয়া এবং হুদিয়া নামে দুটি নদী এবং বরাকর নদ একত্রিত হয়ে বিশাল দামোদরে পরিণত হয়েছে।

নদ নদী

এই সম্মিলিত জলধারা দক্ষিণ-পূর্বমুখে প্রবাহিত হয়ে বাঁকুড়া জেলার সীমারেখা রচনা করে খণ্ডঘোষ, গলসী, বর্ধমান মেমারি ও জামালপুর থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মোহনপুর পেরিয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। দামোদর বহুবার গতিপথ পরিবর্তন করেছে। দামোদরের একটি শাখা বর্ধমান থেকে পূর্বমুখে অগ্রসর হয়ে কালনার নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হয়েছে। এই খাত গাঙ্গুর-বেহুলা নামে পরিচিত। বর্ধমান শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বাঁকা নদীও দামোদরের মরা খাত বলে স্বীকৃত। দামোদর থেকে মেমারির নিকটবর্তী অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যপ্রসিদ্ধ বল্লুকা নদী সমুদ্রগড়ের নিকটে ভাগীরথীতে পড়েছে। খড়ি নদী ও দামোদরের প্রাচীন খাত রূপে স্বীকৃত। খড়ি মানকরের নিকটে উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রগড়ের নিকটে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বেহুলার উৎপত্তি রসুলপুরে। গাঙ্গুরেরও উদ্ভব রসুলপুরের দক্ষিণে ইডেন ক্যানেল থেকে। মেমারি অতিক্রম করে পূর্বমুখে অগ্রসর হয়ে দুই নদী একত্র সম্মিলিত হয়েছে এবং বেহুলা নামে কালনার নিকটে ভাগীরথীতে মিশেছে। বাঁকা দামোদরের নিকটে গোপালপুরে উদ্ভূত হয়ে বর্ধমান শহরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে। ননিয়া নদী আসানসোল মহকুমার সালানপুর থানায় উদ্ভূত হয়ে পুনত খাল এবং দামোদর নালার সঙ্গে মিলিত হয়ে আসানসোল অতিক্রম করে রাণীগঞ্জ থানায় দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তমলা নদী উখরা গ্রামের দক্ষিণে উৎপন্ন হয়ে দুর্গাপুর থানার বীরভানপুরে দামোদরে মিলিত হয়েছে। অজয় নদের উৎপত্তি মুঙ্গের জেলায়। সাঁওতাল পরগণা থেকে আগত পথরো ও জয়ন্তী এবং বর্ধমান জেলায় তুমুনি ও কুনুরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বীরভূম ও বর্ধমানের সীমা নির্দেশ করে

কাটোয়ায় ভাগীরথীতে আত্মদান করেছে। ইছাপুরের পশ্চিমে বাঁশগর মৌজা থেকে উৎপন্ন হয়ে এগারোটি উপনদী সংযুক্ত হয়ে অজয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কানা দামোদর এবং কানা নদী দামোদরের প্রধান খাত। কানা নদী দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে হুগলী ও বর্ধমান জেলার সীমারেখা হিসাবে কাজ করেছে। কানা দামোদর সরাসরি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। ভাগীরথী বর্ধমান জেলার প্রধান নদী—বর্ধমান জেলার পূর্ব সীমা, কাটোয়ায় অজয়ের জলধারা, সমুদ্রগড়ে খড়ি নদীর জল বহন করে শান্তিপুর ও কালনার সীমা নির্ধারণ করেছে। দারকেশ্বর বাঁকুড়া জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বাঁকুড়া ও হুগলীর সীমা নির্ধারণ করেছে, তৎপরে খণ্ডঘোষ থানার রৌতারা মৌজায় বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করে বর্ধমান ও হুগলী জেলার সীমা নির্দেশ করে মনিয়ারী গ্রামে হুগলীতে প্রবেশ করেছে। এই নদের প্রায় দশ কিলোমিটার বর্ধমান জেলার মধ্যে অবস্থিত।

একসময়ে বর্ধমান জেলার নদীগুলি প্রবহমান এবং নৌচালনার উপযোগী ছিল: মঙ্গল কাব্যগুলি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দামোদর ও অজয় নদের উপর দিয়ে রাণীগঞ্জের কয়লা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতায় পৌছাতো। কিন্তু অরণ্যসংহার, ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন, রেলপথের বিস্তার প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ নদনদীই মজা খাতে পরিণত হয়। দামোদর ও অজয়—প্রধান নদ দুটিও নাব্যতা হারায়। গ্রীষ্মে এই দুই নদ যেমন বালুকাময় প্রায় শুষ্ক খাতে পরিণত হয়, বর্ষায় জলরাশি তেমনি ভয়াবহ প্লাবন সৃষ্টি করে। নদীগুলি মজে যাওয়ায় কৃষিকর্মের জন্য বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করতে হোত। জল

সেচ ব্যবস্থা

সেচের জন্য ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর ক্যানেলের খনন কার্য সুরু হয় এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে এই খাল দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। বর্ধমান থানার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এই ক্যানেল জামালপুর থানার মধ্য দিয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে। বর্ধমান জেলায় এই খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল এবং শাখা-প্রশাখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬ মাইল। এই খালের দ্বারা প্রধানতঃ উপকৃত হয়েছে জামালপুর থানা। বিশাল বর্ধমান জেলার তুলনায় এই সেচ ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। আরও পূর্বে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইডেন ক্যানেল খনন সমাপ্ত হয়। এই ক্যানেলের সাহায্যে ১৮৮৮-৮৯ সালে ২১০০০ একর জমি সেচের আওতায় আসে।

বর্ষার বিপুল জলরাশি ধারণে অক্ষম দামোদর প্রায়শঃই প্লাবন ঘটিয়ে বর্ধমান জেলাকে বিপন্ন করে তুলতো। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ বন্যায় বর্ধমান শহর বিপর্যস্ত হয়েছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দামোদরের বাঁধভেঙ্গে বর্ধমান থেকে মেমারি থানা, কালনা থানা ও হুগলীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করে বিপুল শস্যহানি ঘটিয়েছিল। সুতরাং দামোদরের বিপুল জলরাশিকে বন্দী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডি. ভি. সি. গঠিত হয়। বরাকর নদের প্রবাহ পথে তিলাইয়া বাঁধ ও জলাধার নির্মিত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলসেচের জন্য দামোদর বরাকরে তিনটি জলাধার নির্মিত হয়েছে—পাঞ্চেত, মাইথন ও দুর্গাপুর। মাইথন বাঁধ বরাকর নদের উপরে এবং পাঞ্চেত পাহাড়ে দামোদরের উপরে পাঞ্চেত বাঁধ নির্মিত হয়েছে। দামোদর ও বরাকরের সঙ্গমস্থলের পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে মাইথন বাঁধ ও ১৩ কি. মি. উত্তরে পাঞ্চেত বাঁধ অবস্থিত। দুর্গাপুর বাঁধ নির্মিত হয় ১৯৫৫ সালে। দামোদর ভ্যালির নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৯৫৮ সালে। দুটি বড় ক্যানেল দুর্গাপুর জলাধার থেকে বাঁকুড়া ও বর্ধমানের বিস্তীর্ণ ভূভাগে সেচের জল সরবরাহ করে। ইডেন ক্যানেলকেও দামোদরের প্রধান ক্যানেলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে দুটি প্রধান ক্যানেলের সাহায্যে প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমি জলসেচের আওতায় এসেছে। বীরভূম জেলায় নির্মিত ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনায় কেতুগ্রাম থানার কিয়দংশ সেচযোগ্য হয়েছে। সেচের সুবিধার জন্য বহুজমিতে একাধিকবার ফসল উৎপন্ন হচ্ছে।

এছাড়া জলসেচের জন্য প্রচুর পুষ্করিণী খনন করা হয়েছে। দামোদর ভ্যালি এলাকায় পুষ্করিণীর সংখ্যা ১৭৩১১, পুষ্করিণীর জলে চাষ হয় এক লক্ষ একর জমির। কয়লাখনি অঞ্চলে কতকগুলি কৃত্রিম জলাধারও নির্মিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নোনিয়া খাল এবং সিঙ্গরণ নালা। জোড় নালার উপরে চলবলপুর বাঁধ, নপুর বিল এবং অণ্ডাল ও রাণীগঞ্জের মধ্যে ছোট বাঁধও উল্লেখযোগ্য। অগভীর নলকূপ এবং গভীর নলকূপও প্রচুর পরিমাণে জল সেচের জন্য স্থাপিত হয়েছে।

প্রস্রবণ

বর্ধমান জেলায় পাঁচটি প্রস্রবণ আছে। একটি আসানসোলের নিকটে নোনিয়া খালের দক্ষিণ তীরে, একটি অণ্ডাল থানার অন্তর্গত পাণ্ডবেশ্বরের নিকটে অজয় নদের দক্ষিণ তীরে, একটি

বিষ্ণুপুর গ্রামে তুমুনি নদীর দক্ষিণ তীরে এবং তুটি ওয়ার গ্রামের উত্তরে অবস্থিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দামোদর ও অজয় নৌ-চলাচলের উপযোগী ছিল। কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র বর্ষার সময়েই নৌ-চালনা সম্ভব হয়। ভাগীরথীর প্রবাহ নৌকা চলাচলের জন্য এখনও ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকালে স্টীমার বা ছোট জাহাজ ভাগীরথীর উপরে চলাচল করে, বর্ষায় নাদনঘাট পর্যন্ত ভাগীরথী ও খড়ি নদীর মধ্যে পণ্যবাহী নৌকা চলাচল করে। তুর্গাপুর থেকে ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথী পর্যন্ত নৌকা চলাচলের জন্য যে খাল নির্মিত হয়েছিল, তা এখনও নৌকা ভাসানোর উপযোগী হয় নি। রেলপথ স্থাপিত হওয়ার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে বর্ধমানের সংযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রাণ্ড ট্যাংক রোড বর্ধমান স্টেশনের ধার দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথ (বি. কে. আর) বর্ধমানের সঙ্গে কাটোয়ার যোগাযোগ সহজতর করেছে। এছাড়া হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন, আসানসোল-আদ্রা, অণ্ডাল-সাঁইথিয়া, অণ্ডাল-সীতারামপুর, অণ্ডাল গৌরাঙ্গডি রেলপথ যাত্রী ও পণ্য বহনের কাজ করে থাকে। বাসপথও বর্ধমান শহর থেকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

যোগাযোগ

বর্ধমান জেলা কৃষিজাত এবং শিল্পজাত পণ্যে সমৃদ্ধ। মোট জন সংখ্যার শতকরা ৭৮ ভাগ কৃষিকর্মে নিযুক্ত। ১৯৬১ সালে কৃষিজীবী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৩·৪৮ লক্ষ, ১৯৭১ সালে কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হয় ৫,৯৯,৪৮১। জেলার উত্তর-পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য হয়। পশ্চিমাঞ্চলের মাটি কাঁকর মিশ্রিত ল্যাটারাইট্ শ্রেণীভুক্ত বলে কৃষিকার্যের অনুপযোগী। এই অঞ্চলেও কিছু কিছু সংকীর্ণ সমভূমি বা নিম্নভূমিতে কৃষিকার্য হয়। জল সেচের সুবিধার ফলে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণ জমি কৃষি-জমিতে পরিণত হয়েছে। অকৃষি গোচারণ ভূমি বা আরণ্যক ভূমি কৃষিকর্মের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধানের চাষ সর্বাপেক্ষা বেশী। মোট কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধানের উৎপাদন শতকরা ৮৬ ভাগ। অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে পাট, আলু ও আখ উল্লেখযোগ্য।

কৃষিকর্ম

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমান বঙ্গদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে সুসমৃদ্ধ বর্ধমানের বিবরণ দিয়েছেন। এখানকার বস্ত্রশিল্প সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ভারতচন্দ্র এখানে উৎপাদিত বহুবিধ বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। হলওয়েল সাহেব মহারাজ তিলকচাঁদের জমিদারীতে অন্ততঃ পনেরো রকমের সুতীর কাপড়ের উল্লেখ করেছেন। কাটোয়া, দাঁইহাট, মেমারি প্রভৃতি অঞ্চল বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রেশম ও তসরের কাপড়ও বর্ধমান অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে উৎপাদিত হয়েছে। মানকরের চেলি কাপড় বিখ্যাত ছিল। কালনা ও কাটোয়া মহকুমায় গুটি পোকার চাষ হোত এবং তসরের কাপড় তৈরী হোত। মন্তেশ্বরের 'কেটে' কাপড় বিখ্যাত ছিল। ই. ডব্লিউ কলিন্স্ এর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট অনুযায়ী মেমারি ও রাধাকান্তপুরে দু'শ পরিবার বার্ষিক ৩৫,০০০ টাকার সিল্ক ও গরদের কাপড় উৎপাদন করতো। মানকর ছিল তসর উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এখানে ৪৬০টি পরিবার তসর সিল্ক উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল।[১] এই সকল উৎপন্ন বস্ত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হোত।

শিল্পজাত দ্রব্য

বর্ধমানের চিনি শিল্পও প্রসিদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ধমান ছিল প্রধান চিনি উৎপাদক জেলা। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫০,০০০ মন চিনি উৎপন্ন হয়। কাঠ অথবা পাথরের মোর্টারে জোড়া বলদে টানা চিনির কলকে বলা হোত কুঠু। ইদিলপুরে ছিল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিনির কারখানা। আমদানীকৃত চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং মহাজনদের শোষণের ফলে চিনি উৎপাদন ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়।

নীল উৎপাদনেও বর্ধমান পিছিয়ে ছিল না। এই জেলায় অনেকগুলি নীলের কারখানা ছিল। ১৮৭৪-৭৫ সালে ১০২০ মন নীল উৎপাদিত হয়েছিল। জার্মানীতে কৃত্রিম নীল উৎপন্ন হওয়ায় উনিশ শতকের শেষ দিকে নীলের চাষ বন্ধ হয়ে যায়।

তামা এবং পিতলের বাসনের জন্যও বর্ধমান বিখ্যাত ছিল। ১৮৮৭-৮৮ সালে ৯০ লক্ষ টাকার তামা, পিতল, কাঁসা ইত্যাদির দ্রব্য রপ্তানি হয়। বর্ধমান জেলায় ১৩০০ পরিবার পিতল, কাঁসার বাসন তৈরীতে নিযুক্ত ছিল। সাহেবগঞ্জ

১। Report on Existing Arts and Industries in Bengal—E. W. Collins. 1982, PP. 8-9.

বনপাশ, দাঁইহাট, দেওয়ানগঞ্জ, পূর্বস্থলী এবং কালনা ছিল পিতল, কাঁসার তৈজস পত্রাদি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

বর্ধমানের নিকটবর্তী কাঞ্চন নগর লৌহ-ইস্পাতের শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। কাঞ্চন নগরের তরবারি, কাটারি, ছুরি, কাঁচি ও তালা প্রসিদ্ধ ছিল। উনিশ শতকে বঙ্গদেশ, বোম্বে ও অন্যান্য স্থানের ছুরি কাঁচির চাহিদা মেটাতো কাঞ্চন নগর। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও কাঞ্চন নগরে ছয় থেকে আট হাজার টাকার ছুরি কাঁচি উৎপন্ন হয়েছে। ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মানের মৃৎপাত্র উৎপাদিত হোত। আসানসোল বিখ্যাত ছিল পশমের কম্বল উৎপাদনের জন্য। ঢেঁকিতে উৎপন্ন চাউল ছাড়াও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর চালের কল স্থাপিত হয়। এই জেলায় চাল কলের সংখ্যা—৮৭। এ ছাড়াও মাদুর, বাঁশের ঝুড়ি, পেতে, মোড়া ইত্যাদি, কাঠের কাজ, ঘানির তেল, আখের গুড়, বিড়ি, চিড়ামুড়ি ইত্যাদি ক্ষুদ্রশিল্প হিসাবে এই অঞ্চলের মানুষের জীবিকার উপায়। মিষ্টান্নের মধ্যে বর্ধমানের সীতা-ভোগ, মিহিদানা, শক্তি-গড়ের ল্যাংচা, মানকরের কদমা, সিঙ্গারকোণের সন্দেশ ইত্যাদি বিখ্যাত।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন নামে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে দিশেরগড় ইলেকট্রিক সাপ্লাই, আসানসোল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং ইত্যাদি স্থাপিত হতে থাকে। ছোটনাগপুরের কালেকটর হার্টলি নামে এক ইংরাজ গ্রার্ণার নামে অপর এক ইংরাজের সাহায্যে প্রথম কয়লা উৎপাদনের ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী অঞ্চলে খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করা হয়। রুপার্ট জোন্‌স্ লর্ড হেষ্টিংস-এর প্রেরণায় কয়লা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন এবং সরকারী সাহায্যে রাণীগঞ্জের নিকটে এগারা গ্রামে কয়লা উত্তোলন করেন। বিভিন্ন কোম্পানির হাত থেকে কয়লা উৎপাদনের ভার পড়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর হাতে। এগারা গ্রামে প্রথম কোলিয়ারী স্থাপিত হয়। কুড়ি বৎসরের মধ্যে কয়লা উৎপাদন দাঁড়ায় বার্ষিক ৩৬,০০০ টনে। কয়লা, নিম্নমানের আকরিক লৌহ ও ফায়ার ক্লে (Fire Clay) বর্ধমানের খনিজ সম্পদ।

দুর্গাপুর

বর্তমানে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল হিসাবে বর্ধমান জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পূর্বে দুর্গাপুর ছিল আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত একটি থানা। উপলাস্তৃত রুক্ষ

ভূমি ও জঙ্গলমহল ছিল দুর্গাপুরের ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপুর পৃথক মহকুমারূপে আত্মপ্রকাশ করে। দুর্গাপুর, অণ্ডাল, ফরিদপুর, কাঁকসা এবং বুদবুদ এই পাঁচটি থানা নিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা। পূর্ব রেলওয়ে ১৮৫৫ সালে বর্ধমান থেকে অণ্ডাল পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত করে। দুর্গাপুর শহরের সূচনা হয় এই সময় থেকেই। স্বাধীন ভারতে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আধুনিক দুর্গাপুরের নির্মাতা। তিনি ১৯৫৪ সালে দুর্গাপুরে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সহ কোকচুল্লী ও লৌহপিণ্ড উৎপাদন কারখানার জন্য দিল্লীর শিল্প মন্ত্রকের অনুমোদন লাভ করেছিলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে কারখানার উৎপাদন সুরু হয়। এখান থেকেই দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জয়যাত্রা সূচিত হয়।

১৯৬১ সালে উক্ত কারখানা দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড্ কোম্পানী (DPL) নামে স্বীকৃতি লাভ করে। এই কারখানা থেকে উপজাত দ্রব্যের মধ্যে পীচ উৎপাদনের কেন্দ্র (Tar Plant) কোল গ্যাস সরবরাহ কেন্দ্র (Gas Grid) প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড্ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার অধীনে চারটি বড় ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্মাণের জন্য ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের উদ্যোগে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেড্ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা কয়লার খনির যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সোভিয়েত সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালে ওয়ারিয়া স্টেশনের নিকটে দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (DTPS) নামে একটি ব্রিটিশ কোম্পানির আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ ছাড়া মিশ্র ইস্পাত কারখানা (Alloy Steel Plant) জাপানী জেসকন (Jascon) সংস্থার সহযোগিতায় স্থাপিত হয় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। আরও ছোটবড় মাঝারি শিল্পসংস্থা গড়ে ওঠায় দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গে প্রধান শিল্প নগরীতে পরিণত হয়। কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৯৬০ সালে Regional Engineering College নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাঁকুড়া জেলার জগন্নাথপুর গ্রাম নিবাসী গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে নাডিহা গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি বর্ধমানরাজ তিলকচাঁদের

কাছ থেকে জঙ্গল মহলের একাংশ বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই অঞ্চল 'লাট গোপীনাথপুর' মৌজা নামে পরিচিত হয় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। গোপীনাথের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণ লাট গোপীনাথপুর মৌজার জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মগড়ভাঙ্গা জলা সংস্কার করে কৃষিকার্যের সুবন্দোবস্ত করেন, বাঁধের নিকটবর্তী স্থানে বসতবাটী, জমিদারী সেরেস্তা এবং গৃহদেবতা কালী ও ভৈরবের (মহাদেব) মন্দির স্থাপন করেন। শিবমন্দিরের ফলকে প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে ১৭১৫ শকাব্দ বা ১৭৯৩—৯৪ খ্রীষ্টাব্দ উল্লিখিত আছে। দুর্গাচরণের নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় দুর্গাপুর। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বরেলের শাখা অণ্ডাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার সময়ে দুর্গাপুর স্টেশন স্থাপিত হয়। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নূতন পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টার ফলে দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে শিল্পনগরী গড়ে উঠতে থাকে।[১]

দুর্গাপুরে বহু প্রাচীনকালে লোকবসতির সন্ধান পাওয়া যায় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে। ১৯৫৪ সালে দামোদর নদ থেকে ক্যানেল কাটার সময়ে ২৮২টি ক্ষুদ্রাকৃতি আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়। বীরভানপুর, কাঁকসা, আড়া, মগড়ভাঙ্গা, গোপালপুর ও বুদবুদ থানার অন্তর্গত ভরতপুরে প্রচুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে। গবেষকগণ মনে করেন যে ৩০,০০০ থেকে ২০,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি নির্মিত হয়েছিল।[২] মুসলমান আমলে দুর্গাপুর মহকুমায় খাঁজরার সরকার বংশ, উখড়ার লালসিংহ বংশ; সর্পির রায়চৌধুরী বংশ এবং আড়া বীরভানপুরের রায় বংশ—প্রাচীন জমিদার পরিবারের বিবরণ পাওয়া যায়। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (D. V. C.) এবং দামোদরের বাঁধ ও জলাধার আধুনিক দুর্গাপুরে ঐশ্বর্য হিসাবে গণ্য।

১৯৭০-৭১ সালে দুর্গাপুরে কুড়িটি বৃহৎ শিল্প এবং ৪০টি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়। এই সময়ে ৬০০ কোটি টাকা শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং ৬০,০০০ লোক কারখানা কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিল।

দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ছাড়াও রাণীগঞ্জের Bengal Paper Mill নামে কাগজের কারখানা, আসানসোলের নিকটবর্তী জেমেরি নামক স্থানে এলুমিনিয়ম

১। দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৪) পৃঃ ১০-১৪।
২। তদেব পৃঃ ১৫-১৯।

কারখানা, রেলের ইঞ্জিন ও বয়লার তৈরীর জন্য চিত্তরঞ্জনে লোকোমোটিভ কারখানা, আসানসোলের নিকটে কল্যাপুরে সেন র‍্যালে কোম্পানীর সাইকেল তৈরীর কারখানা, বার্ণপুরে লোহার কারখানা প্রভৃতি বর্ধমান জেলার উল্লেখযোগ্য বৃহৎ শিল্প।

বঙ্গালা সাহিত্যে বর্ধমান

সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যা-চর্য বিনিশ্চয়ঃ বা চর্যাপদ। মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যকে আদিমধ্য এবং অন্ত্যমধ্য —এই দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আদিমধ্যযুগের একমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টি বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিপুল সৃষ্টি সম্ভার অন্ত্যমধ্যযুগের পর্যায়ভুক্ত। মধ্যযুগীয় কাব্যের কবিদের সকলের পরিচয় আজও অজ্ঞাত। যতটুকু পাওয়া যায়, তা থেকেই জানা যায় যে এই সময়ে বর্ধমান জেলার অধিবাসী কবিদের সংখ্যা স্বল্প নয়।

মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের বঙ্গসাহিত্যে বর্ধমান জেলার দান অসামান্য। সাহিত্য হিসাবে মধ্যযুগের প্রাচীনতম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। কাব্যের মধ্যবর্তী ভণিতা থেকে জানা যায় যে, এই কাব্যের কবির নাম চণ্ডীদাস, বড়ু বা অনন্ত বড়ু সম্ভবতঃ কবির উপাধি। পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস ভিন্ন ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের শেষ নেই। আরও দুই বা তিন জন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কোন কোন পণ্ডিত স্বীকার করে থাকেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে চণ্ডীদাস সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান এক প্রকার অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাস

কতকগুলি কিম্বদন্তী বা কিম্বদন্তীমূলক আদিরসাত্মক কাহিনী ছাড়া চণ্ডীদাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি কিনা, এ বিষয়ে নানাবিধ যুক্তিতর্ক অদ্যাবধি অব্যাহত। চণ্ডীদাসের বাসস্থান সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, তিনি বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর উপাসক ছিলেন, পরে রামী ধোপানীর সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন—এই

কাহিনী বহু ব্যাপ্ত এবং জনপ্রিয়। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডীদাস ছিলেন বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রাম নিবাসী। উভয় স্থানেই চণ্ডীদাসের ভিটি ও চণ্ডীদাস-পূজিত বাশুলী দেবী আছেন। আচার্য সুকুমার সেন বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম-নিবাসী কবীন্দ্র চণ্ডীদাসের প্রতি বাঙ্গালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কাটোয়ার উত্তরে কেতুগ্রামের অধিবাসী সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের 'গণমার্তণ্ড' টীকা রচয়িতা নৃসিংহ তর্ক পঞ্চানন তাঁর পূর্বপুরুষ কবীন্দ্র চণ্ডীদাসের প্রশস্তি রচনা করেছেন—

ধীরশ্রীলনৃসিংহজে মুখকুলে জাতঃ কবীনাং রবী-
র্বিদ্যানামনুকম্পয়া বিতরণে মহাংস্থপর্বক্রমঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচতুরোহলংকারটীকাকৃতি-
র্ভট্টাচার্যশিরোমণির্বিজয়তে শ্রীচণ্ডিদাসাভিধঃ॥[১]

ধীর, শ্রীল নৃসিংহের বংশে মুখুটিকুলে জাত, কবিদের সূর্য, অনুকম্পায় বিদ্যা-বিতরণে মহান্ কল্পবৃক্ষস্বরূপ, নানা শাস্ত্র বিচার নিপুণ, অলংকার শাস্ত্রের টীকা রচয়িতা চণ্ডীদাস নামে ভট্টাচার্য শিরোমণির জয় হোক।

নৃসিংহ চণ্ডীদাস থেকে অধস্তন দশম পুরুষ। তিনি নিজ পিতাকে 'চণ্ডীদাসকুলাজার্ক' এবং নিজেকে চণ্ডীদাসকুলোদ্ভব, চণ্ডীদাস কুলোৎপন্ন ইত্যাদি রূপে অভিহিত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "ইনি প্রাচীন পদাবলীর ও মূল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাস হইতে পারেন। কালের দিক দিয়া অসুবিধা নাই। স্থানের দিক দিয়া সুবিধাই হয়। নানুর হইতে চামুণ্ডার (বাশুলীর) পীঠস্থান কেতুগ্রাম ও ক্ষীরগ্রাম খুব বেশী দূরে নয়।"[১]

ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার বার্ষিক পূজা-উৎসবে ডোমচাঁড়ালি নামে এক প্রকার অশ্লীল অনুষ্ঠান হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ডোমচাঁড়ালির উল্লেখ আছে। কেতুগ্রামে চণ্ডীদাস পূজিতা বাশুলী বা বিশালাক্ষীর মন্দিরের ভিটা আছে। কেতুগ্রামে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে চণ্ডীদাস বাশুলী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে নানুরে চলে গিয়েছিলেন। এই কারণে কেতুগ্রামের তিলি বংশীয় রাজা নানুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নানুরের রাজার নিকট পরাভূত হয়ে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্তানুসারে দুর্গাপূজার সময় দেবীর পূজা ও বলি কেতুগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৭৮।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাস যদি কেতুগ্রামবাসী হন, তাহলে বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাতকাল থেকেই বর্ধমান গৌরবের আসন অধিকার করেছিল।

আদি মধ্যযুগের পরে অন্ত্য মধ্যযুগ। এই যুগের বঙ্গসাহিত্যের তিনটি প্রধান শাখা—মঙ্গল কাব্য, অনুবাদকাব্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্য। এই তিনটি শাখাতেই বর্ধমানের অবদান গৌরবজনক। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের তিনটি প্রধান শাখা—মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। এই তিনটি শাখাতেই বর্ধমান জেলার অবদান অসামান্য। বর্ধমান জেলা নিবাসী মনসামঙ্গলের

ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস

অন্যতম প্রধান কবি ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ কেতকাদাস। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মত পরিত্যক্ত হয়। ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস একই ব্যক্তি, এই মত বর্তমানের সকল পণ্ডিতের দ্বারাই স্বীকৃত। কেতকা মনসার এক নাম, কারণ ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসা কেয়া পাতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং কবির নাম ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ এবং কেতকাদাস তাঁর উপাধি। আচার্য সুকুমার সেনের মতে কবির নাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর উপাধি।[১]

ক্ষেমানন্দ বর্ধমান জেলার কবি। কবি তাঁর জন্মস্থান বা বাসস্থানের নাম উল্লেখ না করলেও অভ্যন্তরীণ প্রমাণে বোঝা যায় যে তিনি বর্ধমান অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন। গাঙ্গুরের জলে লখীন্দরের শবসহ বেহুলার যাত্রাপথে বর্ধমান থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত 'গাঙ্গুর-বেহুলা' নদীর তীরে তীরে বর্ধমান জেলার গাঙ্গপুর, বৈদ্যপুর, পীরতলি, নারিকেলডাঙ্গা উদয়পুর, গোদা প্রভৃতি যে সমৃদ্ধ গ্রামগুলির উল্লেখ কবি করেছেন, তা থেকে তাঁকে এই অঞ্চলের অধিবাসী বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত। ক্ষেমানন্দ যে আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন মুকুন্দরামকে অনুসরণ করে তা থেকে জানা যায় যে কবির পিতা শঙ্কর মণ্ডল দক্ষিণ রায়ের সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা বারা খাঁর কর্মচারী ছিলেন। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বারা খাঁ প্রদত্ত একটি দানপত্র পাওয়া গেছে। বারা খাঁর সমাধি বর্ধমানের পশ্চিমে শিলিমপুর গ্রামে আছে। সুতরাং ক্ষেমানন্দ ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে বর্ধমানের নিকটবর্তী স্থানে বসে মনসার ভাসান রচনা করেছিলেন।

ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে পৌরাণিক হরপার্বতীর কাহিনীকে গৌণস্থান দিয়ে

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, ২য় সং, পৃঃ ২৫৪।

চাঁদ সওদাগরের কাহিনীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বেহুলার স্নিগ্ধ কোমল তেজস্বিনী মূর্তিটিকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। বেহুলা আদর্শের প্রতিমূর্তি না হয়ে রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছেন। স্বচ্ছ সরল প্রসাদগুণ-যুক্ত গ্রাম্যতা বর্জিত ভাষায় তিনি শৈথিল্য বর্জিত সংহত কাব্য-কাহিনীতে সর্বত্র উচ্চ আদর্শ বজায় রেখে মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। উচ্চ কবিত্ব শক্তি, সহৃদয়তা ও করুণ রস সৃষ্টির দক্ষতা ক্ষেমানন্দের কাব্যের উল্লেখযোগ্য গুণ।

বিষ্ণু পাল নামক অপর এক মনসামঙ্গলের কবির পুঁথি দক্ষিণ বীরভূম এবং বর্ধমান অঞ্চলে পাওয়া গেছে। দক্ষিণ পশ্চিম বর্ধমানে বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল এখনও জনপ্রিয়। তাঁর কাব্যে হাসনহাটী নারিকেলডাঙ্গার উল্লেখ এবং বর্ণনা আছে। সেইজন্য বিষ্ণুপালকে বর্ধমান অঞ্চলের কবি বলে অনুমিত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে বিষ্ণুপাল জাতিতে কুম্ভকার ছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন বিষ্ণুপালকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুসরণে বিষ্ণুপাল তাঁর কাব্যকে আটটি পালায় বিভক্ত করেছেন। সেইজন্য তাঁর কাব্য অষ্টমঙ্গলা নামেও পরিচিত। তাঁর কাব্য প্রায় পুরোপুরি আঞ্চলিক কথ্য-ভাষায় রচিত। পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তাঁর কাব্য শিথিল-বন্ধন। লোক-প্রচলিত কাহিনী লোক-প্রচলিত ছড়া, মেয়েলি ছড়া, প্রহেলিকা জাতীয়পদ বিষ্ণুপালের কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

বিষ্ণুপাল

মনসামঙ্গলের অপর এক কবি রসিক মিশ্র জগতীমঙ্গল নামে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। বর্ধমান জেলার উত্তরে সেনভূম পরগণার কাঁকুটা নন্দনপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিল। পরে তিনি মল্লভূমে আখড়াশাল গ্রামে বাস করেছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল শ্রীকবিবল্লভ, ভণিতায় কবি কঙ্কণ উপাধিও পাওয়া যায়।

রসিক মিশ্র

মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান শাখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি, তথা সমগ্র মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। মুকুন্দরামের কাব্যে আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর তীরে দামিন্যা বা দামুন্যা গ্রামে কবি বংশানুক্রমে কৃষিকার্য অবলম্বনে বসবাস করতেন। দামিন্যা গ্রাম ছিল সেলিমাবাদ শহর

নিবাসী গোপীনাথ নন্দীর তালুকের অন্তর্গত। মানসিংহের সুবাদারির কালে বর্ধমান অঞ্চলের শাসনকর্তা ডিহিদার মামুদ সরিফের শাসনকালে প্রবল অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ফলে প্রজাদের দুর্গতির সীমা ছিল না। এই দুর্দিনে ধনী হয়েছিল নির্ধন, দরিদ্র ধনী হয়ে ওঠে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সম্ভ্রম নষ্ট হতে থাকে, গোপীনাথ নন্দী বন্দী হন। তাঁর তালুক বাজেয়াপ্ত হয়। প্রজারা বসতবাটী, ঘরের জিনিসপত্র বিক্রী করে পালাতে থাকে। এই দুর্দিনে মুকুন্দরামও স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় গৃহত্যাগ করেন। পথে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করে কবি উপনীত হন মেদিনীপুর জেলায় ব্রাহ্মণভূমি আরড়ার রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে। বাঁকুড়া রায়ের সভাপণ্ডিত এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক হিসাবে তিনি কালাতিপাত করার পরে বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথের রাজত্বকালে (১৫০৩-১৬০৪ খ্রীঃ) মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ মুকুন্দরামের কাব্য রচনার কাল ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। ডঃ সুকুমার সেনের মতে কবির গৃহত্যাগের কাল ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

মুকুন্দরামের পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতা-হৃদয় মিশ্র, জ্যেষ্ঠ সহোদর কবিচন্দ্র।

বাল্যকাল থেকেই মুকুন্দরাম কবিতা রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর অগ্রজ কবিচন্দ্রের লেখা 'দাতাকর্ণ' ও 'কলঙ্কভঞ্জন' নামক কবিতা দুটি শিশুবোধক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বাস্তব সমাজ চিত্রণ, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য, কৌতুকরস পরিবেশনের দক্ষতা, নাট্যগুণ, জীবনরস, গভীর সহানুভূতি ইত্যাদি গুণের জন্য মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল মঙ্গলকাব্য সংসারে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছে।

কালিকামঙ্গলের কবি কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তীকে কোন কোন পণ্ডিত পূর্ববঙ্গের কবি বলে অনুমান করলেও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সম্ভবতঃ বর্ধমান অঞ্চলের অধিবাসী। কারণ, কবি তাঁর কাব্যে রাঢ়ের সমস্ত দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করেছেন, এমন কি ঘাটু (ঘেঁটু) নামক বর্ধমান অঞ্চলে পূজিত লৌকিক দেবতার নামও উল্লেখ করেছেন। ভারতচন্দ্রের প্রভাব তাঁর রচনায় না থাকায় কবিকে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী বলে অনুমান হয়।

বলরাম চক্রবর্তী

মধ্যযুগের শেষ কবি তথা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার শেষ প্রতিভাবান কবি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি অন্নদামঙ্গল কাব্য রচয়িতা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র

নদীয়া-কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা অলংকৃত করলেও তাঁর জন্ম এবং প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়েছে বর্ধমান চাকলায়। বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরশুট পরগণায় পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া (বর্তমানে হাওড়া জেলায়) গ্রামে ১৭০৫ থেকে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। আঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভুরশুট পরগণায় রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়। পেঁড়োতে ভুরশুট রাজ্যের গড়ে বসবাসকারী নরেন্দ্র রায়ের পুত্র ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের চোদ্দ পনেরো বৎসর বয়সকালে আঃ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান-রাজা কীর্তিচন্দ্র ভুরশুট আক্রমণ করেন। ফলে পেঁড়ো গ্রামও কীর্তিচন্দ্রের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময়ে কবি মণ্ডলঘাট পরগণায় গাজীপুরের নিকটে নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করেন। তিনি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা ও হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফার্সী ভাষা শিক্ষা করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে অগ্রজদের নির্দেশে বিষয়-সম্পত্তি তদারকির কাজে বর্ধমান রাজবাড়ীতে উপস্থিত হন। এই সময়ে তিনি পিতার খাজনা বাকীর দায়ে বর্ধমানরাজ কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। করারক্ষীর সাহায্যে গোপনে মুক্তিলাভ করে ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গার ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মাধ্যমে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রূপে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রাপ্ত হন। পূর্বে দেবানন্দপুরে অধ্যয়ন কালে তিনি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। অন্নদামঙ্গল রচিত হয় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল কাব্য, মানসিংহ কাব্য এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্য এই তিনটি অংশে বিভক্ত অন্নদামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক নূতন মঙ্গল। মানবতা, দেবচরিত্রে মানবত্বের আরোপ, অসাধারণ শব্দ চয়ন কৌশল, ছন্দের বৈচিত্র্য, অলংকার প্রয়োগের দক্ষতা, ব্যঙ্গ কৌতুকের প্রাধান্য, চিত্রকল্প রচনায় নৈপুণ্য, আদিরস পরিবেশনের দক্ষতা ইত্যাদি গুণের জন্য মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে উচ্চ আসনের অধিকারী এবং যুগ-সন্ধির কবি হিসাবে সম্মানিত।

বর্ধমান জেলার চকদীঘির অধিবাসী অদ্বৈতনাথ সিংহ রায়না থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে দ্বিজ মুকুন্দ বা কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিত বিশাললোচনীর গীত বা

বাশুলীমঙ্গল কাব্যের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। কবিচন্দ্র দ্বিজ-মুকুন্দের পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতা-বিকর্তন, মাতা-হীরাবতী, খুল্লতাত গদাধর। মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের (১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ) আমলে ১১৪২ বঙ্গাব্দে মঙ্গলঘাট নিবাসী কিশোর দাস মিশ্র পুঁথিটি নকল করেছিলেন। পুঁথিতে রচনাকাল জ্ঞাপক পয়ার থেকে জানা যায় যে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়েছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদর্শে কাব্যটি রচিত হয়েছে। কাব্যের প্রথমে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যান স্থান পেয়েছে। কালকেতুর কাহিনী এই কাব্যে বর্জিত হয়েছে। ধনপতির উপাখ্যান ধূসদত্তের উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। ধনপতির স্থানে ধূসদত্ত, লহনার স্থলে সত্যবতী, খুল্লনার স্থলে রুক্মিণী, শ্রীমন্তের স্থলে গুণদত্ত এবং সিংহলের পরিবর্তে বর্ধমান নাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া কাহিনী মুকুন্দরামের কাব্যের অনুরূপ। ধূসদত্ত মায়াদহের পুলিনে কমলেকামিনী মূর্তি দেখে বর্ধমানের রাজা সুরথের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন এবং কমলে-কামিনী দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কারাবাস ভোগ করেছিলেন। কাব্যে মুকুন্দরামের প্রভাব লক্ষিত হয়।

দ্বিজ মুকুন্দের বাশুলীমঙ্গল

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ নামে এক কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভবানীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। গঙ্গানারায়ণ বীরভূমের হস্তিকান্দায় মাতুলালয়ে এই কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি বর্ধমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কবির পূর্বপুরুষগণ বর্ধমান জেলার মোটরী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতা তিতুরায় শ্বশুরালয়ে হস্তিকান্দায় বাস করেছিলেন। গঙ্গানারায়ণ চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী বর্জন করে হরগৌরীর পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে গৌরীর পিত্রালয়ে বাস ও পরে স্বামীর সঙ্গে কৈলাসে বাসের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কবি শাক্ত হলেও তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবতার প্রভাব আছে।

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল

কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী নামে আর এক কবি মুকুন্দরামের কাব্য কাহিনীর অনুসরণে কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান অবলম্বনে যোল পালায় বিভক্ত দীর্ঘায়তন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কবি বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে বসবাস করে এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী

তিনি লিখেছেন—

ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্ধমানে যে ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে অকিঞ্চন ॥[১]

রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসাবে প্রসিদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রধানতঃ বর্ধমান জেলারই অবদান। ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ যেমন বর্ধমান জেলার গ্রামে গ্রামে গ্রাম্যদেবতা হিসাবে পূজিত হয়ে থাকেন, তেমনি ধর্মরাজের মহিমা প্রচারক ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান প্রধান কবি বর্ধমান জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন ও কাব্য রচনা করেছেন। ধর্মপূজার প্রবর্তক হিসাবে প্রসিদ্ধ শূন্য পুরাণ, ধর্মপূজাবিধান ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত বল্লুকাতীর্থে ধর্মঠাকুরের উপাসনা করেছিলেন। বল্লুকা নদী বর্ধমান জেলাতেই অবস্থিত। রামাইপণ্ডিতের ঐতিহাসিকতা ও জীবনী সম্পর্কে বিতর্ক থাকলে ও ধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থে যেভাবে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত এবং ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত তাতে তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করা বোধহয় সম্ভব নয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

রামাইপণ্ডিত

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "সমস্ত তথ্যাদি হইতে অনুমিত হইতেছে, বর্ধমানের বল্লুকা নদীর কাছে কোন স্থানে ধর্মপূজা প্রচারক রামাই-পণ্ডিতের জন্ম হওয়া সম্ভব।"[২] আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, "গতবৎসর মেমারির নিকটের বল্লুকা'র খাল নিয়ে আমায় অনুসন্ধান করতে হয়েছিল।......মেমারির খাল, বড় খালে ধর্মঠাকুরের মন্দির......। ধর্মপূজা প্রচারক রামাই পণ্ডিত এই বল্লুকাতীরে বাস করতেন। আমার বিশ্বাস, বল্লুকা দামোদরের এক শাখা ছিল; বাঁকা নদী সেই সহস্র বৎসর পূর্বের বল্লুকা।"[৩] ধর্মমঙ্গল কাব্যে ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের সামন্ত নৃপতি হিসাবে ঢেকুরগড়ে রাজত্ব করতেন। সুতরাং ধর্মমঙ্গল কাব্যকাহিনী বর্ধমান জেলাতেই

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—৩য় খণ্ড, ১ম সং—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৮৮৭

২। তদেব পৃঃ ২৭৬

৩। বিদ্যানিধি পত্রাবলী—শারদীয় বর্ধমান—১৩৭৪, পৃঃ ৬১

উদ্ভূত হয়েছিল। আউসগ্রাম থানার ভাদা গ্রামে রামাই প্রতিষ্ঠিত যাত্রাসিদ্ধি ধর্মঠাকুর ও রামাইএর সমাধি আছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ ময়ুর ভট্টের ও তাঁর কাব্যের প্রামাণিকতা বিতর্কিত। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রকৃত আদি কবির সম্মান লাভ করেছেন রূপরাম চক্রবর্তী। মানিক গাঙ্গুলী নামে এক ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরামকে আদি কবি হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন—

ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তী

বন্দিয়া ময়ুরভট্ট আদিরূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্মগুণগান॥

রূপরাম হেঁয়ালিতে তাঁর কাব্য রচনার কাল নির্দেশ করেছেন, ১৫৪৯ বা ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল। রূপরাম জানিয়েছেন যে বাঙ্গালার সুবাদার শাহ্ সুজার আমলে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। শাহ্ সুজার সুবাদারীর কাল ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রূপরামের কাব্যরচনার কাল বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। মুকুন্দরামের আত্ম-বিবরণীর অনুসরণে রূপরাম তাঁর কাব্যে যে আত্ম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে দামিন্যা থেকে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে বর্ধমান জেলার রায়না থানায় অন্তর্গত কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের জন্ম হয়। পিতা অভিরাম ছিলেন বড় পণ্ডিত, তাঁর বাড়ীতে চতুষ্পাঠী ছিল। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বরের সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় তিনি পাষণ্ডা গ্রামের রঘুনাথ ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করেন, পরে লেখাপড়ার জন্য নবদ্বীপ যাত্রাকালে পলাশনের বিলের কাছে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য ধর্মঠাকুরের আদেশ পান। বাড়ীতে ফিরে এসেও প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি দীঘনগর গ্রামে উপস্থিত হন, এখান থেকে গোপভূম পরগণার এড়াল গ্রামে উপনীত হন। গোপভূমের ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ রায়ের পরামর্শে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

রূপরাম সপ্তদশ শতাব্দীর প্রতিভাবান কবিদের অন্যতম। সহজ সরল অনায়াস গতিসম্পন্ন রচনারীতি, অলংকার বাহুল্য হীনতা, চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা, করুণ ও হাস্য সৃষ্টির নিপুণতা রূপরামের কাব্যকে মনোহারী করে তুলেছে।

শ্যামপণ্ডিত নামে এক কবির নিরঞ্জন মঙ্গল নামে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পুঁথি

পাওয়া গেছে। পুঁথিগুলি বীরভূম ও বর্ধমান জেলার পশ্চিম দিকে পাওয়া গেছে। মনে হয়, কবি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

শ্যাম পণ্ডিত

ধর্মমঙ্গলের আর এক কবি চাষী কৈবর্তজাতীয় রামদাস আদক। ভুরশুট পরগণার রাজা প্রতাপনারায়ণের (ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের নিকটবর্তী হায়াৎপুর গ্রামে রামদাসের জন্ম। তখন ভুরশুট বর্ধমান চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রামদাসের কাব্যের নাম অনাদি মঙ্গল, রচনাকাল ১৬৬২ খ্রীঃ। সহজ কবিত্ব, মার্জিত রুচি, চরিত্র স্মৃষ্টির দক্ষতা ইত্যাদি গুণে কাব্যটি বিশিষ্ট।

রামদাস আদক

সীতারাম দাস মল্লভূমিতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করলেও কবির পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রামে। কবির পিতার নাম—দেবীদাস, মাতার নাম—কেশবতী। গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর প্রত্যাদেশে তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

সীতারাম দাস

যাদুনাথ বা যাদবনাথ নামে এক কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। যাদুনাথ বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের উল্লেখ করেছেন—

যাদুনাথ

কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপ বিমোচনে।
চিরকাল রাজুতি করেন বর্ধমানে॥

কৃষ্ণরামের আমলে শোভা সিংহ বিদ্রোহী হয়েছিলেন। কৃষ্ণরাম আততায়ীর দ্বারা নিহত হন এবং মহীষী ও অন্তঃপুরিকাগণ বন্দী হন। এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাদুনাথ।

ভার্য্যাবন্দী হয়ে করোড়ি তাহার।
সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার॥

কৃষ্ণরাম নিহত হন ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। যাদুনাথ এই সময়ে কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন। সম্ভবতঃ যাদুনাথ মহারাজ কৃষ্ণরামের আশ্রিত ছিলেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বর্ধমান জেলায় দামোদর-

তীরবর্তী কইয়ড় পরগণার কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা—সীতা, পিতামহ—ধনঞ্জয়। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র ছিলেন কবির পৃষ্ঠপোষক। কাব্যমধ্যে কবি বহুবার কীর্তিচন্দ্রের প্রশংসা করেছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী

অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

ঘনরাম কাব্য শেষ করেছিলেন ১লা অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ। কবি হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী ও লাউসেনের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁর কাব্যকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দান করেছেন। সহজ কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের মিশ্রণ, পুরাণ-কথার সমাবেশ, চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা, সমাজ-জীবন ও পারিবারিক জীবনের বাস্তব বিবরণ, বীররস, করুণ রস ও কৌতুক রসের পরিবেশনে নৈপুণ্য, প্রসন্ন ভদ্র রুচি, শব্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবিদের মধ্যে নরসিংহ বসু, হৃদয়রাম সাউ ও রামকান্ত রায় বর্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। নরসিংহ বসুর পৈত্রিক নিবাস ছিল গোপভূমের অন্তর্গত বসুধা গ্রামে (আধুনিক বর্ধমান জেলার পানা-গড়ের নিকটে)। নরসিংহের পিতামহ মথুরা বসু বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সময়ে বর্ধমানের চার ক্রোশ দক্ষিণে শাঁখারি গ্রামে বাস করতেন। নরসিংহ মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে বীরভূমের রাজা আসফুল্লাহ খানের উকিল নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। নরসিংহের ধর্মমঙ্গল সহজ ভাষায় গ্রাম্যতা-দোষমুক্ত বৃহৎ কাব্য।

নরসিংহ বসু

১১৫৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হৃদয়রাম সাউ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বর্ধমান জেলার বনপাশ স্টেশনের নিকটবর্তী খুরুল গ্রামে কবি মাতৃপিতৃহীন অবস্থায় মাতুলালয়ে বাস করতেন। মাতুলদের সঙ্গে বিবাদের

হৃদয়রাম সাউ

ফলে তিনি বীরভূম জেলার নান্নুরের নিকটবর্তী উচ্চকরণ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি ধর্মরাজের বিগ্রহ স্থাপন করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। হৃদয়রাম ছিলেন জাতিতে শুঁড়ি। তাঁর পিতার নাম—গোবিন্দ, মাতা—মুকুতা। তাঁর কাব্যের ভাষা সংস্কৃত বহুল, গতি স্বচ্ছন্দ, মুকুন্দরামের প্রভাব আছে।

রামকান্ত রায় ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ১১৯৭ বঙ্গাব্দ বা ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

রামকান্ত রায়

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের জমিদারীতে দামোদর নদের অপর পাড়ে বর্ধমান শহরের দক্ষিণে সেহারা গ্রামে পুরুষানুক্রমে কবি বাস করতেন। তাঁর আত্মজীবনীটি বাস্তবরসাশ্রিত।

মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখার মধ্যে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন পরশুরাম রায়। পরশুরামের কাব্যের নাম মাধব সঙ্গীত। মানকরের দক্ষিণে

পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল

চম্পক নগরী (আধুনিক কসবা-চাঁপাই গ্রাম) পরশুরামের পুরুষানুক্রমিক বাসভূমি। কবির পিতার নাম মধুসূদন রায়। তিনি ১৬শ বা ১৭শ শতাব্দীতে কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

কবি শ্রীবল্লভ সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে (ভারতচন্দ্রের পূর্বে)

শ্রীবল্লভের শীতলামঙ্গল

শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। শ্রীবল্লভ কাব্যে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

পিতামহ পুরুষোত্তম জগতে ঈশ্বর নাম
শ্রীচৈতন্য তাহার কুমার
তস্য সুত শ্রী শ্যাম সকল গুণের ধাম
কতকাল হস্তিনানগরে॥
তস্য সুত শ্রীগোপাল মান্দারণে কতকাল
নিবাস করিল বৈদ্যপুরে
শ্রীবল্লভ তাহার সুত গোবিন্দ পদেতে রত
হরি বল পাপ গেল দূরে॥

কবির পিতা শ্রীগোপাল মান্দারণ থেকে বৈদ্যপুরে বাস করেছিলেন। হুগলী জেলায় মান্দারণ (বর্তমান মান্নাদ) থেকে অনতিদূরবর্তী বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তঃপাতী বর্ধিষ্ণু গ্রাম বৈদ্যপুর। শ্রীবল্লভের পিতা গোপালও শীতলামঙ্গল

কাব্য রচনা করেছিলেন। শ্রীবল্লভের ভাষা অনেক সময়েই অমার্জিত ও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট।

কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তীর শীতলামঙ্গল কাব্য রচিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ধমানের মহারাজ তিলকচন্দ্রের আশ্রয়ে।

কবি লিখেছেন—

অকিঞ্চন চক্রবর্তীর শীতলামঙ্গল

শ্রীধন্য ক্ষত্রিয় জাতি বর্ধমানে অধিপতি
শ্রীযুক্ত তিলকচন্দ্র রায়।
তদাশ্রয়ে করি বাস শীতলার ইতিহাস
চক্রবর্তী অকিঞ্চনে গায়॥

অকিঞ্চন চক্রবর্তী মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের আশ্রয়ে বা পৃষ্ঠপোষকতায় শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। তিলকচন্দ্র ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের জমিদার হিসাবে দিল্লীর বাদশাহের ফরমান লাভ করেন। তিলকচন্দ্রের উত্তরাধিকারী মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অভিভাবিকা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর কাছ থেকে স্বয়ং জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তেজশ্চন্দ্র পরলোক গমন করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং কবি ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পিতা-পুত্র দুই মহারাজের আমলে শীতলামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

সপ্তদশ শতকে রামকৃষ্ণ রায় শিবায়ন কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির নিবাস হাওড়া জেলার আমতায় হলেও বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জগন্নাথ ১০৯১ বঙ্গাব্দে (১৬৮৪ খ্রীঃ) বর্ধমান রাজের ভূ-সম্পত্তি দান গ্রহণ করেছিলেন। রামকৃষ্ণের অপর পুত্র মুকুন্দপ্রসাদ পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমান রাজসরকার থেকে ভূ-সম্পত্তি লাভ করেছিলেন ১১০০ বঙ্গাব্দে (১৬৯৩ খ্রীঃ)।

শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায়

মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দেওয়ান ও শ্যালক বাবু পরাণচাঁদ তেজশ্চন্দ্রের আদেশে অভিনব বৃহৎ ও সচিত্র হরিহরমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন ১২৩৭ বঙ্গাব্দে। কবি কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস জগন্নাথ মঙ্গল রচনা করেছিলেন।

পরাণচাঁদের হরিহরমঙ্গল

মধ্যযুগীয় অনুবাদ কাব্যে বর্ধমানের অবদান অসামান্য। প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে

কবি কৃত্তিবাসের সমসাময়িক কালে বর্ধমানের কবি মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করে বাঙ্গলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্বে মেমারির নিকটবর্তী কুলীন গ্রামে। কবির পিতার নাম—ভগীরথ, মাতা—ইন্দুমতী, জাতিতে কায়স্থ। তাঁর পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ বসু। শ্রীমদ্ ভাগবত অবলম্বনে অংশতঃ অনুবাদ-মূলক ও অংশতঃ স্বাধীনভাবে মালাধর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল ১৩৯৫ থেকে ১৪০২ শকাব্দের (১৪৭৩-৮০ খ্রীঃ) মধ্যে। কবি গৌড়েশ্বরের দ্বারা গুণরাজ খান উপাধিতে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। এই গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) বা সামসুদ্দিন ইউসুফ্ শাহ। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে মালাধর কৃষ্ণ কাহিনী রচনা করেছেন। উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রকাশিত হয় নি। মালাধর সহজ ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত প্রেমধর্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। সম্ভবতঃ উৎপীড়িত দুর্বল বাঙ্গালীর সম্মুখে মহাবীর কৃষ্ণের মূর্তিটিকে কবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ভক্তির উচ্ছ্বাস অপেক্ষা শান্ত রসাস্পদ সংযত ভক্তির প্রকাশ এই কাব্যে লক্ষণীয়। শ্রীচৈতন্য কাব্যটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং কুলীনগ্রাম ও কবির বংশধর রামানন্দ ও সত্য-রাজের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। "নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এই পংক্তিটি শ্রীচৈতন্যের মনোহরণ করেছিল। গুণরাজ খাঁ রচিত দানলীলা, নৌকালীলা ও ভারখণ্ডের পুঁথি পাওয়া গেছে। কবি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই গুণরাজ খাঁ মালাধর বসু কিনা বলা যায় না।

কবিশেখর উপাধিবিশিষ্ট দৈবকীনন্দন সিংহ ভাগবত অবলম্বনে গোপাল বিজয় কাব্য রচনা করেছিলেন। কবির পিতার নাম—চতুর্ভুজ, মাত—হারামতী। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে গোপাল বিজয় রচনার পূর্বে তিনি গোপাল চরিত মহাকাব্য, গোপালের কীর্তনামৃত ও গোপীনাথ বিজয় নাটক রচনা করেছিলেন।

কবিশেখরের গোপাল বিজয়

বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি রায়শেখর বা কবিশেখর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য

ছিলেন। গোপাল বিজয়ের কবি কবিশেখর ও পদাবলীর কবি কবিশেখর বা রায়শেখর একই ব্যক্তি কিনা, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব না হলেও কারো কারো মতে দুই শ্রেণীর রচনায় কবি অভিন্ন।

মহাভারতের অনুবাদক বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রাম নিবাসী কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ভাগবত অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্য রচনা করেছিলেন। গোপাল দাস নামে এক ব্রহ্মচারী কবিকে দীক্ষা দিয়ে কৃষ্ণকিঙ্কর নাম দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিলাসের ভণিতায় কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের নাম উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যে কবির উচ্চস্তরের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস

বাসুদেব ঘোষ কৃষ্ণলীলা কাব্য রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণলীলায় সুবল সংবাদ, ননী চুরি, মানভঞ্জন, ভানুপূজা, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, দূতীসংবাদ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। পুঁথি খণ্ডিত। কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব আছে। চৈতন্য-পার্ষদ ও গৌরলীলা বর্ণনার কবি বাসুদেব ঘোষ সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলারও কবি।

মধ্যযুগীয় অনুবাদ কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস। কাশীরাম দাসের ভ্রাতা গদাধর জগন্নাথ মঙ্গলে যে বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তদনুযায়ী ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী কমলাকান্ত দেবের তিন পুত্র শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর।

মহাভারতের কবি কাশীরাম দাস

কমলাকান্তের হৈল্যো এ তিন কোঙর।
প্রথমে সে কৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
দ্বিতীয় শ্রী কাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তৃতীয়ে কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎ মঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥

মহাভারতের কবি কশীরাম দাস

মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি এবং শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস বর্ধমান জেলার গৌরব। কাশীরামের নিবাস কাটোয়ার নিকটবর্তী সিঙ্গি গ্রাম অথবা অগ্রদ্বীপের নিকটবর্তী সিঙ্গিগ্রাম—এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও দুটি গ্রামই বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারত রচনা করেছিলেন কিনা, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ বর্তমান। কোন কোন পুঁথিতে কাশীরাম তিন পর্ব, কোথাও

চার পর্ব, কোথাও সাড়ে তিন পর্ব, কোন পুঁথিতে সমগ্র মহাভারত রচনার কথা বলা হয়েছে। একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়—

ধন্য ছিল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারতের করিল প্রকাশ ॥
আদি সভা বনের যে রচিল পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি ॥

অন্য এক পুঁথিতে আছে—

ধন্য ধন্য কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
চারিপর্ব ভারতের করিলা প্রকাশ ॥
আদি সভা বন বিরাট রচিয়া পাঁচালী।
যাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি ॥

অবার অন্যত্র আছে—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর
রচিয়া শ্রী কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥

পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরী মঙ্গল কাব্যে আছে—

অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব ভারত প্রকাশ ॥

কাশীরামের মহাভারত ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল বলে বিরাট পর্বের পুঁথিতে উল্লিখিত আছে। অপর একটি পুঁথিতে ১৬০২-৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাতেই কাশীরাম মহাভারত রচনা করেছিলেন। কাশীরাম বৈয়াসিক মহাভারত ও জৈমিনীর মহাভারত অবলম্বনে স্বাধীন ভাবে মহাভারত পাঁচালী রচনা করেছিলেন। মূল মহাভারতের অনেক আখ্যায়িকা বর্জন করে নূতন আখ্যায়িকা সংযোজিত করে কবি তাঁর কাব্যকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। কাশীরামের মহাভারত সম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "শিল্পাদর্শের বিচারে কাশীরাম দাস মধ্যযুগীয় অনুবাদ সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি বলিয়া উচিত মর্যাদা পাইবেন। একটু তৎসম শব্দসঙ্কুল হইলেও পরিমিত বাগ্‌বন্ধনের জন্য তাঁহার ভারত পাঁচালী কিঞ্চিৎ পরিমাণে মহাকাব্যের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনারীতিও বিশেষ প্রশংসনীয়।"[১]

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ৪৭৮

কাশীরামের পুত্র দ্বৈপায়ন দাস আশ্চর্য পর্ব, স্বর্গারোহণ পর্ব প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। তিনি নিজেকে কাশীরামের পুত্ররূপে উল্লেখ করেছেন—

দ্বৈপায়ন দাস

কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

স্বর্গারোহণ পর্বের শেষে ভণিতা—

দ্বৈপায়ন দাস বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পাণ্ডবের স্বর্গ আরোহণ॥

দ্বৈপায়ন পিতার রচনাকেই আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। আশ্চর্যপর্ব তাঁর স্বাধীন রচনা। দ্বৈপায়ন রচিত বনপর্ব ও গদাপর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে।

কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে পুত্র) নন্দরাম দাস স্বর্গারোহণ পর্ব, উদ্যোগ পর্ব এবং কর্ণ পর্ব রচনা করেছিলেন। উদ্যোগ পর্বের কোন কোন পুঁথিতে আছে যে মৃত্যুকালে কাশীরাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে মহাভারত রচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন।

নন্দরাম দাস

জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোককালে
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন॥

নন্দরাম স্বাধীনভাবেই রচনা করেছেন। কাশীরামের মহাভারতে দ্বৈপায়ন ও নন্দরামের কিছু কিছু রচনা প্রবেশ করেছে।

অনুবাদ কাব্যের অন্যতম প্রধান শাখা রামায়ণের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং আদি কবি ফুলিয়ার কৃত্তিবাস ওঝা। বর্ধমানের কবিরাও রামায়ণ রচনা থেকে বিরত ছিলেন না। বর্ধমানের রাণীগঞ্জের নিকটে দামোদরের দক্ষিণ তীরে ভুলুই গ্রাম নিবাসী জগদ্রাম রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সঙ্গে একত্রে রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্র রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। কবিদ্বয় বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ অবলম্বন করে আট কাণ্ডে বিভক্ত বিরাট আকারে রামায়ণ রচনা করেন। অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে পুষ্কর কাণ্ড রচিত হয়েছে। রামরাস বৈষ্ণব পদাবলীর

রামায়ণের কবি জগদ্রাম রায় ও রামপ্রসাদ রায়

প্রভাবে মৌলিক রচনা। রামচন্দ্র এখানে স্বয়ং ভগবান। বিচিত্রভাবে রাম-ভজনার কথাও এই কাব্যে পাওয়া যায়

বর্ধমান জেলার মাড়ো গ্রাম নিবাসী নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর অধস্তন দশম পুরুষ রঘুনন্দন গোস্বামী রামরসায়ন নামে ভক্তিরসাশ্রিত বিশাল কাব্য রচনা করেছিলেন। রামরসায়নে কবির মৌলিক সংযোজন প্রচুর। সুখপাঠ্য এই রামকথাশ্রিত কাব্য রচিত হয়েছিল ১২৩৮ বঙ্গাব্দে (১৮৩১খ্রীঃ)। এই কাব্য ছাড়াও রঘুনন্দন রচনা করেছিলেন কৃষ্ণলীলামূলক রাধামাধবোদয় কাব্য এবং গীতামালা নামে পদাবলী। তাঁর রচিত হস্তলিখিত পুঁথিতে ত্রিশ খানি সংস্কৃত গ্রন্থও পাওয়া গেছে।[১]

রামরসায়নের কবি রঘুনন্দন গোস্বামী

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত বা রামকৃষ্ণ বর্ধমানের হাঁসপুকুরের উত্তরে অম্বিকানগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নারদপুরাণ বা নারদ সংবাদ নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করেছিলেন।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শাখা বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ধমানের দান অসামান্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের জীবনীশাখা এবং পদাবলী শাখা,—উভয় শাখাতেই বর্ধমানের কবিগণ অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম চৈতন্য জীবনী লেখক, চৈতন্যলীলার ব্যাস নামে সম্মানিত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভজাত বৃন্দাবন দাস বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কাটোয়ার সাতক্রোশ দক্ষিণে খড়ি নদীর দক্ষিণ তটে দেনুড় গ্রামে বসবাস করতেন। নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন বৃন্দাবন দাসের গুরু। কথিত আছে, নিত্যানন্দ যখন সপার্ষদ নীলাচল যাচ্ছিলেন মহাপ্রভুকে দর্শনের উদ্দেশ্যে তখন বৃন্দাবনও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। পথে দেনুড় গ্রামে স্নানাহারের পর নিত্যানন্দের মুখশুদ্ধির জন্য পূর্বদিনের সঞ্চিত একটি হরিতকী নিত্যানন্দের হাতে দিয়েছেলেন। প্রিয় শিষ্যের সঞ্চয় প্রবৃত্তিতে বিরক্ত হয়ে নিত্যানন্দ শিষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁকে দেনুড় গ্রামে বসবাস করে মহাপ্রভুর সেবা ও লীলা বর্ণনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন গুরুর আদেশে দেনুড় গ্রামে বসবাস করে গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবা করে মহাপ্রভুর জীবন লীলা বর্ণনা করেন চৈতন্য মঙ্গল (চৈতন্য ভাগবত) রচনা করে। এই মহাগ্রন্থ রচিত হয় আঃ ১৫৪১-

চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস

১। রামরসায়নের ভূমিকা, বসুমতী সং

৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বৃন্দাবনের মৃত্যু হয়। প্রেমবিলাসের মতে বৃন্দাবনের পিতার নাম বৈকুণ্ঠ।

আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিনখণ্ডে ও ৫১টি অধ্যায়ে বিভক্ত চৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। বৃন্দাবনের দৃষ্টিতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও জীব উদ্ধারের উদ্দেশ্যে চৈতন্যরূপে কৃষ্ণের মর্তাবতার। ভাগবতের কৃষ্ণলীলার ছাঁদে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করলেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা এবং দুরন্ত বালক নিমাইএর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে পরিণতির বাস্তবতা সম্মত বিবরণ তিনি দিয়েছেন। মানুষ চৈতন্যের রূপ এত বাস্তবতার সঙ্গে আর কোন জীবনী কাব্যে পরিস্ফুট হয়নি। সহজ কবিত্ব এবং চৈতন্য ভক্তির প্রাবল্য বৃন্দাবনের কাব্যকে আস্বাদনীয় করে তুলেছে।

চৈতন্য জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যকার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটী গ্রামের কাছে ঝামটপুর গ্রামে। ভ্রাতার সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হন। বৃন্দাবনে তিনি রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব গোস্বামী—এই ষড়্‌গোস্বামীর কৃপা লাভ করেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবন অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বৃন্দাবনের কাব্যের অপূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করার জন্য গোস্বামীদের অনুরোধে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেছিলেন। প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনাতেই কৃষ্ণদাস অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য এবং ভক্তির সমন্বয়ে, দর্শন, জীবনী ও কবিত্বের সম্মিলনে কৃষ্ণদাসের রচনা অসাধারণ সৃষ্টিকর্মে পরিণত হয়েছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মতাদর্শ অনুযায়ী তিনি চৈতন্যলীলা ব্যাখ্যা করেছেন, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েও বৃন্দাবনে লীলারস আস্বাদনের জন্য রাধা ও কৃষ্ণরূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিলেন, সেই দুই আবার এক দেহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হয়েছেন,—এই তত্ত্বের আলোকে চৈতন্যজীবনীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আঃ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাগ্রন্থ

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত

রচিত হয়। মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণ করে গান করার উদ্দেশ্যে চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস বর্ধমান জেলার কোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কাব্যে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল

চারিখণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরা গুণগাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে
ধন্য মাতামহী সে অভয়দাসী নামে।
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থপূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥

লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা অপেক্ষা কবিত্বই বেশী। লোচন ছিলেন কবি—বৈষ্ণব পদকর্তা। লোচন, লোচন দাস, ত্রিলোচন ও সুলোচন ভণিতায় ৭১টি পদ পাওয়া গেছে। গুরু নরহরি সরকার প্রবর্তিত নদীয়া নাগরভাব বা গৌরনাগরভাবকে লোচন ব্যাখ্যা করেছেন চৈতন্যলীলা বর্ণনায়।

চৈতন্যমঙ্গলের অপর কবি জয়ানন্দের নিবাস ছিল বর্ধমানের সন্নিকটে আমাইপুরা গ্রামে (বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া থানার অন্তর্গত বাড়োয়া গ্রামের কাছে)। তাঁর পিতা ছিলেন চৈতন্যভক্ত—সুবুদ্ধিমিশ্র, মাতা—রোদনী। শ্রীচৈতন্য পুরী থেকে গৌড় যাত্রার সময়ে (সম্ভবতঃ গৌড় থেকে পুরীতে প্রত্যাবর্তনকালে) সুবুদ্ধিমিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভু শিশুর গুহিয়া নাম পরিবর্তন করে জয়ানন্দ রেখেছিলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে যে সুবুদ্ধিমিশ্র গোসাঞির পূর্বশিষ্য
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম॥
তাহার নন্দন গুআ জয়ানন্দ নাম থুঞা
রোদনী রাখিল তারে লঞা।

জয়ানন্দের কাব্যে চৈতন্যপূর্ব ও চৈতন্য-সমসাময়িককালের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার বাস্তব বিবরণ আছে। কিন্তু কতকগুলি অভিনব ও অবিশ্বাস্য তথ্যের সন্নিবেশ হেতু কাব্যটি প্রামাণ্য জীবনী হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি।

গোবিন্দ দাসের কড়চা নামে পরিচিত বহুবিতর্কিত কাব্যখানির রচয়িতা গোবিন্দদাস কর্মকার বর্ধমান জেলার কাঞ্চন নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি গার্হস্থ্যধর্মে বিতৃষ্ণ হয়ে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের ভৃত্যত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও তিনি ভৃত্যরূপে পুরীতে ছিলেন এবং মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণের সঙ্গী হয়েছিলেন বলে কড়চায় উল্লেখ আছে। গোবিন্দের কড়চায় মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিবরণ আছে। কিন্তু ভাষার আধুনিকতা, ভৌগলিক বিবরণে অসঙ্গতি প্রভৃতি কারণে গ্রন্থটিকে খাঁটি বলে অনেকেই স্বীকার করেন না।

গোবিন্দদাস কর্মকারের কড়চা

জীবনী কাব্যের মত পদাবলী সাহিত্যে বর্ধমান বিপুল অবদান রেখেছে। গৌরাঙ্গলীলা গানের প্রথম কবি হিসাবে সম্মানিত নরহরি সরকার চৈতন্যদেবের জন্মের চার পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা—নর-নারায়ণদেব সরকার, মাতা—গোয়ী দেবী, অগ্রজ মুকুন্দ ও ভ্রাতুষ্পুত্র বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন। মুকুন্দ ছিলেন গৌড়ের সুলতানদের চিকিৎসক। নরহরি ছিলেন কবি লোচন দাসের গুরু, নদীয়া নগরভাবের প্রবর্তক ও গৌরাঙ্গ গদাধর পূজার প্রবর্তক। গৌরাঙ্গলীলা তিনি প্রথম রচনা করেন। বাসুদেব ঘোষ তাঁরই পদাংক অনুসরণ করেছিলেন। গৌরপদ তরঙ্গিণীতে নরহরির ভণিতায় একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। নরহরির ভণিতায় ৩৮২টি পদ সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীখণ্ডে নরহরি ও রঘুনন্দনকে কেন্দ্র করে একটি বৈষ্ণব গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছিল এবং শ্রীখণ্ডকে বৈষ্ণব সমাজের তথা বাঙ্গালা সাহিত্যের মহাতীর্থে পরিণত করেছিল।

নরহরি সরকার

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ—তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা সহচর ছিলেন। কৌমার্যব্রতধারী তিন ভ্রাতা সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলবাসী হয়েছিলেন। এঁদের পিতার নাম বল্লভ ঘোষ। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে এঁদের বঙ্গদেশে পাঠিয়েছিলেন। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে

গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবা করতেন। মাধব দাঁইহাটে বাস করেছিলেন। বাসুদেব শেষজীবনে তমলুকে বাস করেছিলেন। তিন ভ্রাতাই কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। মাধব কীর্তনীয়া হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহজ আন্তরিকতায় গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। মাধব বঙ্গভাষায় চৈতন্যবিষয়ক পদ এবং ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। বাসুদেব অনেকগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর নিমাই সন্ন্যাসের পদগুলি প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়।

গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ

কুলীনগ্রাম নিবাসী কবি মালাধর বসুর পৌত্র (মতান্তরে পুত্র) রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর ভক্ত পার্ষদ ছিলেন। রামানন্দ ছিলেন কবি। পদকল্পতরুতে রামানন্দের ভণিতায় ১১টি এবং রামানন্দ বসুর ভণিতায় ৭টি পদ সংকলিত হয়েছে। রামানন্দের সাতটি পদের মধ্যে চারটি কৃষ্ণলীলার, দুটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও একটি নিত্যানন্দ বিষয়ক। রামানন্দের ভণিতায় ১১টি পদের রচয়িতা রামানন্দ বসু কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

রামানন্দ বসু

চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা দ্বিতীয় বিদ্যাপতি অভিধায় সম্মানিত গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫৩৭—১৬১৫ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন মাতামহালয়ে শ্রীখণ্ডে। গোবিন্দদাসের পিতা হোসেন শাহ্ বা তৎপুত্র নসরত সাহের অমাত্য চৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেন, মাতা—সুনন্দা, মাতামহ—শ্রীখণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি সঙ্গীত দামোদর প্রণেতা দামোদর সেন। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় গোবিন্দদাস শ্রীখণ্ডে বাস করেছিলেন, পরে তিনি কুমার নগরে ও শেষে তেলিয়া বুধুরিতে বাস করেছিলেন। তিনি প্রথমে ছিলেন শাক্ত, পরে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি প্রায় ৮০০ বৈষ্ণব পদ, সঙ্গীত মাধব নাটক এবং রামবন্দনার পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ তাঁকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদ তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। অষ্টকালীয় লীলাবর্ণন বা একান্নপদ নামে একটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাস কবিরাজ

ব্রজবুলি ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী, অভিসারের পদের এবং রসোদ্গারের পদেরও তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। ভাবের গভীরতায় এবং বিদ্যাপতির অনুসরণে প্রসাধন কলার পারিপাট্যে, চিত্রকল্প নির্মাণে, তৎসম ও ব্রজবুলি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগে, তৎসম ও ব্রজবুলি শব্দের সার্থক বিন্যাসে, শব্দের ঝংকার সৃষ্টিতে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে গোবিন্দদাসের পদাবলী বৈষ্ণব সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করে আছে।

গোবিন্দদাসের অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ ও মাতামহালয়ে শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিও ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। স্বরচিত

রামচন্দ্র কবিরাজ

স্মরদর্পণ গ্রন্থে তাঁর রচিত ১৭টি পদ সংকলিত হয়েছে। পদকল্পতলিকাতেও তাঁর রচিত পদ আছে। শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন রচিত, স্মরদর্পণ, সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা, দুর্লভামৃত, পদ্মমালা প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁর রচনা।

গোবিন্দ দাসের পুত্র দিব্যসিংহ ও একজন পদকর্তা ছিলেন। দিব্য সিংহের

দিব্যসিংহ

জন্ম শ্রীখণ্ডে। তাঁর মাতার নাম মহামায়া। তিনিও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর একটি মাত্র পদ পাওয়া গেছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক যদুনন্দনের সংবাদ পাওয়া যায়। গদাধর দাসের শিষ্য নিত্যানন্দ পার্ষদ যদুনন্দন চক্রবর্তী ছিলেন কাটোয়া নিবাসী। নরোত্তম

যদুনন্দন চক্রবর্তী

দাস ঠাকুর আয়োজিত খেতরীর মহোৎসবে যদুনন্দন সম্মানিত হয়েছিলেন। পদকল্পতরুতে যদু ভণিতায় ১৪টি, যদুনন্দন ভণিতায় ৭১টি এবং যদুনাথ ভণিতায় ১৬টি,—মোট ১০১টি পদ সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে যদুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা কোন পদগুলি তা নির্ণয় করা কঠিন। যে পদে গদাধরের উল্লেখ আছে সে পদগুলি যদুনন্দন চক্রবর্তীর রচনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। গৌরগদাধর বন্দনামূলক পদটিও এই যদুনন্দনের রচনা বলে গৃহীত হয়েছে।

কাটোয়ার নিকটবর্তী মালিহাটি গ্রাম নিবাসী বৈদ্য-বংশীয় প্রসিদ্ধ পদকর্তা যদুনন্দন দাস। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য, কর্ণানন্দ অনুসারে

শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। ইনি কাটোয়ায় প্রথম বৈষ্ণব সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ইনি অনেকগুলি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা থেকে বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থ : কর্ণানন্দ, সারঙ্গ রঙ্গদা, গোবিন্দ বিলাস, রস কদম্ব, কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদগ্ধমাধব, দানলীলাচন্দ্রামৃত, হরিভক্তি চন্দ্রিকা ও মনঃশিক্ষা।

যদুনাথ দাস

কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রাম নিবাসী যদুনাথ বা যদুনন্দন হেমলতা দেবীর শিষ্য ছিলেন এবং পদকর্তাও ছিলেন। তাঁর রচনা সংগ্রহ-তোষিণী নামক গ্রন্থ। এই যদুনন্দন ও যদুনন্দন দাস অভিন্ন হওয়াও অসম্ভব নয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বলরাম দাসের অস্তিত্ব পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন। একজন বলরাম দাস বাস করতেন বর্ধমান জেলার পূর্বে দোগাছিয়া (দোগেছে) গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সত্যভানু উপাধ্যায়। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই তিনি পদ রচনা করেছেন। তুলনামূলক ভাবে তাঁর বাঙ্গালা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ সম্পর্কিত পদগুলির আন্তরিকতা অন্তর স্পর্শ করে। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের পদে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাৎসল্যরসের পদগুলি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

বলরাম দাস

বলরাম দাস নামে আর এক বৈষ্ণব কবি ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। ইনি ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। জাহ্নবা দেবী তাঁর নাম পরিবর্তন করে নিত্যানন্দ দাস রেখেছিলেন। বলরাম খেতরীর মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস।
অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস।

প্রেমবিলাস, গৌরাঙ্গাষ্টক, বীরচন্দ্র চরিত, রসকল্পসার, কৃষ্ণলীলামৃত, হাটবন্দনা ও কুঞ্জভঙ্গের একুশটি পদ বলরাম দাসের রচনা। শ্রীখণ্ড নিবাসী আত্মারাম দাসও একজন পদকর্তা ছিলেন।

অম্বিকা কালনা নিবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা কৃষ্ণদাসও বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। কুলীন গ্রাম নিবাসী অম্বষ্ঠজাতীয় কবি শিবানন্দ সেন গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। জাহ্নবা দেবীর শিষ্য বৈদ্য-জাতীয়া কাউ গ্রামের পরমেশ্বরী দাস বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন।

অন্যান্য পদকর্তা

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র এবং দিব্য সিংহের পুত্র ঘনশ্যাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদাবলী রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। পদ রচনায় তিনি পিতামহ গোবিন্দ দাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে রচিত। পদকল্পতরু, পদরত্নাকর, পদরসসার প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে ঘনশ্যাম দাসের ৬০টি পদ পাওয়া গেছে। গোবিন্দ রতিমঞ্জরী নামে তিনি অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ঘনশ্যাম দাস

গোপাল দাস বা রামগোপাল দাস শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রঘুনন্দনের শিষ্য রতিপতি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রসকল্প-বল্লী নামক সংকলন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এই সংকলনে রামগোপাল দাসের ভণিতায় ছয়টি ব্রজবুলি ভাষার পদ আছে। কবির পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরী নামে বৈষ্ণবতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করেন। এই গ্রন্থেও রামগোপাল দাসের পদ সংকলিত হয়েছে।

রামগোপাল দাস

পীতাম্বর দাস

শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কবিবল্লভ নামে এক কবি রস-কদম্ব নামে একটি বৈষ্ণব রসতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের সঙ্গে একত্রে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত বিখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানদাস কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক ব্রাহ্মণ বংশে। তিনি ছিলেন জাহ্নবা দেবীর মন্ত্র শিষ্য এবং নিত্যানন্দ ভক্ত। খেতরির উৎসবে তিনি যোগদান করেছিলেন। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করলেও তাঁর বাঙ্গালা পদেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। পদাবলী রচনায় তিনি চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য। আক্ষেপানুরাগের পদে জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাসের ১৮৬টি পদ সংকলিত হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে জ্ঞানদাসের রচিত পদের সংখ্যা প্রায় চারশ।

জ্ঞানদাস

পদকল্পতরুতে জগৎ ও জগদানন্দের ভণিতায় সাতটিপদ সংকলিত হয়েছে।

জগদানন্দ

শ্রীখণ্ডের চৈতন্যভক্ত বৈদ্য মুকুন্দের বংশে জগদানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ড ত্যাগ করে আগড়ডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেছিলেন। জগদানন্দ বীরভূম জেলায় দুবরাজপুর থানার জোফলাই গ্রামে বাস করেছিলেন। জগদানন্দ পদাবলী ছাড়াও গীতগোবিন্দের অনুবাদ এবং ভাষাশব্দার্ণব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা রায় শেখর বর্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। রায় শেখর গোবিন্দ দাস কবিরাজের আদর্শে ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করে ছিলেন। সরল বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বিবৃতিমূলক পদ এবং লোচন দাসের ধামালির অনুসরণে হাল্কা ধরনের পদও রায় শেখর রচনা করেছিলেন। রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

রায় শেখর

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সমাজের নেতা রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ রচনা করেছিলেন। "তিনি ছোট বিদ্যাপতি নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর—দুই ভ্রাতা পদকর্তা হিসাবে প্রসিদ্ধ। এঁদের নিবাস ছিল কাঁদড়া। দুই ভ্রাতা একত্রে ৬৪ প্রকার বৈশিষ্ট্য সহ ৬৪টি পদের সংকলন গ্রন্থ 'নায়িকা রত্নমালা' রচনা করেন। এই গ্রন্থে চন্দ্রশেখরের ৫৪টি পদ এবং শশিশেখরের ১৪টি পদ সংকলিত হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য সংকলন গ্রন্থে এঁদের কিছু পদ স্থান লাভ করেছে। এঁরা অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি।

কবিরঞ্জন, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর

কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাদাসের পুত্র প্রেমদাসের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত কুলনগর গ্রামে। তাঁর প্রকৃত নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। কবির বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ষোল বৎসর বয়সে প্রেমদাস বৈরাগ্যবশতঃ গৃহত্যাগ করে মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করেন। তিনি বৃন্দাবনে গোবিন্দ জীউর মন্দিরে পাচক বা পূজারী ছিলেন। কবিকর্ণপূরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বনে প্রেমদাস চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী নামে একটি আখ্যান

প্রেমদাস

কাব্য রচনা করেছিলেন ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অপর গ্রন্থ বংশীশিক্ষায় চৈতন্যতত্ত্ব ও চৈতন্য জীবনকথা আলোচিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের প্রতিবেশী এবং ভক্ত বংশীবদন চট্টো একজন পদকর্তা ছিলেন। বংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টো পাটুলী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যের আদেশে তিনি নবদ্বীপবাসী হন। মহাপ্রভু বংশীবদনকে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের পরে

বংশীবদন চট্টো

বংশীবদন বাঘনা পাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য গৌরাঙ্গ বিগ্রহ নির্মাণ করান। বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস, চৈতন্যদাসের পুত্র জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ও পালিত পুত্র রামচন্দ্র বা রামাই এবং শচীনন্দন বাঘনা পাড়াকে বৈষ্ণব কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। চৈতন্যলীলা ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বংশীবদন রচিত অনেকগুলি পদ বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পদকল্পতরুতে বংশীবদনের ভণিতায় ২৫টি, বংশীদাস ভণিতায় ৮টি ও বংশী ভণিতায় ৯টি পদ সংকলিত হয়েছে।

বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামীর শিষ্য অকিঞ্চন দাস পাঁচটি বিলাসে

অকিঞ্চন দাস

সম্পূর্ণ বিবর্ত বিলাস নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই গ্রন্থে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতবাদ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য, রূপ, সনাতন প্রভৃতি সকল বৈষ্ণব সাধক ভক্তদের সহজিয়া প্রতিপন্ন করেছেন অকিঞ্চন দাস। অকিঞ্চন দাসের অন্যান্য রচনা: শ্রীচৈতন্যভক্তিরসাত্মিকা, শ্রীচৈতন্যভক্তিবিলাস, ভক্তিরস-

বসন্ত রায়

চন্দ্রিকা প্রভৃতি। তৎকালীন বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার ভবানন্দ মজুমদারের পুত্র বসন্ত রায় (১৪৩৩-৮১) বহু বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া বসন্তকুমার কাব্য, ধর্মসঙ্গীত ও বসন্তে সুকুমার কাব্য তাঁর রচনা।

কবিরঞ্জন বৈষ্ণব পদাবলীর একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ছিলেন জাতিতে

কবিরঞ্জন

বৈদ্য এবং শ্রীখণ্ডের অধিবাসী এবং রঘুনন্দনের শিষ্য। তিনি ছোট বিদ্যাপতি নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনায় তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়।

শক্তিমান কবি বৈষ্ণব পদকর্তা ও বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলক দীনবন্ধু দাস

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শিষ্য। তিনি ১৮শ শতাব্দীর কবি। তাঁর পিতার নাম বল্লবীকান্ত। তিনি সংকীর্তনামৃত নামে একটি পদাবলী সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থে ৪০ জন পদকর্তার পদ সংকলিত হয়েছে। কবির স্বরচিত ২০৭টি পদও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

গদাধর দাস

খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে গদাধর দাস দশম চরিত নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। এই কাব্যের মাত্র রাস পঞ্চাধ্যায় অংশের পুঁথি পাওয়া গেছে।

জয়গোবিন্দ দাস

জয়গোবিন্দ দাস (১৮০৮–৬৮) সনাতন গোস্বামী রচিত বৃহৎ ভাগবতামৃতের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামের নিকটবর্তী বেনাপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম গোকুল চন্দ্র বসু।

কমলাকান্ত দাস

খ্রীঃ ১৯শ শতাব্দীতে কমলাকান্ত দাস বৈষ্ণব একজন বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন। কমলাকান্তের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার শিউড় গ্রাম। তাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর দাস। কবি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ। তিনি পদরত্নাকর নামে একটি বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে কবির স্বরচিত ২০টি পদ সংকলিত হয়েছে। ব্রজবুলি এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই পদ রচনায় কবির দক্ষতা প্রকাশিত।

ব্রজনাথ দত্ত

ব্রজনাথ দত্ত (১২৫৫—১৩০৮ বঙ্গাব্দ) ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এবং বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের লেখক। ব্রজনাথের জন্ম হয় মন্তেশ্বরের নিকটবর্তী কাইগ্রামে। তাঁর পিতার নাম রাধামোহন দত্ত। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে বাস করেছিলেন। ব্রজনাথের প্রকাশিত গ্রন্থ: ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোঁসাই-এর লীলা, ভক্তি ও ভক্ত, ভাবামৃত।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী

হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-সংস্কৃতির মিশ্র দেবতা সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পূজা লাভ করেছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু কবি সত্যনারায়ণের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবি রায়

গুণাকর ভারতচন্দ্র সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। এছাড়াও বর্ধমান জেলার বহু কবি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়, যেমন—সাহাবাদ পরগণার ভাকুতা গ্রাম (মন্তেশ্বরের নিকট) নিবাসী দ্বিজ গিরিধর (রচনাকাল ১০৭০ বঙ্গাব্দ), পাটুলির নিকটবর্তী নারায়ণপুর নিবাসী মৌজিরাম ঘোষাল, ধাত্রী গ্রামের কৃষ্ণকান্ত, সাতসইকা পরগণার সাহাপুর নিবাসী রামশঙ্কর সেন, দেবগ্রাম নিবাসী দ্বিজ কৃপারাম, নাসীগ্রাম নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম, নারায়ণপুরের গুণনিধি চক্রবর্তী, কালনা থানার অন্তর্গত মীরহাট বৈদ্যপুর নিবাসী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষীরগ্রাম নিবাসী রামকিশোর ভট্টাচার্য (রচনাকাল ১৭৩২ খ্রীঃ), এড়ুয়ার নিবাসী রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী (পুঁথির লিপিকাল ১১১৮ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের মত সংখ্যায় বিপুল না হলেও শাক্ত পদাবলীর কবির সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়। শাক্তপদাবলীর আদি কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত শাক্তপদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম মহেশ্বর, মাতা—মহামায়া। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কমলাকান্ত বর্ধমান জেলার খানা জংসনের নিকটবর্তী চান্না গ্রামে মাতার সঙ্গে মাতুল নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্যের গৃহে বসবাস করতে থাকেন। ১২১৬ বঙ্গাব্দে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্তকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন এবং রাজ-সভা-পণ্ডিতের পদে বরণ করেন। তিনি পুত্র কুমার প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষা ও দীক্ষার ভার কমলাকান্তের উপরে অর্পণ করেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানের নিকটে কোটালহাটে কমলাকান্তের জন্য গৃহ নির্মাণ করিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে, এখানেই পঞ্চবটীতে কমলাকান্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। দেওয়ান রঘুনাথ রায় ও কুমার প্রতাপ চাঁদ তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। কমলাকান্ত সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ছিলেন, পরে শক্তি-উপাসক হন। কমলাকান্ত প্রথমে সাধকরঞ্জন নামে ছন্দে তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরে তিনি বহুসংখ্যক আগমনী বিজয়ার গান রচনা করেছিলেন।

শাক্তপদাবলীর কবি
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর ১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খ্রীঃ) শ্যামাসঙ্গীত নামে কমলাকান্তের যাবতীয় সঙ্গীত প্রকাশ করেন। কমলাকান্তের উমা সঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীতে ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সঙ্গে শিল্পীর প্রসাধন কলা সমন্বিত হয়েছে।

বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামের অধিবাসী ব্রজকিশোর রায় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। ব্রজকিশোরের পুত্র রঘুনাথ চুপি গ্রামে ১১৫৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি বর্ধমান রাজ বাড়ীতে দেওয়ানি করতে থাকেন। বর্ধমানে পিতার কাছ থেকে রঘুনাথ সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ থেকে ওস্তাদ এনে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রজকিশোর ও তাঁর দুই পুত্র—নন্দকিশোর ও রঘুনাথ তিনজনেই কবি ছিলেন। রঘুনাথ সাধক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বহু ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন। কালী ও কৃষ্ণ বিষয়ক বহু গান তিনি রচনা করেছিলেন। ১২৪৩ সালের ১১ই ভাদ্র রঘুনাথ পরলোক গমন করেন। রঘুনাথের শক্তিগীতিগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তিনি অকিঞ্চন ছদ্মনামে গান লিখতেন এবং দেওয়ান মহাশয় নামে পরিচিত ছিলেন।

ব্রজকিশোর, রঘুনাথ ও নন্দকিশোর

বর্ধমানের রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে এঁদের দান অপরিসীম। কবি-সাহিত্যিকরা চিরদিনই এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের দত্তকপুত্র মহারাজ মহতাব চাঁদ স্বয়ং কবি ও গীতিকার ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল ইনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেছিলেন। ইনি বহু শক্তিগীতি রচনা করেছিলেন। মহারাজ মহতাব চাঁদের একটি মহৎ কীর্তি মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে বিতরণ। তিনি বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করে মহাভারতের অনুবাদ কার্য আরম্ভ করেছিলেন ১২৬৫ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর ১২৯১ সালে ২৭শে মে অনুবাদ শেষ হয়। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব (জন্ম ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) বিজয় গীতিকা নামে দুই খণ্ড সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শক্তি গীতিরচয়িতা কবি রামানন্দ মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ মহতাব চাঁদ

ভারতচন্দ্রের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথম ভাগে কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশে কোন উল্লেখযোগ্য কবি বা সাহিত্য সাধকের আবির্ভাব ঘটে নি। এই সময়ে কবি গান, পাঁচালী গান, যাত্রা গান ইত্যাদির প্রচলন ও জনপ্রিয়তা ছিল ব্যাপক। কবি গান, পাঁচালী গান ও যাত্রাগানের জগতে বর্ধমানের অবদান নগন্য ছিল না।

পাঁচালী ও যাত্রা গান

কবিওয়ালাদের মধ্যে ভবানী বেনে, নিতাই বৈরাগী ও অক্ষয়া বাইতিনী; পাঁচালী গানে দাশরথি রায় ও কৃষ্ণধন দে; গীতাভিনয় যাত্রায় মতিলাল রায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ ঘোষ; কৃষ্ণ যাত্রায় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বর্ধমানের গৌরব বর্ধন করেছেন। মতিলাল রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি গীতাভিনয় রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এঁদের কথা পরবর্তী একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

পুরাতন ধারার অনুবর্তনে আরও কিছু কাব্য রচিত হয়েছিল। ক্ষীরগ্রামের রায়কিশোর ভট্টাচার্যের পুত্র বাঞ্ছারাম বিদ্যারত্ন ক্ষীরগ্রামের প্রসিদ্ধ দেবী যোগাদ্যার মহিমা বর্ণনা করে লিখেছিলেন যোগাদ্যা বন্দনা।

পুরাতন ধারায় বিবিধ রচনা

অম্বিকা কালনার হাঁসপুকুর পল্লীতে বসবাসকারী তারাচাঁদের পুত্র কৃষ্ণদাস নারদপুরাণ রচনা করেছিলেন ১০৯৯ বঙ্গাব্দে। অম্বিকা কালনার প্রাণবল্লভ ঘোষ মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতা ব্রজকিশোরীর নির্দেশে উনিশ পালায় বিভক্ত জাহ্নবী মঙ্গল রচনা করেছিলেন। পূর্বস্থলীর অধিবাসী কৃষ্ণমোহন রচনা করেছিলেন আগম চন্দ্রিকা ও কমলোদয়।

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতেও প্রচুর শক্তিগীতি রচিত হয়েছে। এই সময়ে বর্ধমান জেলার শক্তিগীতি রচয়িতার সংখ্যাও স্বল্প নয়। প্রসিদ্ধ শক্তিগীতি রচয়িতা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দেবীপুর রেলওয়ে স্টেশনের সংলগ্ন আলিপুর গ্রামে ১২১২-১৩ বঙ্গাব্দে ৺শ্যামাপূজার রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করেন।

শাক্ত কবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

মেধাবী ছাত্র নীলাম্বর বাল্যকালে গঙ্গাধর ঠাকুরের পাঠশালায় ও উপনয়নের পরে এগারো বৎসর বয়সে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অধ্যয়নের পরে দেবীপুরের হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশের নিকট ন্যায় ও সাংখ্য দর্শন অধ্যয়নকালে প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখে সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন। অকৃতদার নীলাম্বর দেবীপুর স্টেশনের নিকটে স্বপ্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে ও পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধন ভজনে নিরত হন। তিনি

প্রায় চারশ' শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। "তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল্" ইত্যাদি গানটি খুবই জনপ্রিয়।

নীলাম্বরের সহাধ্যায়ী দেবীপুর নিবাসী দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কবি ছিলেন এবং নীলাম্বরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি নীলাম্বরের গানের উত্তরে পাল্টা জবাবী গান লিখতেন। নীলাম্বরের উক্ত গানের জবাবে দ্বারকানাথ লিখেছিলেন, "সংসার সুখদ, নহে হে গারদ, নীল নীরদ, জেন এটা মনে।" নীলাম্বরকে রামপ্রসাদ এবং দ্বারকানাথকে আজু গোঁসাই-এর সঙ্গে সেকালে তুলনা করা হোত।

দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমানের মাজিদা গ্রাম নিবাসী রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য ছিলেন কবি ও প্রবন্ধকার। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। এঁর প্রকাশিত কাব্যের নাম রসিক রঞ্জন।

অন্যান্য শক্তিগীতি রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত পাঁচালীকার দাশরথি রায় এবং প্রখ্যাত কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। দাশরথির গানে শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ গীতাভিনয় যাত্রাকার মতিলাল রায়ও প্রচুর শক্তিগীতি রচনা করেছিলেন। কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী মির্জা (আঃ ১৭৫০—১৮২০) হুগলী জেলার গুপ্তি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করলেও বর্ধমানের মহারাজকুমার প্রতাপ চাঁদের সভাগায়ক ছিলেন। ইনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীত গ্রন্থের নাম: গীতলহরী। বর্ধমান ত্যাগ করার পরও প্রতাপচাঁদ কালী মির্জাকে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি দিতেন।

অন্যান্য শক্তিগীতি রচয়িতা

অম্বিকা-কালনা নিবাসী অন্ধ গায়ক চণ্ডী অনেক গান রচনা করেছিলেন। ইনি স্বরচিত গান গেয়ে ভিক্ষা করতেন। ইনি কানা চণ্ডী নামে পরিচিত ছিলেন।

বর্ধমান জেলার নান্দাল গ্রামে নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী ১২০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। ১২৭৩ সালে এঁর মৃত্যু হয়।

চিরঞ্জীব শর্মা বা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল চক্‌ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ইনি সুকণ্ঠ গায়ক ও সুকবি ছিলেন। ইনি অনেকগুলি ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন।

মহারাজা প্রতাপচাঁদের গায়কদের মধ্যে ধীরাজ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহারাজ প্রদত্ত ধীরাজ উপাধিতেই তিনি পরিচিত। ধীরাজও একজন কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কতকগুলি গান এখনও পাওয়া যায়।

প্যারীমোহন কবিরত্ন ১২৪১ সালের ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার বর্ধমান জেলার সাহাসুই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়াও তিনি ইংরাজীতে পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁর পারঙ্গমতা ছিল। তিনি প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। মহারাজ প্রতাপচাঁদ প্যারীমোহনকে কবিরত্ন উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। ১২৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বর্ধমান জেলার উখরা গ্রামের জমিদার পুলিনবিহারী লাল হাণ্ডে 'পুলীন-গীতি' নামে প্রকাণ্ড সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চকদীঘির জমিদার ললিত মোহন সিংহরায় ভক্তিপুষ্প নামে একটি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। মেড়তলা গ্রামনিবাসী 'তন্ত্ররত্ন' উপাধিযুক্ত নৃসিংহ দাস ভট্টাচার্য 'সঙ্গীত সপর্য্যা' নামক সঙ্গীত গ্রন্থের রচয়িতা। বর্ধমান জেলার অধিবাসী কৃষ্ণধন বিদ্যাপতি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ এবং গীতিকার। কাটোয়া নিবাসী রাধামোহন চট্টরাজও একজন গীতিকার ছিলেন। রামদয়াল ভক্তিরত্ন সংকলিত (১২৯৮) 'সংকীর্তন তরণী'তে রাধামোহনের "স্মর বৃন্দাবনে চেতো, গোপিকা মন-মোহন" গানটি উদ্ধৃত হয়েছে। কাটোয়া-নিবাসী বেণীমাধব একজন সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন। এঁর রচিত 'রাধা মদনমোহন বিহরে শ্রীবৃন্দাবনে' গানটি 'সংকীর্তন তরণী'তে উদ্ধৃত হয়েছে। গীতিকার প্রমথনাথ কাটোয়া নিবাসী ছিলেন। এঁর রচিত "কে জানে মহিমা তব হরমনমোহিনী", "অভাগিনী রাধা কি লো দাসীত্বে হ'ল অন্তর", এবং "মন সদা কর হরিনাম সংকীর্তন" গান তিনটি উক্ত সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে। দাঁইহাট নিবাসী শ্রীরাম সেন কতকগুলি গান রচনা করে-ছিলেন। সংকীর্তন তরণীতে "হরি রক্ষ যে দিনে", "হরি হরি বল মন! কি জানি কখন, কি হয় ঘটন" গান দুটি উদ্ধৃত হয়েছে।

বর্ধমানের কলসা গ্রামবাসী কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ও গান লিখতেন। এঁর রচিত "এ আবার কি বেশ, মন্মথ মনেশ নব চোরাবেশ কই বংশীধারী" গানটি সঙ্গীত সার সংগ্রহের পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে।

কালনা মহকুমার অন্তর্গত উপলতি গ্রাম নিবাসী ডাঃ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

(১২৯০—১৩৬৩) অনেকগুলি শাক্ত সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত ত্রিশটি শক্তি-গীতি 'গীতিমালা' নামে প্রকাশিত হয়।

কালনার নিকটবর্তী সিঙ্গারকোন গ্রাম নিবাসী শিবনাথ ব্রহ্মচারী (প্রকৃত নাম : শিবানন্দ স্বর্ণকার) অনেকগুলি ভক্তিগীতি রচনা করেছেন। শিবানন্দের জন্ম ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর রচিত ১৩৮টি গান 'অনুরাগ সঙ্গীত' নামে ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলনের অধিকাংশই শাক্ত সঙ্গীত।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দকে বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা কাল হিসাবে গণ্য করা হয়। এই যুগে গদ্যের ব্যাপক চর্চা, গদ্যে পদ্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব এবং দেবদেবীর অলৌকিক কাহিনীর পরিবর্তে মানবতার জয়গান সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালাকাব্যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৬—১৮৮৭) কাব্যে। রঙ্গলালের জন্মস্থান কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল কালনার সন্নিকটে রামেশ্বরপুর গ্রামে। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন পর্যায়ক্রমে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, নদীয়ার ইনকাম ট্যাক্স এসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর, উড়িষ্যার বালেশ্বরে স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর এবং কটকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডেপুটি কালেক্টর। কবি ইংরাজী, সংস্কৃত ও উড়িয়া সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূচনা হয়। ইংরাজী সাহিত্য-প্রভাবিত প্রথম বাঙ্গালী কবি হিসাবে অর্থাৎ আধুনিক যুগের প্রথম কবি হিসাবে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাসাশ্রিত স্বদেশপ্রেমমূলক আখ্যায়িকা কাব্য ও রোমান্টিক প্রেম মূলক আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করেন। তিনি এডুকেশন গেজেট পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। পরে সংবাদ রসসাগর বা সংবাদ সাগর (১৮৫০-৫৯) এবং সাপ্তাহিক বার্তাবহ (১৮৬০-৬২) পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রঙ্গলাল রচিত কাব্য : ঋতুসংহার (কালিদাসের কাব্যের পদ্যানুবাদ), কুমার সম্ভব (ঐ), ভেক মূষিকের যুদ্ধ (হোমারের নামে প্রচলিত কাব্যের অনুবাদ), পদ্মিনী উপাখ্যান (রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য—১৮৫৮), সুরসুন্দরী (রাজস্থানের বীরবালার চরিত্র অবলম্বনে—১৮৬৮), কর্মদেবী (রাজস্থানের সতীবিশেষের চরিত্র অবলম্বনে—১৮৬২), কাঞ্চী কাবেরী (উৎকল

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশীয় বীররসের উপাখ্যান—১৮৭১), নীতিপুষ্পাঞ্জলি। তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ : বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, শরীর সাধনী বিদ্যার গুণকীর্তন, ইউরোপ ও এস্যাখণ্ডস্থ প্রবাদমালা।

বর্ধমান শহরের পূর্বে বড়শুল গ্রাম নিবাসী কায়স্থ জাতীয় তারাচরণ দাস প্রাচীন ধারার অনুসরণ করে মন্মথ কাব্য নামে একটি কাব্য রচনা করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। কলিঙ্গ রাজপুত্র মনোমোহন ও তার ছয় বন্ধু এবং মন্ত্রীপুত্রের সম্মিলিত দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব আছে।

তারাচরণ দাস

কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৪।৭।১৮৫৩—২৮।৮।১৯২২) শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী ছদ্মনামে স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নবীনচন্দ্র বর্ধমানের পূর্বাংশে দশ মাইল দূরে বুড়ার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ, মুঙ্গের ও মুর্শিদাবাদে কর্মজীবন অতিবাহিত করার পরে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বগ্রামে বসবাস করেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত কাব্য ভুবনমোহিনী প্রতিভা রচিত ও প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর পরে নিজগ্রামে অবস্থান করে ভুবনমোহিনী প্রতিভার ২য় ভাগ ও আর্যসঙ্গীত রচনা করেন। বিনোদিনী, সাধারণী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হোত। মুর্শিদাবাদের নসীবপুর থেকে তাঁর ছদ্মনামে সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হোত (১২৮২)। কবির শেষ জীবনে লেখা শিবাজী বিজয় কাব্য প্রকাশিত হয় নি। নবীনচন্দ্রের প্রকাশিত কাব্য : ভুবনমোহিনী প্রতিভা—১ম ভাগ (১৮৭৫), ঐ ২য় ভাগ (১৮৭৭), আর্য সঙ্গীত ১ম খণ্ড (দ্রৌপদী নিগ্রহ কাব্য—১৮৮০), ঐ ২য় খণ্ড (জাতীয় নিগ্রহ কাব্য—১৯০২), সিন্ধুদূত কাব্য (১৭৮৩)।

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীগণ বাঙ্গালা গদ্যের যে ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন তা সুরম্য সৌধে পরিণত হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সাধনায়। অক্ষয়কুমার ছিলেন বর্ধমান জেলার সন্তান। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী চুপি গ্রামে ১২৭৭ সালের ১লা শ্রাবণ (১৮২০) অক্ষয়কুমারের জন্ম। তাঁর পিতার নাম—পীতাম্বর দত্ত, মাতা

—দয়াময়ী। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠকালে পিতার মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রবল জ্ঞানপিপাসা বশতঃ নিজের চেষ্টায় অক্ষয়কুমার ইংরাজী, জার্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী হয়েছিলেন। সংবাদ প্রভাকরে রচনা প্রকাশিত হওয়ার ফলে কবি ঈশ্বর গুপ্তের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায় তিনি কলিকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন (১৮৪৩)। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বৎসর তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় নর্মাল স্কুল স্থাপিত হলে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছানুসারে তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে টাকী নিবাসী প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় বিদ্যাদর্শন নামে একটি মাসিক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার ইহলোক ত্যাগ করেন। অক্ষয়কুমারই প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় গবেষণামূলক ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। বাঙ্গালা গদ্যকে তিনি তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি রচনার উপযোগী করে তুলেছিলেন। অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্তি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। অক্ষয়কুমারের রচনাবলী: অনঙ্গমোহন কাব্য (১৮৪১), ভূগোল (১৮৪১), বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১ম (১৮৫০), ঐ ২য় (১৮৫২), চারুপাঠ ১ম (১৮৫২), ঐ ২য় (১৮৫৪), ঐ ৩য় (১৮৫৬), বাষ্পীয় রথারোহী দিগের প্রতি উপদেশ (১৮৫৫), ধর্মনীতি (১৮৫৬), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম (১৮৭০), ঐ ২য় (১৮৮৩), প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার (১৯০১)।

অক্ষয়কুমার দত্ত

বাঙ্গালা উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স রচনার যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন সেই আদর্শ অনুসরণ করে যে সকল কথা-সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁদের অন্যতম। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (৩০।১২।১৮৫৪—১৮।৮।১৯০৫) বর্ধমান জেলার মেমারির নিকটবর্তী ইলসরা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পৈতৃক

নিবাস ছিল দামোদর তীরবর্তী বেড়ুগ্রাম। পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

যোগেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন স্বাধীনচেতা স্বদেশ প্রেমিক সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ও বঙ্গানুবাদ সহ বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ ও সুলভ মূল্যে প্রচার যোগেন্দ্রচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি। তিনি ছিলেন সাধারণী পত্রিকার সম্পাদক, সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী, হিন্দী বঙ্গবাসী, ইংরাজী টেলিগ্রাম ও মাসিক জন্মভূমি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং মাসিক সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২)। যোগেন্দ্রচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস: বাঙ্গালী চরিত ৩ খণ্ড, মডেল ভগিনী চরিত ৪ খণ্ড, চিনিবাস চরিতামৃত, মহীরাবণের আত্মকথা, কালাচাঁদ ৫ পর্ব, পঞ্চানন্দ, কৌতুকণা ও নেড়া হরিদাস।

উনিশ শতকের আর একজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০—৮।১১।১৯০৮) বর্ধমান জেলার বৈদ্য ন'পাড়া গ্রামে বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পুঁটিয়া এষ্টেটের দেওয়ান প্রসন্নকুমার মজুমদার এবং অনুজ সাহিত্যিক শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার। পুঁটিয়ার মহারানী শরৎকুমারীর প্রেরণায় শ্রীশচন্দ্র সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক সমালোচক পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গসমাজ ও চারিজন যুগসংস্কারক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ সংস্কারক হিসাবে কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন ও ঘনিষ্ঠ হন। রবীন্দ্রনাথের তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত ২য় পর্যায়ের বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে গেলে শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয় (কার্তিক ১২৯০)। তাঁরই চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় পদরত্নাবলী নামে বৈষ্ণব পদাবলীর সংকলন প্রকাশিত হয়। সাধনা, প্রদীপ, সমালোচনী, ভারতী ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে তাঁর রচিত উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। শক্তি-কানন, ফুলজানি, কৃতজ্ঞ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি উপন্যাস এবং রাজতপস্বিনী নামে মহারানী শরৎকুমারীর জীবনী শ্রীশচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থ। এছাড়া রায়বনী দুর্গ নামে উপন্যাস বঙ্গদর্শন

পত্রিকায়, পাঠশালা গল্প, টাহেটী দ্বীপের পার্লামেণ্ট ও জীবন সংগ্রাম নামক রচনা বালক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির শ্রীশচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশ করেছিল।

শ্রীশচন্দ্রের ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (১২৭৩-১৩২৩) বৈদ্য ন'পাড়া গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি সমালোচনী (১৩০৮-১৩) এবং নবপর্যায় বঙ্গদর্শন (১৩১৮-২০) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। চিত্র বিচিত্র (১৩০৯), হিন্দু (১৩০১) ও পূজার ফুল (১৩০৪-৫) গ্রন্থগুলির তিনি রচয়িতা।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

অম্বিকাচরণ গুপ্ত (১৮৫৮-১৯১৫) ছিলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রামের জন্মস্থান দামিন্যা গ্রামের অধিবাসী। তিনি ছিলেন বৈদ্য জাতীয়। তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অম্বিকাচরন বিচিত্র ধরনের রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁর বহু ঐতিহাসিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ সমকালীন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুকুন্দরামের জীবনী নিয়েও তিনি গবেষণা করেছিলেন। চিকিৎসাতত্ত্ব বারিধি, চিকিৎসা কল্পলতিকা, চিকিৎসক বা প্রেসক্রিপসন বুক, গৃহস্থ জীবন—সংসার কোষ ২ খণ্ড, চিকিৎসা তত্ত্বকৌমুদী ও পরলোকের পত্র গ্রন্থগুলি তিনি সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। অম্বিকাচরণের রচনাবলী : কাব্য : পরিত্যক্ত পল্লী, ভারতলক্ষ্মী, শারদোৎসব। প্রহসন : কলির মেয়ে, ছোট বউ। প্রবন্ধ গ্রন্থ : আমার চিন্তা, জ্ঞানপ্রভা। রম্যরচনা : দেব সমিতি বা সুরলোকে স্বদেশ কথা। গল্প ও উপন্যাস : কপট সন্ন্যাসী, জ্যোর্তিময়ী, সুধারাম, শান্তিরাম, সংসার সঙ্গিনী, কুসুম-কুমারী, বঙ্গের গুপ্ত রত্নাঞ্জলি, কল্যাণী (ছোটগল্প), জজ দিগম্বর বিশ্বাস। ঐতিহাসিক গ্রন্থ : তারকেশ্বর, ভারতে ইংরাজ, হুগলী বা দক্ষিণ বাঢ়, জয়কৃষ্ণ চরিত, মহারানী ভিক্টোরিয়া, কোম্পানীর রাজত্ব, বাঙ্গালা সাহিত্য।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

উনিশ শতকের খ্যাতনামা ব্যঙ্গলেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) পঞ্চানন্দ ও পাঁচু ঠাকুর ছদ্মনামে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও গদ্য রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থায়ী আসন অধিকার করেছেন। ইন্দ্রনাথের জন্ম বর্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রামে। তাঁর পৈতৃক

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ও স্থায়ী নিবাস কাটোয়ার নিকটবর্তী গঙ্গাটিকুরি গ্রাম। তাঁর পিতা ছিলেন পূর্ণিয়ার উকিল বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথও পূর্ণিয়ায়, দিনাজপুরে, পরে কলিকাতা হাইকোর্টে এবং শেষে আমৃত্যু বর্ধমান কোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্রিকা 'পঞ্চানন্দ'-এর সম্পাদনা করতেন। ইন্দ্রনাথের রচনাবলী: উৎকৃষ্ট কাব্য (১৮৭০), ভারত উদ্ধার কাব্য (১৮৭৮), কল্পতরু (উপন্যাস—১৮৭৪), ক্ষুদিরাম (উপন্যাস ১৮৮৮), পাঁচু ঠাকুর ৩খণ্ড (১৮৮৪-৮৫), খাজনার আইন, জাতিভেদ, হাতে হাতে ফল (প্রহসন—১৮৮২)।

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী (১২৬০—১৩৩৯) বর্ধমান জেলার চকব্রাহ্মণ বাড়িয়া গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী। দুর্গাদাস চারি বেদের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য বিখ্যাত। তিনি একাধারে ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশ ও উৎসাহে তিনি সাহিত্যসেবায় অনুপ্রাণিত হন। সাধারণী, সোম প্রকাশ, নব বিভাকর সুলভ সমাচার, জন্মভূমি প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে।

দুর্গাদাস লাহিড়ী

১২৯৪ সালে অনুসন্ধান পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা হয়। তিনি পাক্ষিক বঙ্গবাসী (১২৯৮) এবং সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী (১৩০১—০৮) পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৩১৮ সালে দুর্গাদাস সাহিত্য সংবাদ এবং ১৩৩২ সালে স্বদেশী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথমটি ১৮ বৎসর ও দ্বিতীয়টি ৪ বৎসর জীবিত ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাদাস হাওড়া শহরে পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১০ খণ্ডে পৃথিবীর ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ দুর্গাদাসের অবিস্মরণীয় কীর্তি। দুর্গাদাসের রচনাবলী: পৃথিবীর ইতিহাস ১০খণ্ড, স্বাধীনতার ইতিহাস, জুয়াচুরির রহস্য (১৩০৪), রানীভবানী (উপন্যাস—১৩১৬), সাধনা, সাধনতত্ত্ব, সৎপ্রসঙ্গ, দ্বাদশ নারী, নির্বাণ জীবন, ভারতে দুর্গোৎসব, চিত্রাবলী, মণি বেগম (১৩২৩), চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও খুন, সুখ ও শান্তি, শিখ যুদ্ধের ইতিহাস, সুবর্ণ বলয়, নবরত্ন, রাজা রামকৃষ্ণ, লক্ষ্মণ সেন, মর্তের ভগবান, জ্ঞানযোগ, অদৃষ্টচক্র, পঞ্চানন্দের পঞ্চরং, বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, এনক্ আর্ডেন (টেনিসনের কবিতার পদ্যানুবাদ) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি বঙ্গাক্ষরে ঋক্,

সাম, যজুর্থ ও অথর্ববেদ, বাঙ্গালীর গান, বৈষ্ণব পদলহরী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি সম্পাদনা করেছিলেন।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ

খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১২১২—১২৭৩) বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি বাল্যকাল থেকেই বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখতেন। সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ ভাস্কর পত্রিকা দুটিতে প্রেমচাঁদের কবিতা প্রকাশিত হোত।

বিষ্ণু মৈত্র

মাজিদা নিবাসী রাজনারায়ণ ভট্টাচার্যের পুত্র বিষ্ণু মৈত্র ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি পাশ করার পর এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। বহু সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রে ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর লেখা অপচয় ও উন্নতি নামক অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থখানি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

স্বামীবিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬১—১৯০৩) যদিও কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং কলিকাতাতেই পরিবর্ধিত, তথাপি তাঁর পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি কালনার নিকটবর্তী দত্ত ডেরেটোন গ্রামে। সুতরাং বর্ধমান জেলার সঙ্গে তিনি জন্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ : পরিব্রাজক, ভাববার কথা, বর্তমান ভারত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং পত্রাবলী। কথ্যভঙ্গীর গদ্যভাষায় ঋজুতা, দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা সঞ্চার করে তিনি গদ্যে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। তাঁর পরিব্রাজক লঘুচালের সুখপাঠ্য ভ্রমণ কাহিনী।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) কলিকাতার সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিচিত্র কর্মের মধ্যে থেকেও ইংরাজী, বাঙ্গালা, জার্মান, হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস যুগ সমস্যা, জাতি সংগঠন, তরুণের অভিমান, যৌবনের সাধনা, সাহিত্যে প্রগতি, ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, বিপ্লব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ভূপেন্দ্রনাথের প্রতিভার দান।

স্বামী বিবেকানন্দের অপর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৯-১৯৫৬) ইতিহাস,

কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান, সাধু চতুষ্টয়, গিরিশচন্দ্রের মন ও শিক্ষা, পশুজাতির মনোবৃত্তি, পাশুপত অস্ত্রলাভ (কাব্য), শিল্প প্রসঙ্গ, নৃত্যকলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যাভিনয় ও নাটক রচনার যে জোয়ার এসেছিল সেই জোয়ারে বর্ধমান একেবারে নিশ্চল ছিল না। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমকালে রাজকৃষ্ণ রায় কাব্য ও নাটক রচনায় এবং নাট্যপরিচালনায় বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। বর্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর নিবাসী রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) বীণা প্রেস ও বীণা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতার নাম রামদাস রায়। গীতিধর্মিতা সঙ্গীত বাহুল্য ও ভক্তিরসের প্রাচুর্যের জন্য রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। বীণা থিয়েটার (কলিকাতায়) চালাতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলি বীণা থিয়েটারে ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ রচিত কাব্য: গিরিসন্দর্শন, আগমনী, বঙ্গভূষণ, নিশীথ চিন্তা, নিভৃত নিবাস, ভারত গান, অবসর সরোজিনী প্রভৃতি। তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটক: অনলে বিজলী, তারক সংহার, হরধনুর্ভঙ্গ, রামের বনবাস, যদুবংশ ধ্বংস, তরণীসেন বধ, প্রহ্লাদ মহিমা প্রভৃতি। তাঁর জীবনী নাটক: হরিদাস ঠাকুর, মীরাবাঈ। প্রহসন: কলির প্রহ্লাদ, কাণাকড়ি, বেল্লিকে বাঙ্গালী বিবি, লোভেন্দ্র গবেন্দ্র প্রভৃতি।

রাজকৃষ্ণ রায়

রেনেসাঁস যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অলোক সামান্য প্রতিভার দীপ্তিতে বঙ্গসাহিত্যের সকল দিক উদ্ভাসিত করেছিলেন। তাঁর সর্বাতিশায়ী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় যাঁরা ব্যাপৃত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রোমান্টিকতা বিরোধী ব্যঙ্গ-প্রবণ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পৈতৃক নিবাস শান্তিপুরে হলেও তাঁর জন্ম হয়েছিল কালনা থানার অন্তর্গত পাতিলপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যু হয় মেদিনীপুরের হিজলীতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইঞ্জিনিয়ার কবি রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রকাব্য পরিমণ্ডলে লালিত হয়েও সম্পূর্ণ

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রোমান্টিকতা বিরোধী ক্লাসিক ভঙ্গীতে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় শোষণ অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে এবং রোমান্টিক ভাবালুতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। জগতে দুঃখ ছাড়া সুখের অস্তিত্ব যেমন তিনি খুঁজে পান নি, তেমনি শোষণ অত্যাচার ছাড়া আনন্দও কোথাও দেখতে পান নি। রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রম করে বাঙ্গালা কাব্যে তিনি অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০), সায়ম্ ও ত্রিযামা কাব্যগ্রন্থগুলি বাঙ্গালা কাব্যের জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের মধ্যে সর্বপ্রধান কবি ছন্দের জাদুকর অভিধায় আখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) জন্মসূত্রে বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামে। তিনি মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র ও রজনীনাথ দত্তের পুত্র। সত্যেন্দ্রনাথ বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। পিতামহের মত ইতিহাসে তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ কাব্য প্রথম তাঁরই সৃষ্টি। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করলেও কবি হিসাবেই সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রকাশিত কাব্য: সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, হোমশিখা, তীর্থসলিল (অনুবাদকাব্য), কুহু ও কেকা, অভ্র আবির, হসন্তিকা (ব্যঙ্গ কবিতা), চীনের ধূপ (অনুবাদ), বেলা শেষের গান। উপন্যাস: জন্মদুঃখী, বারোয়ারী। নাটক: রঙ্গমল্লী, ধূপের ধোঁওয়ায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রানুরাগী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্রোহী কবি হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। প্রবল দারিদ্র্যবশতঃ আসানসোলে রুটির দোকানে তিনি কাজ করেছেন, আবার সিয়ারসোলে রাজস্কুলে অধ্যয়ন করেছিলেন। বাল্যকালে লেটোর দলে যোগদান করে পালা ও গান লিখতেন। সৈন্যবিভাগে কাজ করার সময় থেকেই তিনি কবিতা রচনা সুরু করেছিলেন। অন্যায় অসাম্য অত্যাচার, অবিচার ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে দিয়ে বিদ্রোহী কবি আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও গান—সকল বিষয়ে তিনি বৈচিত্র্যময় রচনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট করলেও কবি হিসাবেই তাঁর খ্যাতি সর্বব্যাপী। নজরুলের প্রকাশিত কাব্য: অগ্নিবীণা

কাজী নজরুল ইসলাম

(১৯২২), দোলন চাঁপা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সাম্যবাদী, চিত্তনামা, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধু হিল্লোল প্রভৃতি। অনুবাদকাব্য : রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, আমপারা, রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম। গল্প : ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা। উপন্যাস : বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা। নাটক : ঝিলিমিলি, আলেয়া, মধুমালা প্রভৃতি। প্রবন্ধ : যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী প্রভৃতি। সঙ্গীত গ্রন্থ : বুলবুল, চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, গুলবাগিচা, বনগীতিকা, গানের মালা, নজরুল স্বরলিপি প্রভৃতি।

রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের অন্যতম চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের বংশধর বৈষ্ণবীয় দৃষ্টির অধিকারী কবি কালিদাস রায় (১৮০৯-১৯৭৫) জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কড়ুই গ্রামে। পিতার নাম : যোগেন্দ্রনাথ রায়। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতার পরে কালিদাস রায় মিত্র ইন্‌স্টিটিউসনের ভবানীপুর শাখায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছিলেন ১৯৩১ থেকে ৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি রসচক্র সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক, রঙ্‌পুর সাহিত্য পরিষদ থেকে কবিশেখর উপাধি, বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম উপাধি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্‌. উপাধি দ্বারা তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও সমালোচক। রোমান্টিকতা, পল্লীপ্রীতি, প্রকৃতি প্রীতি, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারা তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কালিদাসের প্রকাশিত কাব্য : কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট ২ ভাগ, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল, ক্ষুদকুঁড়া, লাজাঞ্জলি, রসকদম, হৈমন্তী, বৈকালী, ব্রজবাঁশরী, সন্ধ্যামণি, পূর্বাহুত প্রভৃতি। তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ : প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ৩ খণ্ড, বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ৩ খণ্ড, শরৎসাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য পরিচয় প্রভৃতি। ছোটদের উপযোগী গল্প, রম্যরচনা, গীতগোবিন্দ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদও তিনি রচনা করেছিলেন।

কালিদাস রায়

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্যতম পল্লীপ্রকৃতি ও বৈষ্ণবভাবুকতার কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের (১৮৮২-১৯৭০) পৈতৃক নিবাস শ্রীখণ্ড, জন্ম, নিবাস ও মৃত্যু কোগ্রামে। অজয় ও কুনুর নদীর তীরবর্তী পল্লীপ্রকৃতির শোভা

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে সহজ সরল ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী সুবর্ণপদক ও ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন মাথরুন নবীনচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক। কুমুদরঞ্জন রচিত কাব্য: শতদল, বনতুলসী, উজানি, একতারা, বীথি, বীণা, বনমল্লিকা, নূপুর, রজনীগন্ধা, অজয়, স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতি। এ ছাড়া দ্বারাবতী নামে একটি নাটকও তিনি রচনা করেছিলেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বদেশপ্রেমিক চিকিৎসক কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের (১৮৯৩-১৯৮৬) জন্ম বর্ধমান জেলার উখড়ায় মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক নিবাস কালনা থানার অন্তর্গত পাতিলপাড়া গ্রামে। তিনি কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। উখড়া গ্রামে ও খনি অঞ্চলে পরে কলিকাতায় তিনি চিকিৎসাব্রতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মন্দিরের চাবি কাব্যগ্রন্থটি ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয় (১৯৩১)। তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্য: সাঁঝের প্রদীপ, রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী, দিশারী কপোত, শেষের গান, চূড়ালা ও শিখিধ্বজ, দীনেশ গুপ্তের শেষপত্র, সপ্তপদী, বর্ধমান বন্দনা প্রভৃতি। তাঁর রচিত নাটক: মন্দার ও মালঞ্চ।

রবীন্দ্রানুসারী কবি, প্রবন্ধকার ও চিত্রশিল্পী কানাই সামন্তর (১৯০৪-   ) পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার বিজুর গ্রামে। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামে পিতার মাতুলালয়ে। তিনি বৈদ্যপুর স্কুলের ছাত্র। তিনি চিরকুমার, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য, বিপ্লবী, বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর ঘনিষ্ঠ, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্র এবং বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের কর্মী। স্বদেশী বাজার, কল্লোল, প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় তাঁর কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রকাশিত কাব্য: চিত্রোৎপলা, গীতিমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, উষসী, ইন্দ্রধনু, নিরঞ্জনা, তন্বী ও শুকতারার টিপ (ছড়া)। তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ: রবীন্দ্র প্রতিভা (সমালোচনা), চিত্রদর্শন (চিত্রশিল্প সম্বন্ধে), নন্দলাল বসু (জীবনী), ঝরা পাতা ঝরা পালক (আত্মস্মৃতি)। তিনি দুখানি ইংরাজী কাব্যও রচনা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা (৪র্থ সং), গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড, চিত্র-বিচিত্র, ছিন্নপত্রাবলী, বিচিত্রা, বৈকালী, প্রকৃতির

কানাই সামন্ত

প্রতিশোধ, গল্পগুচ্ছ, চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড নন্দলাল বসুর শিল্পচর্চা প্রভৃতি সম্পাদনা করেছিলেন।

খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০০-১৯৭৬) পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলার রূপসীহর এবং পরবর্তী নিবাস টালাপার্ক কলিকাতা হলেও জন্ম বর্ধমান জেলার অণ্ডালে মাতুলালয়ে মাতামহ রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। অণ্ডালে তাঁর বাল্যকাল ও প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ছিলেন সিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র এবং কবি নজরুল ইসলামের সহপাঠী বন্ধু। প্রথম জীবনে তিনি রাণীগঞ্জ অণ্ডাল অঞ্চলে কয়লাকুঠিতে চাকরি করেছেন। এই অঞ্চলের কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবন অবলম্বনে তিনি গল্প উপন্যাস রচনা করে কয়লাকুঠির সাহিত্যিক হিসাবে প্রসিদ্ধ অর্জন করেন। কয়লাকুঠির শ্রমিক মজুর সাঁওতালদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, উৎসব, প্রণয় ইত্যাদি অবলম্বনে বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে গল্প উপন্যাস রচনা করে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি স্বতন্ত্র আসন অধিকার করেছিলেন। কল্লোল, কালিকলম, প্রবাসী সংহতি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হোত। চলচ্চিত্রও তিনি পরিচালনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী: কয়লাকুঠি, আখের মঞ্জরি (গল্প), ঝোড়ো হাওয়া, বধূবরণ, হাসি, মাটির ঘর, ছায়াছবি, নারীর মন, জোয়ারভাটা, বাংলার মেয়ে, রক্তলেখা, সাঁওতালী, নন্দিনী, গঙ্গা-যমুনা, সতী অসতী, বন্দী (নাটক), শহর থেকে দূরে, কনেচন্দন প্রভৃতি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত মহিলা কথাসাহিত্যিক শৈলবালা ঘোষজায়ার (১৮৯৪-১৯৭৪) পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমান। তাঁর পিতার নাম কুঞ্জবিহারী নন্দী। বর্ধমান জেলায় মেমারি গ্রাম নিবাসী জমিদার নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বর্ধমান বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর (১৩৩৬) তিনি আসানসোল আদ্রা রেলপথে রামচন্দ্রপুরে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে বাস করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫৫। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: সেখ আন্দু (১৩২২), নমিতা (১৯১৮), অভিশপ্ত সাধনা, মঙ্গলঘট, জন্ম অভিশপ্তা, বিনিময়, গঙ্গাপুত্র, স্মৃতিচিহ্ন, মঙ্গলু মঠ, মোহের প্রায়শ্চিত্ত, নিষ্ঠা, করুণা দেবীর আশ্রম, অকাল

শৈলবালা ঘোষজায়া

কুষ্মাণ্ডের কীর্তি (গল্প), চৌকো চোয়াল (ডিটেক্‌টিভ), অনন্তের পথে প্রভৃতি।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশনায় রাজা রামমোহনের সহযোগী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান (১৭৮৭-১৮৪৮) উখড়ার নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে। সহজ ভাষায় সমকালীন সমাজের ব্যঙ্গাত্মক রচনা কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), নববাবুবিলাস (১৮২৫) ও নববিবি বিলাস (১৮৩১), দূতীবিলাস (১৮২৫) প্রভৃতির জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি প্রমথনাথ শর্মা ছদ্মনামে লিখতেন।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা ছোট গল্পের রাজা প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ধাত্রিগ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। স্নিগ্ধ কৌতুক ও পরিমিত কারুণ্যের মিশ্রণে বাঙ্গালী জীবনের ছোটখাট অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরে ছোটগল্প রচনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়েছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে নবীন সন্ন্যাসী, রত্নদীপ, সিন্দুর কৌটা, সতীর পতি, গরীব স্বামী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গল্প-গ্রন্থের মধ্যে নব কথা, ষোড়শী, কাটা মুণ্ড, গল্পাঞ্জলি, হতাশ প্রেমিক, নতুন বৌ, জামাতা বাবাজী প্রভৃতি স্মরণীয়। অভিশাপ ব্যঙ্গকাব্য এবং সুক্ষ্মলোম পরিণয় নাটকও প্রভাতকুমারের সৃষ্টি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কথা সাহিত্যিক চরণদাস ঘোষের (১৮৯০-১৯৬৬) জন্ম হয়েছিল বর্ধমান জেলার বাইতিপাড়া গ্রামে। ছন্নছাড়া, হিন্দুর বৌ, দান নাগরিকা, তেপান্তর, নিরক্ষর প্রভৃতি উপন্যাস এবং মণ্টুর মা, সুহাগ প্রভৃতি ছোটগল্পসংকলক চরণদাসের সৃষ্টি।

চরণদাস ঘোষ

কবি ও কথা সাহিত্যিক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৫৯) কাটোয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ মিলিয়ে তিনি প্রায় ৪০টি গ্রন্থের লেখক। সুন্দরী, শাপমুক্তি, বহ্নিবলয় প্রভৃতি উপন্যাস, মীরাবাঈ, সতী প্রভৃতি নাটক, সুরধুনী, বাসন্তিকা প্রভৃতি কাব্য, আলোচনী, সাহিত্যিকা, সাহিত্যকথা, রবীন্দ্রের ছন্দ, জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনী প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ, মণি ও মিনু প্রভৃতি শিশুসাহিত্য বসন্তকুমারের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রখ্যাত অস্থি-চিকিৎসক ডাঃ মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৬৭-১৯৩৪) এফ. আর.

সি. এস্. বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুক্তিপথ নামে একটি উপন্যাস ও Surgery নামে শল্যচিকিৎসার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র

উনিশ শতকের কবি ও গীতিকারদের মধ্যে প্যারীমোহন কবিরত্নের জন্ম বর্ধমান জেলার সাহাজুই গ্রামে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর একটি কবিতা সকংলন গীতাবলি নামে প্রকাশিত হয় (১২৮২)। অনুকুলচন্দ্র দত্ত জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীখণ্ড গ্রামে। তাঁর রচিত কাব্য জাল প্রতাপ লীলারস প্রসঙ্গ সঙ্গীত (১৮৪১)। কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া গ্রাম নিবাসী কবি গণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৮৬৬) ছিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ। তাঁর প্রকাশিত কাব্য: চিত্ত সন্তোষিনী (১৮৬৩), কৃষ্ণবিলাস ও ঋতুদর্পণ (১৮৬৪)। উনিশ শতকের মহিলা কবি নীরদমোহিনী বসু (১৮৬৪-১৯৫৪) ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর পত্নী ও প্যারীচাঁদ মিত্রের কন্যা। তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান। তিনি বামাবোধিনী পত্রিকার লেখিকা এবং বহু ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদিকা। তাঁর প্রকাশিত কাব্য: প্রবাহ, পারিজাত ও ছায়া। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের (১২৭৮-১৩৩৮) জন্মস্থান বর্ধমান জেলার রসুই গ্রাম। তিনি সতী মাহাত্ম্য বা সাবিত্রী নামে একটি কাব্য লিখেছিলেন। রায়ান গ্রাম নিবাসী ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ বৈষ্ণবব্রত বিধান নামে হরিভক্তি বিলাসের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। পীলাগ্রাম নিবাসী নীলকণ্ঠ হালদার ছিলেন গায়ক ও গীতিকার। তিনি লহর নামে দীর্ঘ ছন্দে অনুপ্রাসবহুল আদি রসাত্মক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

প্যারীমোহন কবিরত্ন

অন্যান্য কবি

উনিশ শতকের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আজিমুদ্দিন মুনসী বর্ধমান জেলার খড়িগ্রামে বাস করতেন। তিনি প্রধানতঃ প্রহসন লেখক। তাঁর প্রকাশিত প্রহসন: জামাল নামা (১৮৫৯), কি মজার কলের গাড়ী (১৮৬৩), কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে (১৮৬৮) প্রভৃতি।

নাট্যকার আজিমুদ্দিন মুনসী

রম্যরচনা লেখক অনুকূলচন্দ্র রায়ের (১৮৯০-) প্রকাশিত গ্রন্থ: যদি। প্রবন্ধকার ও ধর্মগ্রন্থ লেখক স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী (১৮৮০-১৯৭৩) জন্ম বর্ধমান জেলার চন্দুলি গ্রামে। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম: প্রমথনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করলেও অংক ও পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, জগৎসূত্রম্, ফেরার পথে, বেদ ও বিজ্ঞান, পুরাণ ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান, হিন্দু সদ্দর্শন, Science and Sadhana ৬ খণ্ড, India : Her Cult and Education ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে অসাধারণ মনস্বিতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

স্বামী কেশবানন্দ মহাভারতীর (১২০৩-১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ) জন্ম বাঘাসন গ্রামে। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম রাধিকা প্রসাদ রায়চৌধুরী। আনন্দগীতা নামে ধর্মোপদেশমূলক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

কেশবানন্দ মহাভারতী

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ভ্রাতা রায় বাহাদুর রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় (১৮২৯-১৯১৪) শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : পুলিশ ও লোক রক্ষা (১৮৯২), প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনচরিত ও কবিতাবলী (১৮৯২), নিকাশ আখেরি বা পরিণাম।

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্যামাদাস বাচস্পতির (১৮৬৪-১৯৩৪) জন্মস্থান চুপি গ্রামে। তিনি দেশবন্ধুর আহ্বানে দুই লক্ষ টাকা দান করে বৈদ্যশাস্ত্র পীঠের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : চা পানের দোষ, ব্রহ্মার কথা, শিবের কথা প্রভৃতি। পিপলন নিবাসী শ্যামানন্দ লিখেছিলেন চৈতন্যদেবের মহাদান নামে একটি গ্রন্থ। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭-১৯৪১) শিক্ষাগুরু প্রসঙ্গে নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ রাসবিহারী বসুর (১৮৮৫-১৯৪৫) জন্ম বর্ধমানের সুবলদহ গ্রামে। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাস জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ ও আত্মজীবনীও লিখেছিলেন। **Bengal Peasant Life**-এর লেখক রেভারেণ্ড লালবিহারীর জন্ম বর্ধমানের সোনাপলাশী। তিনি বঙ্গভাষায় 'বাসর যামিনী' নামে একটি গীতিনাট্যের রচয়িতা। সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম বর্ধমান জেলার জামালপুর। তিনি ৪০ বৎসর যাবৎ চকদীঘি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীগীতামৃত এবং রামায়ণের দার্শনিক ব্যাখ্যা রামলীলামৃত রচনা করেছিলেন। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর (১৮৪৬-১৯১১) পৈতৃক নিবাস কালনার নিকটবর্তী

শ্যামাদাস বাচস্পতি

উনিশ শতকের অন্যান্য লেখক

ধাত্রীগ্রাম। তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ছাড়াও বৌদ্ধ দর্শন, সাংখ্যদর্শন, বহুবিবাহ বিচার, দেবতাতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কালনা নিবাসী সীতানাথ বসুমল্লিক কাশী খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। অম্বিকা কালনা নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬-৮৪) বাঙ্গালা ভাষায় বহুবিবাহবাদ, বিধবা বিবাহ খণ্ডন, লাঠি থাকলে পড়ে না, বাক্যমঞ্জরী ও আশুবোধ ব্যাকরণের রচয়িতা।

বিশ্ববন্দিত ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেনের (১৯৮০-১৯৯২) পৈতৃক নিবাস রায়না থানার অন্তর্গত গোতান গ্রামে। তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন বর্ধমানের উকিল। তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই ইংলিশ স্কুল ও রাজকলেজের ছাত্র। তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা তত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান খয়রা অধ্যাপক। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট স্বর্ণপদক, রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক প্রভৃতি বহু পুরস্কারে সম্মানিত। ৫খণ্ডে সম্পূর্ণ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এছাড়া ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা স্থাননাম, ভারত কথার গ্রন্থি মোচন, বিদ্যাপতি গোষ্ঠী, রামকথার প্রাক্ ইতিহাস, ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য প্রভৃতি তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি।

সুকুমার সেন

উনবিংশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় স্বল্পখ্যাত বহু কবি পুরাতন ধারার কবিতা বা ভক্তিগীতি রচনা করেছেন। এঁদের অন্যতম ভবা পাগলা প্রচুর ভক্তিগীতি রচনা করেছিলেন। ভবা পাগলার পিতৃদত্ত নাম ভবমোহন চৌধুরী। তাঁর জন্মস্থান বাংলা দেশের ঢাকায় হলেও তিনি অম্বিকা কালনায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বসবাস ও সাধন-ভজন করতেন। ভবা পাগলা (১৯০১-১৯৮৪) নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। এই নামেই তিনি প্রচুর বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, আউল-বাউল ও লোকসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ : ভবা পাগলার সাধন সঙ্গীত ৬খণ্ড, মায়ের বাণী, ভবার বাণী, নামের ফেরিওয়ালা ভবা পাগলা।

ভবা পাগলা

কালনা থানার অন্তর্গত মীরহাট গ্রামনিবাসী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (মৃত্যু আঃ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) স্বদেশ প্রেমমূলক কবিতা, প্রবন্ধ ও নীতি কবিতা রচনা করেছিলেন। গোপালচন্দ্রের পিতা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ। তিনি বঙ্গবাসী পত্রিকার লেখক ছিলেন। তিনি একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী (১৩১৯) রচনা করেছিলেন।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী

কালনার নিকটবর্তী মোয়াইল গ্রাম নিবাসী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী (১৮৫২-১৯১৮) নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি উপাসক, আনন্দগীতি, গীতাভাস ও বালিকারঞ্জন (শিশু-পাঠ্য) কবিতা পুস্তকের রচয়িতা। এছাড়া ছাত্রশিক্ষা, শব্দশিক্ষা ও পাঠাবলী নামে শিক্ষামূলক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের (মৃত্যু ১২৭৯ বঙ্গাব্দ) জন্ম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা। কিন্তু তিনি বর্ধমান নিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন মহারাজ প্রতাপ চাঁদের সভার গায়ক, পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর গায়ক। মহারাজ প্রতাপ চাঁদ তাঁকে কবীন্দ্র উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রমাপতি তানসেনের হিন্দী ধ্রুপদ গানের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, নিজেও টপ্পা ও অন্যান্য গান রচনা করতেন। তাঁর অনূদিত সঙ্গীত, স্বরচিত সঙ্গীত ও পত্নী করুণাময়ীর রচিত সঙ্গীত একত্রিত করে সঙ্গীতাদর্শ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী

শ্যামাপদ চক্রবর্তীর (১৮৯৫-১৯৬৮) জন্ম বর্ধমান জেলার নাসিগ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁর পৈতৃক নিবাস এই জেলারই কসি-গ্রামে। তিনি ছিলেন খ্যাতনামা অধ্যাপক কবি ও অলংকার শাস্ত্র বিশারদ। অলংকার চন্দ্রিকা নামক বিখ্যাত গ্রন্থের তিনি লেখক। পুরুষ ও নারী নামে কাব্য এবং ওমর খৈয়ামের পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম সৃষ্টি।

সজনীকান্ত দাস

বিখ্যাত কবি, কথা সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, ব্যঙ্গলেখক ও শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের (১৯০০-১৯৬২) জন্ম বর্ধমানের বেতালবন গ্রামে মাতুলালয়ে। পথ চলতে ঘাসের ফুল (গীতিকাব্য), মনোদর্পণ (ব্যঙ্গ কবিতা), মধু ও হুল (ঐ), অঙ্গুষ্ঠ (ঐ), রণভূমে (ঐ), পঁচিশে বৈশাখ, মানস সরোবর প্রভৃতি কাব্য, অজয় ও মৃত্যুদূত উপন্যাস, আকাশ বাসর ও কলিকাল (হাসির গল্প) নামক গল্প গ্রন্থ, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলার কবিগান, উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (১০৮১-১৯৬৩) এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৬৮) ভ্রাতৃদ্বয়ের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার আহমদপুর। তাঁদের পিতা—আইনজীবী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইংরাজী ভাষায় ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে বহুগ্রন্থ প্রণেতা রাধাকুমুদ বঙ্গ ভাষায় অখণ্ড ভারত ও অন্ন সংস্থান নামে দুটি গ্রন্থের লেখক। রাধাকমল মাতৃভাষায় গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, দরিদ্রের ক্রন্দন, শাশ্বত ভিখারী (উপন্যাস), বিশ্বভারত ২ খণ্ড, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী, বিশাল বাঙ্গালা, নিদ্রিত নারায়ণ (নাটক), দরিদ্রের আহ্বান (ঐ) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের প্রণেতা।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য ঐতিহাসিক নিবন্ধ লেখকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীখণ্ডের অধিবাসী নবদ্বীপ বকুলতলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীখণ্ড গ্রন্থের লেখক নিত্য নিরঞ্জন কবিরাজ (১৮৯৪-১৯৮২) ও তাঁর পুত্র। মধ্যবিত্ত কোন পথে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী, বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ (১৯১৭-৯৪)। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগের অধ্যক্ষ ও পরে অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের জন্মস্থান বর্ধমানের ছোট বৈশত। তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী : পুঁথি পরিচয় ৪ খণ্ডে, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র ২ খণ্ড, ভারতশিল্পী নন্দলাল প্রভৃতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐস্লামিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গবেষক একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ডঃ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহের (১৯১২-৮৪) জন্মস্থান বর্ধমান জেলার বামুনিয়া গ্রাম। তাঁর রচিত আলবেরুণীর ভারততত্ত্ব, সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাহিত্যসেবী সাংবাদিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী (১৯১৮-) অনুকূলচন্দ্র সেনের সঙ্গে রচনা করেছেন 'বর্ধমান পরিচিতি' নামক গ্রন্থ। তাঁর জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : বর্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে। তাঁর বর্তমান নিবাস : কালীবাজার, বর্ধমান। অনুকূলচন্দ্র সেন (১৩০৭-১৩৯০) ছিলেন কালনার মহকুমা শাসক।

অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণেতা

কবি আবদুল গণি (১৯১২-) বর্ধমান শহরে পীর বাহরাম রোডে বাস

করেন। তিনি ফেরারী, মুখর প্রহর, কৃষ্ণার বুকে মণি প্রভৃতি কাব্য ছাড়াও হজরত পীর বাহরাম ও বর্ধমানে নূরজাহান ও বর্ধমান রাজ নামে দুখানি ইতিহাস গ্রন্থ এবং ধরার নবী নামে হজরত মহম্মদের জীবনী লিখেছেন। অধ্যাপক আবদুস সামাদের (১৯৬০-) নিবাস গলসীর নিকটবর্তী কুরবুবা গ্রামে। তিনি বর্ধমান রাজসভার সাহিত্য নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুধীরচন্দ্র দাঁ (১৯৩৪-) জন্মগ্রহণ করেছিলেন খণ্ড ঘোষ ব্লকের অধীনে মুই-ধারা গ্রামে। বর্তমানে তিনি বর্ধমান শহরে জিতেন মিত্র লেন-এ বাস করেন। বর্তমানে তিনি বর্ধমান পরিক্রমা নামে বর্ধমান সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অশান্ত পদ্মা, অন্তহীন কান্না প্রভৃতি উপন্যাস, মনভাস নামে ছোট গল্পের বই, অসতী, ভূতনাথ, বলিদান নামে নাটক, বর্ধমানের মনীষী, বিপ্লবী বাঙলা, জাতীয় শিক্ষা প্রসঙ্গে প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থও রচনা করেছেন। যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী 'বর্ধমান . ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামে তিনখণ্ডে বর্ধমানের ইতিহাস রচনা করেছেন।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, পরবর্তীকালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতা, সর্বভারতীয় কিষাণ সভার সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিরাজস্বমন্ত্রী (১৯৫৭-৭১) হরেকৃষ্ণ কোঙারের (১৯১৫-৭৪) জন্ম রায়না থানার অন্তর্গত কামার গড়িয়া গ্রামে। তিনি মেমারি বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের ছাত্র ছিলেন। সুবক্তা, তার্কিক এবং সুলেখক হিসাবেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। নির্বাচিত রচনা সংকলন, প্রবন্ধ সংকলন, ভারতের কৃষি সমস্যা, পথের সন্ধান প্রভৃতি তাঁর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ।

হরেকৃষ্ণ কোঙার

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটবুরোর সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রণ্টের চেয়ারম্যান সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯১১—১৯৯০) আউসগ্রাম থানার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার ও পরে দৈনিক গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা ২ খণ্ড, এবং সরোজ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সংগ্রহ।

সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক গবেষক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের (১৩৩৫—) জন্ম কালনা

থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর সন্নিহিত মীরহাট গ্রামে। তিনি বহু পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প ও ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়, রবীন্দ্র সাহিত্যে আর্য প্রভাব, বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ধারা, বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য পরিচয়, হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ৩য় খণ্ড, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বঙ্গসাহিত্যাভিধান ৪ খণ্ড প্রভৃতি। এছাড়া সিন্ধুতরঙ্গ ও মন্দির ত্যজি যব নামে দুখানি উপন্যাস, বারোমতি নামে ছোট গল্প সংকলন এবং রূপের অমরাবতী কাশ্মীর নামে ভ্রমণ কাহিনীও তাঁর রচনা।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

কাটোয়া থানার অধীনস্থ রাজুয়া (পোঃ চুরপুনি) গ্রাম নিবাসী মুহম্মদ আয়ুব হোসেন প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষক। তিনি ৬০০ লোককথা, ১১টি লোক গাথা, প্রবাদ, ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করেছেন। 'বাংলার লোককথা' সংকলনের সম্পাদনা ছাড়াও হজরত শাহ ছকু দেওয়ান নামে জীবনী গ্রন্থের তিনি লেখক। উক্ত গ্রামবাসী মুহম্মদ ইসমাইল (১৩৩১—) তেরোটি ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : সংস্কৃতির গতি ও আমরা, সাঁওতাল সংস্কৃতি প্রভৃতি।

মুহম্মদ আয়ুব হোসেন ও মুহম্মদ ইসমাইল

এ যুগের প্রথিতযশা কথা সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২—) জন্ম বর্ধমান জেলার পলসোনা গ্রামে। তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার ও একাডেমি পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত। প্রথম প্রহর, লালবাঈ, বনপলাশীর পদাবলী, দ্বীপের নাম টিয়ারঙ্, এখনই, বাড়ী বদলে যায় প্রভৃতি বহু উপন্যাস রচনা করে বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রমাপদ চৌধুরী

সাম্প্রতিক কালে ইন্দু দাঁ কবি ও কথা সাহিত্যিক হিসাবে বঙ্গ সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর জন্ম (১৯৪২—) ও পৈতৃক নিবাস মন্তেশ্বরের নিকটবর্তী বাঘাসন গ্রাম। কলিকাতার বড় বাজারে লৌহ-ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকেও কবিতা ও কথাসাহিত্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যসুষমা, মনশ্রী, পীযুষ পেয়ালা, অবরুদ্ধ অভিমানে প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ 'উষ্ণহৃদয় শীতল হাওয়া, বড় বাজার, শকুন সৈনিক প্রভৃতি উপন্যাস, কয়েকটি ছোট গল্প সংকলন ইন্দু দাঁর প্রতিভার দান।

ইন্দু দাঁ

কলানব গ্রাম নিবাসী রণজিৎ ভট্টাচার্য (১৯২৬—) যমুনা বহে উজান নামে গল্পগ্রন্থ এবং শহীদের ডাক নামে নাটকের রচয়িতা। রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক সাহিত্যিক সঙ্কর্ষণ রায়ের (১৩২৮—) জন্ম আসানসোলে। ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিম বাংলা, ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি, পাতালের ঐশ্বর্য সন্ধান, ভূ প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থ, গঙ্গা থেকে চম্বল, আরাকান থেকে আরাবল্লী, ছোটনাগপুরের বনে জঙ্গলে প্রভৃতি ভ্রমণ কাহিনী, সঙ্ঘমিত্রা, অগ্নিযুগের অনামা সৈনিক, বনলীলা, বনের গহনে প্রভৃতি উপন্যাস, রক্ত প্রবাল, কালনাগিনীর আক্রোশ, অণুবীক্ষণ রহস্য প্রভৃতি কিশোর উপন্যাস, বন্যরা বনে, বন্যপ্রাণী, বনে যারা থাকে প্রভৃতি রম্যরচনা তাঁর বৈচিত্র্যময় সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে। কবি প্রবন্ধকার ও নাট্যকার বর্ধমান জেলার সন্তান সঞ্জীব সেন (১৯৩২—) সময় অসময় কোলাহল নামক কাব্যগ্রন্থ, স্তালিন লাভিস্কি ও ব্রেশট, থিয়েটারের চালচিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। রক্ত তিলক নামক ছোট গল্প সংকলনের লেখক সরেশ্বর সেনের পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার সরগ্রাম। বর্ধমান দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক বর্ধমান নিবাসী সত্য নারায়ণ মাজিলা এক আকাশ অন্য জাতক নামে একটি গল্প গ্রন্থের রচয়িতা। অধুনা বাংলাদেশবাসী ছোট গল্প লেখক হাসান আজিজুল হকের (১৯৩৯ —) জন্ম : যবগ্রামে, পৈতৃক নিবাস : মঙ্গলকোটে। স্বনির্বাচিত গল্প, জীবন রসে আগুন, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, নামহীন গোত্রহীন প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের তিনি স্রষ্টা।

বিবিধ লেখকের রচনা

আসানসোল নিবাসী কালীপদ ঘটক (১৯০৫—) অরণ্য কুহেলী, চন্দন বহ্নি, মৃদঙ্গ, ডাইনীর ছেলে প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক। রামচন্দ্রপুরে জাত অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য মধুসূদন সাহিত্য পরিক্রমা, রামপ্রসাদ —জীবনী ও রচনা প্রভৃতি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। মন্তেশ্বরের নিকটবর্তী কুসাগ্রাম নিবাসী নিত্যগোপাল সামন্ত (১৯২৯—) শুকনো বকুল নামে কাব্য, পাথর ভাঙা কান্না, দুই ঝড় এক মেঘ, মহুয়া বনের মেয়ে প্রভৃতি উপন্যাস, তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

বর্তমানে কলিকাতা বাগুইআটি নিবাসী কমলকুমার সান্যালের জন্ম কালনায় ১৯৪০ সালে। তিনি কালিদাসের নবমূল্যায়ন, মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষসের মূল্যায়ন, বাংলা নাটক সমীক্ষা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী যারা,

উপন্যাস বীক্ষা: বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য প্রভৃতি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় (১৯২৯—) লিখেছেন বুনো পশু, নাৎসী শিক্ষা বিধান ও বিচিত্র কথা নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ, নতুন কবিতা নামে কাব্য এবং অহল্যা উপন্যাস। তাঁর জন্মস্থান আসানসোল। নবদ্বীপের নিকটবর্তী বর্ধমান জেলার মাধাইপুর গ্রাম নিবাসী ঔপন্যাসিক নিতাই ভট্টাচার্য (১৯০০—১৯৭০) রচিত অনেকগুলি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। সংগ্রাম উপন্যাস, কালের পদধ্বনি নাটক প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। স্বাধীনতা সংগ্রামী গলসীতে জাত ফকিরচন্দ্র রায় (১৩১১—) লিখেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকা নামে একটি গ্রন্থ। বাঁকুড়ার মল্লযান, বাঁকুড়ার স্মরণীয় যাঁরা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী নমিতা মণ্ডলের (১৯৪৮—) জন্মস্থান বর্ধমানের মোবারকগঞ্জ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হর্ষবর্ধন ঘোষ (১৯৩৫—) বর্তমানে দুর্গাপুর নিবাসী। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। শিশু সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩৭—) জন্ম: বর্ধমানের জামালপুর, বর্তমান নিবাস বর্ধমান জেলার শিপ্‌তাই গ্রামে। জোনাকি, পাপড়ি, কাকলি, ছন্দে ছড়ায় মণিমুক্তা, কীট পতঙ্গের জীবন কথা, মজার যত গল্প শোন প্রভৃতি শিশু সাহিত্যের তিনি রচয়িতা। বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিজিত কুমার দত্ত (১৯৩২—) বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নামক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী শিক্ষাবিদ কলানবগ্রাম নিবাসী বিজয়কুমার ভট্টাচার্যের জন্ম বর্ধমান জেলার ওঁয়াড়ি গ্রামে। গান্ধীজীর শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি, ইংরেজীর প্রয়োজন, গঠন কর্মপন্থা প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। মঙ্গলকোট বনকাপাসীতে জন্ম অম্বিকা কালনা নিবাসী বিনয় মুখোপাধ্যায় জীবন জ্যোতি, মহানগরীর স্টেশন ও অজয় বহে ধীরে উপন্যাস ত্রয়ের লেখক। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পুত্র জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক (১৯০৮—) ব্যঙ্গ রচনা চিত্রগুপ্তের খাতা, সাহিত্য সীমানা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বর্ধমান শহর নিবাসী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯১৫—) লিখেছেন অদ্ভুত নায়ক নামে একটি উপন্যাস।

সাম্প্রতিক কবিতা চর্চায় বর্ধমান মোটেই পশ্চাদ্‌পদ নয়। ছোটখাট বহু

কবির সন্ধান গ্রামে শহরে পাওয়া যাবে। দুর্গাপুর নিবাসী অনিলকুমার রায় (১৯৩৮—) প্রবাহিত ফল্গু ও মনের ময়না নামক কাব্য এবং সংক্ষিপ্ত সমাচার্য নামে নাটকের লেখক। মেমারি থানার অন্তর্গত গন্তার নিবাসী অনন্তদাসের (১৯৩৯—) প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ : সময় আমার কণ্ঠে, শত সূর্যের আলো, আমার নিজস্ব কোন দুঃখ নেই। বর্ধমান শহরের অধিবাসী অজিত ভট্টাচার্য (১৯৩৫—) লিখেছেন নীলাঞ্জনা ও সোনালী মেয়ে, বর্ধমানেশ্বরের মাহাত্ম্য, যে আকাশ নিঃস্ব আমার, কবিতা এখানে প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ নীলাঞ্জনা ও পিপাসা মঙ্গল নামে উপন্যাস, বর্ধমানের ইতিহাস প্রভৃতি। আসানসোল নিবাসী অহিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৪৩—) রচিত কাব্য : প্রতিবিম্ব, অনুরণন। বাজে প্রতাপপুর নিবাসী আদিত্যনাথ নাগের (১৯৩৩—) প্রকাশিত কাব্য : নাম রেখেছি হুটপটাং। বর্ধমান শহরে পীর বাহরাম রোডের অধিবাসী অবদুল গণিখান কবি ও প্রবন্ধকার হিসাবে খ্যাত। ফেরারী, মাটির সুর, মুখর প্রহর, কৃতজ্ঞতার বুকে মণিকণিকা প্রভৃতি কাব্য এবং শহীদের হার, ধরার নবী, হজরত পীর বাহরাম ও বর্ধমানে নূরজাহান বেগম নামে প্রবন্ধ গ্রন্থ তাঁরই রচনা। চুরুলিয়া গ্রাম নিবাসী কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী (১৯৪১—) নগদ কবিতার মূল্যে নামে একটি কাব্য রচনা করেছেন। কাজী গোলাম গউস সিদ্দিকীর (১৯৫৭—), জন্ম আসানসোল শহরে (১৯৫৭—), তাঁর পৈতৃক নিবাস চুরুলিয়া। তাঁর প্রকাশিত কাব্য : এখানে ঈশ্বর। ক্ষীরগ্রাম নিবাসী সঞ্জীব কুমার বন্ধু রচিত কাব্যগ্রন্থ : শিখার কালি মধুময়, আকাশ ও মাটি, পোড়ো জমি, এ পৃথিবী আরো কিছু অনন্য হৃদয় প্রভৃতি। শক্তিগড়ের নিকটবর্তী পুতুণ্ডা গ্রামের অধিবাসী বর্তমানে আসানসোল নিবাসী প্রফুল্লকুমার অধিকারীর (১৩৩৩—) প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : ধূসর শতাব্দীর কবিতা, নগ্ন নক্ষত্রের নীচে, হৃৎপিণ্ডে শব্দের বেহালা। দুর্গাপুর-আমরাই নিবাসী পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৩৪২—) প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : পত্রলেখা। বাঘনাপাড়ার অধিবাসী রাণীগঞ্জ টি. ডি. বি. কলেজের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৩৩৯—) প্রকাশিত কাব্য : শালবন, নিহত প্রতিমাগুলি। জামালপুর থানার অন্তর্গত মহিষ গড়িয়ার অধিবাসী বিজনদাস (১৩৬১—) একজন শিশু সাহিত্যিক। বহু

সাম্প্রতিক কবিতা লেখক

পত্রিকায় তিনি ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত ছড়া-সংকলন : মিষ্টি ছড়ার বৃষ্টি। রায়না থানার অন্তর্গত পাঁইটা গ্রাম নিবাসী অনুপ্রাস বিশারদ বিমলাপদ দত্তর (১৩১৪—) প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ : অনুপ্রাস-মালা। কেতুগ্রামের নিকটে চরখী গ্রামে জন্ম কবি মেহবুবা খান (১৩৬১—) গৃহকর্ত্রী হয়েও কবিতারচনা থেকে বিরত হন নি। তাঁর প্রকাশিত কাব্য : পৃথিবীর প্রচ্ছদ, পরশমণি। কবি সুধেন্দু মল্লিকের (১৯৩৫—) পৈতৃক নিবাস কোগ্রাম। তিনি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের পৌত্র ও জ্যোৎস্নানাথ মল্লিকের পুত্র। তাঁর রচিত কাব্য : হিরণ্ময় অন্ধকার, বৃষ্টিতে করেছো বৃষ্টি, কেয়াকে সর্বস্ব, সঙ্গে আমার বালকবৃত্ত।

কবিগান পাঁচালীগান ও যাত্রা গানে বর্ধমান

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ বণিকের রাজদণ্ড হাতে অভ্যুদয়ের ফলে আভিজাত্য ও শিক্ষার গৌরব বর্জিত নূতন ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য কবিগানের অভ্যুদয়। মুখে মুখে গান বা কবিতা রচনা করে এবং খোলা আসরে পরিবেশন করে এঁরা জনসাধারণকে আনন্দ দিতেন। দুই কবিদলের লড়াই বিশেষভাবে উপভোগ্য ছিল। কবিগান, পাঁচালী গান ও যাত্রাগান বঙ্গ-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। কবিগানে বর্ধমান একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে।

প্রথম যুগের কবিওয়ালাদের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে দুজন বর্ধমানের সন্তান। এই দুজন ভবানী বেনে ও নবাই ময়রা অত্যন্ত উচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন। ভবানীচরণ বণিক বা ভবানী বেনের আদি নিবাস ছিল অম্বিকা কালনায়, পরে তিনি কলকাতার বরাহনগরে বসবাস করেন। ভবানী ছিলেন গন্ধবণিক জাতীয়। তিনি কবির দল করে অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই লাভ করেছিলেন। নিতাই বৈরাগী ও ভবানী বেনের কবির লড়াই সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল। ভবানীর অধিকাংশ গানই লুপ্ত হয়ে গেছে। যে কয়টি গান পাওয়া গেছে, তাতে রাধিকার বিরহব্যথা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

নবাই ময়রা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ থানার (বর্তমান মন্তেশ্বর থানার) খেরুর গ্রামে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি মালডাঙ্গার হাটে গঙ্গা ময়রার দোকানে মাসিক তিন টাকা বেতনে চাকরি

করতেন। একদিন ভিয়ান করার সময়ে গান রচনা করতে গিয়ে তিনি ভিয়ান নষ্ট করে মনিবের দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ায় চাকরি ত্যাগ করেন এবং কবির দল গঠন করেন। তিনি চণ্ডীর গান করতেন। বর্ধমানের শ্রেষ্ঠ চণ্ডীগায়ক রাম-নারায়ণ স্বর্ণকার, খেরুর গ্রামনিবাসী শ্রীনিবাস তন্তুবায় এবং খেরুর গ্রামের বৈদ্যনাথ রায় ছিলেন তাঁর কবি গানের গায়ক, দোহার ও সাহায্যকারী।

নবাই ছিলেন ভক্ত ও সাধক। তাঁর গানে বিষয় বৈচিত্র পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদ কমলাকান্তের ধারা অনুসরণ করে তিনি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন এবং গেয়েছেন। ভক্তের আকুতি তাঁর গানে সর্বত্র পরিস্ফুট। জননীর নিকট সন্তানের মান অভিমান আবেদন নিবেদন তাঁর রচনায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

নবাই শক্তিসাধক হলেও তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি বৈষ্ণব গীতিও রচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে শ্যাম ও শ্যামা অভিন্ন। শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতা প্রতিপাদক নবাই এর একটি বিখ্যাত সঙ্গীত :

হৃদয়-রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
(একবার) হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
নর কর কটি বেড়া ত্যজে পর মা পীতধরা
মস্তকেতে দে মা মোহন চূড়া, মুক্তবেণী লুকাইয়ে।
ত্যজে নর-মুণ্ডমালা, গলে পর মা বনমালা
কালী ছেড়ে হও মা কালা
(দাঁড়াও) চরণে চরণ থুয়ে॥
হৃদ্মাঝারে কাল শশী, দেখতে বড় ভালবাসি
অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী নবাই প্রতি সদয় হয়ে॥[১]

ভিড়িঙ্গী গ্রামের মহানন্দ মণ্ডল কবিগানের দল করেছিলেন। এই দল বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। লেটো ও পৌরাণিক পালাগানের দল করেছিলেন আড়া গ্রামের লক্ষ্মণ দাস, জলধর বাগদি ও গোপাল বাগ্‌দির সম্প্রদায়। কুলডিহার ছবিলাল বাগ্‌দি ও কাশীগঞ্জের রাখাল দাস গড়াই মনসামঙ্গল গানের দল করেছিলেন। ঝুমুর গানের দল করে খ্যাতি অর্জন

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য—নিরঞ্জন চক্রবর্তী পৃঃ ১২১-২৩।

করেছিলেন কাঁটাবেড়া গ্রামের খেলা দাসী ও রামপ্রসাদ পুরের ভাদু ডোম।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী গানের শ্রেষ্ঠ কবি দাশরথি রায় ১২১২ বঙ্গাব্দের (১৮০৬ খ্রীঃ) মাঘ মাসে কাটোয়ার নিকটবর্তী বাঁধমূড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবীপ্রসাদ, মাতা শ্রীমতী। নিকটবর্তী পীলা গ্রামে মাতুলালয়ে মাতুল রামজীবন চক্রবর্তীর গৃহে তিনি পরিবর্ধিত হন এবং পরে পীলা গ্রামেই স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়নের পরে পীলা গ্রামের নিকটবর্তী বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্যের কাছে ইংরাজী শিক্ষা করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত পুরাণাদিতেও পারদর্শিতা অর্জন করেন। পীলা গ্রামে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠীতে কিছুকাল চাকরি করার পর কবির দলে যোগ দেন। রেশম কুঠীতে কর্মরতা স্বামিপরিত্যক্তা সুন্দরী অক্ষয় বাইতিনী (আকা বাঈ) কবির দল করেছিলেন। দাশরথি বাঁধনদার হিসাবে যোগ দেন। এইজন্য তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন এবং স্বজনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। কবির আসরে তিনি স্বরচিত অশ্লীল পয়ার ত্রিপদী রচনা করে আবৃত্তি করে নিম্নশ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। পুরুষোত্তম দাস বৈরাগ্য, পুরুষোত্তমের শিষ্য রাধামোহন, নিধিরাম প্রভৃতি কবিয়ালাদের সঙ্গে দাশরথির কবির লড়াই হোত। এঁদের তীব্র ব্যঙ্গ ও কটূক্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে অক্ষয় বাইতিনীর কবির দল ত্যাগ করেন।

দাশরথি রায়

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দাশরথি পাঁচালীর দল খুলেছিলেন। ক্রমে তিনি পাঁচালী গানে প্রভূত খ্যাতি এবং অর্থ উপার্জন করেন এবং বত্রিশ বৎসর বয়সে প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করে পীলা গ্রামেই বসবাস করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক, রামচন্দ্র বিষয়ক, শিবশক্তি বিষয়ক ও সমাজ বিষয়ক প্রায় ষাটটি পালা রচনা ছাড়াও দাশরথি বিবিধ বিষয়ে বহু সঙ্গীত রচনা করে শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে কবি-কল্পনার সংমিশ্রণে দাশরথির পাঁচালী কাব্য বিচিত্র রস পরিবেশন করেছে। বৈষ্ণবতা তাঁর

১। দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পাঁচালীকে আরও হাস্য করে তুলেছিল। ছন্দের বৈচিত্র্য অনুভবের গভীরতা, যুগোপযোগী বিষয় নির্বাচন রঙ্গরসিকতা, ভক্তিভাব, রসের বৈচিত্র্য এবং শব্দালংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ দাশরথির পাঁচালীকে সকল শ্রোতার অন্তরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ১৮৫৭ সালের ১৬ই অক্টোবর দাশরথি পরলোক গমন করেন।

বর্ধমানের কৃষ্ণমোহন গাঙ্গুলী পাঁচালীর দল করেছিলেন। কিন্তু তিনি দাশরথির মত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি।[১] পাঁচালী গানের

কৃষ্ণধন দে

অন্যতম কবি কৃষ্ণধন দে। কবির পিতামহের নাম পরাণচন্দ্র দে, পিতা—রামচন্দ্র দে। কবিরা তিন ভ্রাতা— কৃষ্ণধন, বিষ্ণু ও রাম। তাঁরা ছিলেন জাতিতে বণিক। কবির নিবাস ছিল কাটোয়া। কবি তাঁর পাঁচালীতে লিখেছেন—

জেলা যথা বর্ধমান রাজবাড়ী বর্তমান
খ্যাত বর্ধমানে মহারাজা
জেলা অন্তর্গত পূর্ব মহকুমাটি অপূর্ব
কাটোয়ার আমি ক্ষুদ্র প্রজা॥

কৃষ্ণধন বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। দাশরথির পাঁচালী গানের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। দাশরথির আদর্শেই তিনি পাঁচালী রচনাও গান করতেন। তাঁর গানেও দাশরথির প্রভাব ব্যাপক। কিন্তু তিনি রঙ্গব্যঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়ে পুরাণাশ্রিত কাহিনী ও রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বর্ণনাতেই অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব তাঁর গানে অত্যন্ত গভীর। রাধাকৃষ্ণের একদেহে গৌরাঙ্গ অবতারের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। আবার শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতাও তাঁর গানে যেমন প্রকট তেমনি কবির ভক্তিনতচিত্তে শ্যামাসঙ্গীতও নবরূপ লাভ করেছে।

যেমন— কালী কুলাও ভবের কূলে।
দে মা পদতরী তবেই তরি নইলে ডুবি অকূলে॥
দুকূল পাথার না জানি সাঁতার পারকর এ ব্যাকুলে।

বড়াইকে নিয়ে তিনি কিছু রঙ্গরস পরিবেশন করেছেন ঠিকই, কিন্তু চটুলতা

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী পৃঃ ১০৪—৩৯ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৬০৯ - ৮৯।

অপেক্ষা অশ্লীলতা পরিহার করে তিনি ভক্তিতদ্গত চিত্তে ধর্মকথাকেই পরিবেশন করেছেন।[১]

আধুনিক যাত্রাগানে বর্ধমানের দান অসামান্য। বর্ধমানকেই বাঙ্গালার যাত্রাগানের কেন্দ্র বলা যেতে পারে। কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন যাত্রা বাঙ্গালার যাত্রাগানের আদি রূপ। শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ দাস, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কালিয়দমন যাত্রার অনুসরণে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা, নলদময়ন্তী যাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে যাত্রাগান প্রচলিত হতে থাকে। এই সময়ে বর্ধমানের লাউসেন বড়াল মনসার ভাসান যাত্রায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সখের যাত্রাগান প্রচলিত হয়। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা এই সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সঙ্গীতবহুল যাত্রাগানের সঙ্গে থিয়েটারের রীতি মিশ্রিত করে সৃষ্টি হয় গীতাভিনয় যাত্রার। বর্ধমান রাজ আখ্‌তাব চাঁদের অনুগৃহীত লালামানিক চন্দ্‌কাপুর বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন (১২৮৮)।[২]

যাত্রাগান

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যাত্রাগানের দুটি ধারা সমান্তরাল ভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে—এই দুইটি ধারা কৃষ্ণযাত্রা ও গীতাভিনয় যাত্রা। এই দুই প্রকার যাত্রাতেই বর্ধমান উচ্চ আসন অধিকার করেছে। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রভাবে যাত্রাগানের সকল শাখাতেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী ও ভাঁড়ামি অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এই দূষিত রুচির কবল থেকে যাত্রাকে উদ্ধার করার প্রয়াস দেখা যায় উনিশ শতকের শেষভাগে। গীতাভিনয় যাত্রায় হরিমোহন কর্মকার, চন্দন নগরের মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বলাগড়ের ব্রজমোহন রায় প্রভৃতি এবং কৃষ্ণযাত্রায় নদীয়া জেলার ভজন ঘাটের কৃষ্ণকমল গোস্বামী উন্নত রুচি প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

সকল প্রকার ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতা থেকে গীতাভিনয় যাত্রাকে মুক্ত করে উচ্চাঙ্গের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে পরিণত করেন মতিলাল রায়। রাজশাহী

১। উনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য ১৯৯–২০৮।

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড।

জেলার পীরগাছা থেকে আগত বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী ভাতশালা গ্রাম নিবাসী কাশীনাথ রায়ের তৃতীয়পুত্র মনোহর রায় ও কাশীশ্বরী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র মতিলাল রায় ১২৪৯ বঙ্গাব্দে (১৮৪৩ খ্রীঃ) ভাতশালায় জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৭৮ সালে পারুলিয়ার গঞ্জে নিকটবর্তী দোগাছিয়া নিবাসী হরিনারায়ণ রায়ের যাত্রা শুনে তিনি যাত্রাগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হরিনারায়ণের যাত্রাদলে যোগদান করেন। তাঁর পরিচালনায় হরিনারায়ণের সখের যাত্রাদল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রীঃ) মতিলাল নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায় নামে যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দল মতি রায়ের যাত্রা নামে প্রসিদ্ধ হয়। মতিলাল স্বয়ং পালা রচনা করে অভিনেতাদের শিক্ষা দিয়ে পরিচালনা করে এবং মুনি ঋষির ভূমিকায় অভিনয় করে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং বহির্বঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

মতিলাল রায়

রামায়ণ মহাভারত ও বিবিধপুরাণ থেকে কাহিনী গ্রহণ করে ত্রিশটিরও অধিক পালা এবং পালাগুলিতে ব্যবহৃত সহস্রাধিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। থিয়েটারের ঢঙে গদ্যসংলাপের সঙ্গে বহুসংখ্যক গান যুক্ত করে মতিলাল গীতাভিনয় রচনা করেছেন। কথকতার ঢঙে পুরাণ কথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি যাত্রার মাধ্যমে যুগোপযোগী লোক শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালীর প্রভাব ও তাঁর যাত্রাপালায় গভীর। নৃত্যগীত, বাদ্য, থিয়েটার ও কথকতার সম্মিলনে মতিরায়ের যাত্রা উচ্চাঙ্গের ধর্মভাবাশ্রিত লোকশিক্ষামূলক প্রমোদকর অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। মতিলাল রায় আধুনিক যাত্রাগানের গুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে মতিলালের জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মদাস রায়ের উপরে দল পরিচালনার ভার অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩১৫ সালের ৪ঠা পৌষ কাশীতে মতিলালের মৃত্যু হয়। ধর্মদাস (১৮৬৯—১৯১৯) অসুস্থ হওয়ায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দে দল পরিচালনার ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের হাতে অর্পণ করেন। অভিনয় দক্ষতায় এবং দল পরিচালনায় ধর্মদাস পিতার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ধর্মদাস অন্ততঃ বারোটি গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন। পালা রচনায় ও অভিনয়ে তিনি পিতৃপদাংক অনুসরণ করেছিলেন। ভূপেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১২৯১

ধর্মদাস রায়

বঙ্গাব্দে (১৮৮৪ খ্রীঃ) ভাতশালা গ্রামে, তাঁর মৃত্যু হয় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। তিনিও মতিধর্মের পদাংক আশ্রয় করে যাত্রা জগতে প্রবিষ্ট হলেও তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে পালায় আঙ্গিকের প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তিনি ক্রমশঃ নাট্যগুণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সঙ্গীতের সংখ্যা হ্রাস করেছেন। কিন্তু মতি রায়ের যাত্রার ঐতিহ্য রক্ষা করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। ক্রমে আধুনিক রুচির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে বিপুল ঋণভারে জর্জরিত হওয়ায় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে যাত্রাদল তুলে দিয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনারায়ণ রচনা করেছিলেন ষোলটি গীতাভিনয়। তিনিও প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। মতিরায়ের সমকক্ষ না হলেও ধর্মদাস ও ভূপেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই কবি, দক্ষ অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক ছিলেন। মতি রায়ের যাত্রা প্রায় ষাট বৎসর লোকশিক্ষা সহ জনসাধারণকে আনন্দ দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় যুগধর্মের প্রভাবে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়

মতিলাল রায়ের রচনাবলী: ভরতাগমন, সীতাহরণ, সীতা অন্বেষণ, রাবণবধ, রামরাজা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণবধ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, ব্রজলী কালিয়দমন, শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য, বিজয়চণ্ডী, সুবচনী মাহাত্ম্য প্রভৃতি। কবচ সংহার, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা বর্জন, কুন্তীর শিব সাধনা, শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা, ভাগীরথী মহিমা, চিন্তার চিন্তামণি লাভ প্রভৃতি গীতাভিনয়গুলি ধর্মদাসের রচনা। ভূপেন্দ্রনারায়ণ লিখেছিলেন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীশ্রীকিশোরী লীলা বা ধর্মযজ্ঞ, মহর্ষি দধীচির আত্মোৎসর্গ, রাজর্ষি মনোজবের মহামুক্তি, অন্ধকাসুরবধ, তপতী সংবরণ প্রভৃতি ভূপেন্দ্রনারায়ণ রচিত যাত্রাপালা। তিনপুরুষের অধিনায়কত্বে মতি রায়ের যাত্রা বাঙ্গালা যাত্রাগানের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

মতি রায়ের যাত্রার বিপুল জনপ্রিয়তা হেতু পূর্ব ও পশ্চিবঙ্গে বহু যাত্রাদল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যাত্রাদলগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলায় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ যাত্রাদল গঠিত হওয়ায় এই জেলা গানের ইতিহাসে গৌরবজনক আসনে অধিষ্ঠিত হয়। রায়ের খুল্লতাত হরিচরণ রায়ের পুত্র ব্রজমোহন রায় মতিরায়ের দল ভাঙিয়ে নিয়ে কলিকাতার নিমতলায় পৃথক দল গঠন করেন ১৩০১ থেকে ১৩০৫ সালের মধ্যে। মতিরায়ের মত

ব্রজমোহন রায়

নারদের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাশীখণ্ড ও জানকীর অগ্নিপরীক্ষা পালা জনপ্রিয় হয়েছিল।

মতি রায়ের সমকালে তাঁরই যাত্রা রীতি অনুসরণ করে পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী কোক্‌সিলমা গ্রাম নিবাসী অহিভূষণ ভট্টাচার্য কলিকাতার হরিতকি বাগানে যাত্রাদল গঠন করে স্বরচিত গীতাভিনয় অভিনয় করতেন। তাঁর তুলসীলীলা, দণ্ডীপর্ব, বিরাট পর্ব বা উত্তরা পরিণয়, ব্রজলীলা অবসান বা রাই উন্মাদিনী, স্থরযোদ্ধার, রামাশ্বমেধ, ধর্মলীলা প্রভৃতি গীতাভিনয় গুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সাঁতরা বাবুরা অহিভূষণের দলে টাকার যোগান দিতেন। শেষ পর্যন্ত সাঁতরা বাবুরা এই দলটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দলটি সাঁতরা এণ্ড্‌ কোম্পানী বা সাঁতরা কোম্পানীর যাত্রাদল নামে পরিচিত হয়। অহিভূষণের সঙ্গে সাঁতরা কোম্পানীর যাত্রাদলের আমৃত্যু (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) সংযোগ ছিল এবং তাঁর সমস্ত পালাই এই দলে অভিনীত হয়েছে।

অহিভূষণ ভট্টাচায

মতিলাল রায়ের সমকালেই অম্বিকা কালনার পুরাতন হাটের অধিবাসী শশিভূষণ অধিকারীর যাত্রাদল প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। কালনার অভয় বাগদী স্থানীয় কিছু লোক নিয়ে একটি যাত্রাদল খুলেছিলেন। শোনা যায়, শশী বাল্যকালে অভয় বাগদীর দলে এবং মতি রায়ের দলে নাচিয়ে ছিলেন। পরে কালনার চক্‌বাজারে ষোল কুঠুরিতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে যাত্রাদল প্রতিষ্ঠা করেন। শশী অধিকারীর যাত্রাদলের খ্যাতি প্রসারিত হলে তিনি কলিকাতার পাথুরে ঘাটা স্ট্রীটে অফিস স্থানান্তরিত করেছিলেন। শশীর দলে শতাধিক লোক ছিল। জুড়ি এবং ছেলের গান ছাড়াও বিবেকের গানের ভিনি প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক। জনরুচির পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে শশী তাঁর যাত্রাদলকে গীতাভিনয় যাত্রা থেকে থিয়েট্রিক্যাল পার্টিতে রূপান্তরিত করেন। ধনকৃষ্ণ সেন প্রণীত জটিল বা উমাতারা গীতাভিনয়, মতিলাল ঘোষের বৃন্দাবন বিহার ও দ্বারাবতী, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দেবব্রত, অঘোর কাব্যতীর্থ শাস্তি প্রভৃতি পালাগুলি তাঁর দলে অভিনীত হয়েছিল। প্রতাপাদিত্য পালা ব্রিটিশ সরকারের রোষে নিষিদ্ধ হয়। যাত্রাদল চালাতে গিয়ে শশী নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন।

শশী অধিকারী

মতিলালের সমসাময়িক পীতাম্বর পাইন একটি যাত্রা দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পীতাম্বরের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায়। এই দল পাইন কোম্পানীর যাত্রাদল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পীতাম্বর নিজে গান লিখতেন। এই দলে ধনকৃষ্ণ সেন রচিত সত্যনারায়ণ লীলা পালা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পাইন কোম্পানী

কালনা থানার অন্তর্গত আনুখাল গ্রাম নিবাসী ভূষণ দাস মতিলাল রায়ের জীবৎকালেই যাত্রাদল করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আনুখাল গ্রামের তারিণী পালের যাত্রাদলে ভূষণ অভিনয় করতেন। পরে তিনি পৃথকভাবে যাত্রাদল গঠন করেন। তাঁর যাত্রাদলের অফিস ছিল কলিকাতার নাথের বাগানে। ভূষণ ছিলেন উৎকৃষ্ট গায়ক। জুড়িদের মধ্যে অথবা এককভাবে তিনি আসরে গান করতেন। মতিলাল ঘোষের বুদ্ধলীলা, লক্ষ্মণ বর্জন, পরশুরাম, ধ্রুব প্রভৃতি পালাগুলি ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হয়েছিল। এই দলের জনপ্রিয় পালা মাতৃপূজা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ভূষণের মৃত্যুর (আঃ ১৩২৩) পর তাঁর দল অপেরা পার্টিতে রূপান্তরিত হয়।

ভূষণ দাস

বর্ধমান জেলার মঞ্জিলা (আধুনিক সন্তোষপুর, পোঃ বলগণা) গ্রামের অধিবাসী শশী হাজরার যাত্রাদল 'শান্তি সম্প্রদায়'ও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রথমে পুরাতন রীতিতে যাত্রা গান করলেও শশী হাজরার দল পরে অপেরা পার্টিতে পরিণত হয়। স্বগৃহে তিনি আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে (১৩৩২—৩৩ সাল) তাঁর যাত্রাদলের বিলোপ ঘটে। এক বৎসর দল চালিয়েছিলেন ম্যানেজার নিত্যগোপাল রায়। মান্ধাতা, প্রতিজ্ঞাপালন, শ্রীদুর্গা, দ্রোণসংহার, মা, জয়দ্রথ বধ প্রভৃতি পালা এই দলের জনপ্রিয় পালা ছিল।

শশী হাজরা

চন্দননগরের প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রাদল কিনে নিয়েছিলেন কালনার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গণেশ ঘোষ। গণেশের জামাতা ডেরেটোন গ্রাম নিবাসী হরিপদ কুমার ছিলেন এই দলের পরিচালক ও ম্যানেজার। গণেশের যাত্রাদল প্রথমে প্রাচীন রীতিকেই আশ্রয় করেছিল। মথুর সাহা তাঁর যাত্রাদলকে থিয়েট্রিক্যাল অপেরা পার্টিতে রূপান্তরিত করায় হরিপদও গণেশ ঘোষের যাত্রাদলকে গণেশ অপেরা পার্টিতে

গণেশ অপেরাপার্টি

পরিণত করেন। হরিপদর সুদক্ষ পরিচালনায় লোকসান পূরণ করে গণেশ অপেরা পার্টি লাভ করতে থাকে। পরে গণেশ ঘোষ জামাতাকে যাত্রাদলের স্বত্ব দান করেন। হারাধন রায়ের ধর্মের জয় ও অন্যান্য পালাগুলি গণেশের দলে অভিনীত হয়। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর কালচক্র, পৃথিবী প্রভৃতি পালাগুলি গণেশের দলে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। হরিপদর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ যাত্রাদল বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।

প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রাদল বিক্রীত হওয়ার পরে ম্যানেজার ও অভিনেতা সতীশ মুখোপাধ্যায় নিজে একটি যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দে।

সতীশ মুখোপাধ্যায়

সতীশের নিবাস ছিল বাঘনা পাড়ায়। প্রথমে তিনি রামলাল চাটুজ্যের যাত্রাদলে, পরে প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রাদলে অভিনয় করতেন। তাঁর যাত্রাদলের নাম হয় রামকৃষ্ণ নাট্য সমিতি। আহিরীটোলায় নাথের বাগানে ছিল তাঁর যাত্রাদলের অফিস। হারাধন রায় ও অন্যান্য লেখকের রচিত পালা সতীশের দলে অভিনীত হোত। শেষ ৮।১০ বৎসর সতীশ তাঁর যাত্রাদলকে অপেরা পার্টিতে রূপান্তরিত করেন। সতীশের অপেরা পার্টিতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবিনোদ, বড় ফণী নামে প্রসিদ্ধ) অভিনয় করতেন। ফণি ভূষণের 'মধ্যাহ্নে সূর্যাস্ত' পালা অপেরা পার্টিতে প্রথম অভিনীত হয়। ১৩৩৬ সালে এই দলের বিলুপ্তি ঘটে। ১৩৫২ সালে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে সতীশের মৃত্যু হয়।

উনিশ শতকে কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন যাত্রার নব রূপান্তর ঘটেছিল। গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রাকে নূতন রূপে সজ্জিত করেছিলেন। সেকালে কৃষ্ণযাত্রা ও গীতাভিনয় যাত্রা সমান্তরালভাবে জনচিত্ত বিনোদন করেছিল।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণযাত্রা

মতিলাল রায়ের সমকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু গোবিন্দ অধিকারীর বর্ধমান জেলার অণ্ডালের নিকটবর্তী ধবনী গ্রামবাসী বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সাধক কবি নীলকণ্ঠ কৃষ্ণযাত্রা করে প্রভূত সম্মান ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। নীলকণ্ঠ প্রথম জীবনে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার দলে গান করতেন, পরে তিনি পৃথক দল করে সুকণ্ঠের গানে ও কৃষ্ণলীলা পরিবেশনে শ্রোতাদের মাতিয়েছিলেন। চণ্ডালিনী উদ্ধার, প্রভাস যজ্ঞ, কংস বধ, যযাতির যজ্ঞ, মান, মাথুর ও কলংক-ভঞ্জন—এই সাতটি পালা রচনা করে অভিনয় করেছিলেন। তিনি বহু বৈষ্ণব

সঙ্গীত ও শাক্ত সঙ্গীতেরও রচয়িতা। নীলকণ্ঠের জন্ম ১২৪৮ সালের ৬ই মাঘ, মৃত্যু ১৩১৮ সালের ২০শে শ্রাবণ। কৃষ্ণযাত্রায় তিনিই শেষ উজ্জ্বল দীপ শিখা।

নীলকণ্ঠের তিরোধানের পর তাঁর পুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণযাত্রার দল চালিয়েছিলেন। নীলকণ্ঠের উত্তরাধিকার বজায় রেখেছিলেন তাঁরই দলের গায়ক হরেকৃষ্ণ বাগ। দুর্গাপুর থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে কালীগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী হরেকৃষ্ণ বাগ (১২৭০—আঃ ১৩২৪) নীলকণ্ঠের যাত্রাদলে রাধা, ললিতা, দূতী প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করতেন। পরে গুরু নীলকণ্ঠের অনুমতি নিয়ে পৃথক দল করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রায় পনেরো বৎসর দল চালিয়েছিলেন। পরে নীলকণ্ঠ পুনরায় তাঁকে স্বদলে গ্রহণ করায় হরেকৃষ্ণ ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপদ বাগের (১২৯০—১৩৫৪) উপরে নিজের দল পরিচালনার ভার অর্পণ করেছিলেন। নীলকণ্ঠের প্রায় সমবয়সী গোপাল চন্দ্র বাগ গোবিন্দ অধিকারীর দলে গান করতেন। পরে তিনি পৃথক কৃষ্ণযাত্রার দল করেছিলেন। গোপাল বাগের খুল্লতাত ভ্রাতা হরেকৃষ্ণ বাগ। গোবিন্দ বাগ মৃত্যুকাল পর্যন্ত পিতার দলের সুনাম বজায় রেখেছিলেন। তিনিও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রনাথ বাগ কৃষ্ণযাত্রার ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন।[১]

হরেকৃষ্ণ বাগ

বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুর নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রা করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই গোবিন্দ অধিকারীও কৃষ্ণযাত্রার পালা লিখতেন এবং গানও করতেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১২৭৪

গোবিন্দ অধিকারী

যাত্রাপালা বর্ধমান জেলায় রচিত হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। প্রাচীন ও আধুনিক রীতির যাত্রাগান পরিবেশনায় যেমন বর্ধমানের স্থান উচ্চে তেমনি যাত্রা-সাহিত্যেও বর্ধমান বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যেমন লিখেছিলেন কৃষ্ণযাত্রার পালা, তেমনি মতিলাল রায় ও তাঁর পুত্রদ্বয়, শশিভূষণ অধিকারী প্রভৃতি প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ প্রচুর যাত্রা পালা লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ধনকৃষ্ণ সেন, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রতিভাবান লেখকরাও প্রচুর পরিমাণে—যাত্রা-নাটক রচনা করেছেন।

১। কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, ডঃ গোপেশ চন্দ্র দত্ত।

উগ্র ক্ষত্রিয় জাতীয় রামপরাণ সেনের পুত্র ধনকৃষ্ণ সেন (১২৭১—১৩০৯ বঙ্গাব্দ) শক্তিগড়ের নিকটবর্তী খাঁড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বর্ধমান রাজ স্কুলের ছাত্র এবং সমুদ্রগড়ের তারাপ্রসন্ন রায়ের জমিদারীর ম্যানেজার। তিনি পাণ্ডব মিলন বা কর্ণ বধ, গোবর্ধন মিলন, অনুধ্বজের হরিসাধন, বিল্বমঙ্গল, রাবণের মোহমুক্তি, উমাতারা বা জটিল, অভিমন্যু বধ, সত্যনারায়ণ লীলা, হংসধ্বজের মহামুক্তি প্রভৃতি গীতাভিনয় ও যাত্রা নাট্যরচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ধনকৃষ্ণ সেন

আর একজন প্রতিভাবান যাত্রা নাটক লেখক ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী (১২৯৮—১৩৩৯) বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী রায়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন। ২০।২২টি যাত্রাপালার তিনি রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁকে কাব্যশাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর রচিত অধিকাংশ পালাই গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর বাসুকি নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর রচিত যাত্রা ও থিয়েটারের নাটক : কুবলাশ্ব (গীতাভিনয়), কালচক্র পৃথিবী, পঞ্চনদ, আদিশূর বিদ্ধ্যাবলী, জাহ্নবী, নরকাসুর, ধনুর্যজ্ঞ, দাক্ষিণাত্য, জগদ্ধাত্রী, যজ্ঞাহুতি, বাসুকি, অজাতশত্রু, জরাসন্ধ, ভগ্নপূজা প্রভৃতি।

মণ্ডেশ্বরের নিকটবর্তী দেনুড়গ্রাম নিবাসী বেণীমাধব ডাক্ষিৎ (১২৪০—১৩০৯) রাবণ বধ, মানভঞ্জন প্রভৃতি যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন। কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামনিবাসী বেনীমাধব চক্রবর্তী কাব্যবিনোদ (১৯১৭—১৯৭০) প্রেমের পূজা, যুগান্তর, কে সুলতান, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি যাত্রা-পালা রচনা করেছিলেন। বর্তমানে শম্ভু বাগ এবং করন্দা নিবাসী ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় জনপ্রিয় যাত্রাপালা লেখক।

নাট্যাভিনয়

জমিদার ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে আঢ়া গ্রামে রাঢ়েশ্বর অপেরা পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভোলানাথ সামন্ত, রাধারমণ প্রামাণিক, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যাসকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন এই দলের অভিনেতা। হরিশ্চন্দ্র বা শ্মশান মিলন, রিজিয়া, শ্রীবৎসচিন্তা প্রভৃতি পালাগুলির অভিনয়

এই দলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অণ্ডাল গ্রামের অধিবাসীরা গঠন করেছিলেন ধর্মরাজ অপেরা পার্টি। উমাপদ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণপদ রায়, রামপদ চট্টোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, জীতেন রায়, অনিশবরণ রায়, বিশ্বনাথ পাল প্রভৃতি এই দলে অভিনয় করতেন। প্রবীরার্জুন, মহামানব জরাসন্ধ, মায়াশক্তি, চন্দ্রহার ও রাজা সীতারাম পালা এই দলে অভিনীত হয়েছিল।

সুজড়া ও মেজেডিহির অধিবাসীরা সরস্বতীক্লাব নামে একটি যাত্রা ও থিয়েটার ক্লাব স্থাপন করেছিলেন। নরকাসুর, কম্বোজপতি, মিথিলায় ভগবান, জনা, প্রবীরার্জুন প্রভৃতি পালা এই ক্লাবের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। নবগোপাল ঘটক, পাঁচকড়ি ঘটক, বাদল বন্দ্যোপাধ্যায়, নকুলেশ্বর ঘটক, শৈলেন ঘটক, ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল ঘটক প্রভৃতি এই দলে অভিনয় করতেন। সরস্বতী ক্লাব পরে সর্বমঙ্গলা সমিতি নামে যাত্রাপালা ও নাটক অভিনয় করে। বঙ্গবীর, মায়ের দেশ প্রভৃতি যাত্রাপালা এবং কর্ণার্জুন, মোহনলাল, দুই পুরুষ, নাচমহল, পথের শেষে প্রভৃতি নাটক থিয়েটারের মঞ্চে অভিনীত হয়।

বীণাপানি নাট্যসমাজ দুর্গাপুর অঞ্চলে নাট্যাভিনয়ের পথিকৃৎ। গোপালপুর গ্রামে এই থিয়েটার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারেশ মিশ্র, ব্রহ্মানন্দ দত্ত প্রমুখ নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিরা এই নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন। কর্ণার্জুন, প্রবীরার্জুন, জনা প্রভৃতি নাটক এই সংস্থার দ্বারা অভিনীত হয়। নাচন গ্রামের অধিবাসীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নাচন নাট্যসমাজ। এই দলের পরিচালক ছিলেন বাণ্ডেশ্বর গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় সাহা। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বহুগ্রামে এই দলের অভিনয় জনপ্রিয় হয়। বভ্রুবাহন, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন, বীণাপানি প্রভৃতি পালা এই দলে অভিনীত হয়। এই দলে নাম পরে পরিবর্তিত হয়ে হয় নবজাগরণ সঙ্ঘ ও নাট্যসমাজ। দত্তা, উর্মিলা, সিরাজদ্দৌলা, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি নাটক নাম পরিবর্তনের পরে অভিনীত হয়।

সংস্কৃত চর্চায় বর্ধমান

বর্ধমানে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস বহু প্রাচীন। কিন্তু সুদূর অতীত থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় সংস্কৃত চর্চার যে ব্যাপকতা তা সন্দেহাতীত

হলেও তার ইতিহাস রচনা যথেষ্ট তথ্যের অভাবে প্রায় অসম্ভব। খ্রীষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে বর্ধমান ভুক্তির সংস্কৃত চর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটি গ্রামে সেনবংশীয় সম্রাট বল্লাল সেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। শাসনটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। যদিও রচয়িতার নাম অনুশাসনে অনুল্লিখিত, তথাপি লেখক বর্ধমান অঞ্চলেরই কোন পণ্ডিত, এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। অন্ততঃপক্ষে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের যে সংস্কৃত ভাষায় বৈদগ্ধ্য ছিল তার প্রমাণ এই অনুশাসন। অনুশাসনের সূচনায় অর্ধনারীশ্বরের (হরপার্বতীর) বন্দনায় কবিত্বের প্রকাশ আছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

সন্ধ্যাতাণ্ডব সন্বিধান বিলসন্নান্দী নিনাদোর্মিভি-
র্নির্মর্যাদরসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্ধে ললিতাঙ্গহারবলয়ৈরর্ধে চ ভীমোদ্ভটৈ-
নাট্যারম্ভরয়ৈর্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানু রোধশ্রমঃ॥[১]

—প্রলয়কালীন সন্ধ্যায় তাণ্ডবনৃত্যযুক্ত, সন্দীগীতির সুরের উর্মিদ্বারা যাঁর অসীম আনন্দসিন্ধু উল্লসিত, যাঁর অর্ধাঙ্গে মধুর অপাঙ্গদৃষ্টিজনিত বলয়, অপরার্ধে উদ্ভট নৃত্যারম্ভের জন্য ভয়ংকরতা, এই দ্বিবিধ অভিনয় জনিত শ্রম যিনি জয় করেন, সেই অর্ধনারীশ্বর তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন।

গদ্য পদ্যে রচিত প্রাক্-বঙ্গ অক্ষরে লিখিত এই গ্রামদান অনুশাসন সামগ্রিক ভাবেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। প্রদত্ত গ্রামটি বাল্লাহিট্ঠা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তর রাঢ়মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত স্বল্পদক্ষিণ বীথিতে অবস্থিত ছিল। সে সময়ে অপভ্রংশ ভাষায় খোলস ছেড়ে বাঙ্গালা ভাষা জন্মগ্রহণ করেছে। নবজাত বঙ্গভাষায় চর্যাগীতিগুলি পূর্বেই রচিত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষার অনুশাসন জনগণের মধ্যে সংস্কৃত চর্চার ব্যাপকতার ইঙ্গিত প্রদান করে।

মহাপণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্রকার রাজা হরিবর্মাদেবের (১১।১২শ শতাব্দী) মহামন্ত্রী ভবদেব ভট্ট ছিলেন উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী। ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে—

"আর্যাবর্তভুবাং ভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্বাগ্রিমো গ্রামঃ সিদ্ধল।"[২]

১। Inscriptions of Bengal—Vol. III—Ed. N. G. Mazumdar.

২। Inscriptions of Bengal—Vol. III

—আর্যাবর্তের ভূষণরূপে খ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রাম নিদ্ধল। ভোজ বর্মণের বেলাব তাম্রশাসনে ও উত্তর রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ আছে—"উত্তর রাঢ়ায়াং সিদ্ধল গ্রামীয় পীতাম্বর দেবঃ[১]।"—উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর। উত্তর রাঢ় বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত একটি মণ্ডল ছিল। সিদ্ধল কাটোয়ার নিকটবর্তী সিদ্ধি গ্রামের প্রাচীন নাম হওয়া অসম্ভব নয়। কারো মতে বর্ধমান জেলার শীতল গ্রামই সিদ্ধল গ্রাম। কাটোয়া নেহাটী—ঝামাটপুর সংস্কৃত চর্চার জন্য খ্যাত ছিল। ভাবদেবের রচিত স্মৃতিশাস্ত্র আজও ভবদেব পদ্ধতি নামে প্রসিদ্ধ। মল্লসারুল তাম্রশাসনও সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ নামে উপপুরাণটি যে বঙ্গদেশে রচিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ কম। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় এই পুরাণে ত্রিবেণীর বর্ণনা থাকায় পুরাণটি ত্রিবেণীর নিকটবর্তী কোন স্থানে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন যে এই পুরাণে উল্লিখিত বেতস হুগলী জেলায় ছিল না, বর্ধমান জেলায় ছিল। তাছাড়া "কবির জ্ঞাতিরা তদঞ্চলে বর্ধমান জেলার পূর্বোত্তর অংশে বাস করিতেন।"[২] এই পুরাণে যে ছত্রিশ জাতির উল্লেখ আছে তা রাঢ় অঞ্চলেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং পুরাণটি বর্ধমান জেলার পূর্বাঞ্চলে রচিত হয়েছিল, এ অনুমান নিরর্থক নয়। আচার্য রায়ের মতে পুরাণটি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল।[৩]

এযাবৎ প্রাপ্ত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম কাব্য চর্যাপদ। চর্যাপদের পরবর্তীস্তরের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। ভাষার প্রাচীনত্বের বিচারে এই কাব্যকে খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর রচনা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। এই কাব্যের রচয়িতা চণ্ডীদাস, ভণিতা থেকে অনুমান হয় বড়ু তাঁর উপাধি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পরিচয় অদ্যাপি অজ্ঞাত। কেতুগ্রাম নিবাসী নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের গণমার্তণ্ড নামে গণপাঠের যে বৃত্তি রচনা করেছিলেন, তাতে নৃসিংহ তাঁর পূর্বপুরুষ কবি—সূর্য চণ্ডীদাসের উল্লেখ করেছেন। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

ধীর শ্রীলনৃসিংহজে মুখকুলে জাতঃ কবীনাংরবি-
বিদ্যানামনুকম্পয়া বিতরণে মহাং সু পর্বক্রমঃ।

১। তদেব
২-৩। পূজাপার্বণ—১৫৭-৫৯

নানা শাস্ত্র বিচারচারুচতুরোঽলঙ্কারটীকাকৃতি-
ভট্টচার্যশিরোমণির্বিজয়তে শ্রীচণ্ডীদাসাভিধঃ ॥

—মুখুটিকুলে ধীর নৃসিংহের বংশে জাত, কবিদের মধ্যে সূর্যস্বরূপ, অনুকম্পায় এবং বিদ্যাবিতরণে যিনি পৃথিবীতে কল্পবৃক্ষস্বরূপ, নানা শাস্ত্রের বিচারে যিনি উৎকৃষ্ট ও চতুর, যিনি অলংকার শাস্ত্রের টীকা করিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাস নামক ভট্টাচার্য শিরোমণির জয় হোক।[১]

আচার্য সুকুমার মনে করেন, "ইনি প্রাচীন পদাবলীর ও মূল শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কবি হইতে পারেন।"[২] শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে কবির স্বরচিত শ্লোক দৃষ্টে বোঝা যায় যে কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন।

বর্ধমানের সংস্কৃত চর্চার এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে অবদানের বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে তৎকালীন গৌড়বঙ্গে যে জাগরণ দেখা গিয়েছিল তার প্রভাব বর্ধমান জেলাতেও পড়েছিল। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও বর্ধমানের সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত ছিল। বিদ্যানগর ছিল সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান। ভারত বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌম বিদ্যানগরের অধিবাসী ছিলেন। এখানেই তিনি অধ্যাপনা করতেন। বাসুদেব সার্বভৌমকে নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বর্ধমান জেলারই গৌরব। বাসুদেব পরে উড়িষ্যায় জগন্নাথ ক্ষেত্রের অধিবাসী হন এবং উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্রদেবের সভা অলংকৃত করেন। তিনি পুরীতে অবস্থান কালে শ্রীচৈতন্যের অনুরাগী ভক্তে পরিণত হন এবং শ্রীচৈতন্যের মহিমা কীর্তন করে চৈতন্য শতক রচনা করেন। সার্বভৌম রচিত ন্যায়ের গ্রন্থ তত্ত্বচিন্তামণির অনুমান খণ্ডের টীকা ও বেদান্ত গ্রন্থ বেদান্ত প্রকরণ অদ্বৈত মকরন্দের টীকা পাওয়া গেছে। বর্ধমানে সংস্কৃত চর্চার ব্যাপকতা লক্ষিত হয় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এই সময়েই সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে বর্ধমানের অবদান এই জেলাকে গৌরবের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রীচৈতন্যের লীলা পরিকর পরম বৈষ্ণব ভ্রাতৃদ্বয় রূপ ও সনাতন সংস্কৃত সাহিত্যে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। রূপ-সনাতনের পৈতৃক নিবাস ছিল কাটোয়ার

১। উদ্ধৃতি এবং অনুবাদ—আচার্য সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ থেকে উৎকলিত।
২। তদেব।

নিকটবর্তী নৈহাটীগ্রামে। দুই ভাই ছিলেন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের মন্ত্রী ও দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ লাভের পরে তাঁর প্রেমধর্মের প্রভাবে দুই ভাই কিছু আগে পরে সংসার ত্যাগ করেন এবং মহাপ্রভুর নির্দেশে বৃন্দাবনে বাস করেন। লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারে, সাধন-ভজনে এবং বৈষ্ণবীয় গ্রন্থ রচনায় তাঁরা বৃন্দাবনে কালাতিপাত করেছিলেন। এই দুই ভ্রাতা ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। এঁদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৈষ্ণবীয় গ্রন্থাবলী বৈষ্ণব সমাজে এবং রসিক সুধী সমাজে চির সমাদৃত। রূপ গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি উজ্জ্বল নীলমণি বৈষ্ণব রসশাস্ত্র হিসাবে সর্বজন সমাদৃত। রূপের অন্যান্য রচনাবলী উদ্ধব সন্দেশ, গীতাবলী, পদ্যাবলী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি। সনাতন লিখেছিলেন, ভাগবতের দশম স্কন্দের টিকা "বৈষ্ণব তোষিণী" বৃহদ্ ভাগবতামৃত, মেঘদূত কাবের টীকা 'তাৎপর্য দীপিকা' প্রভৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল নৈহাটী গ্রামের উত্তরে ঝামটপুর গ্রামে। সংসারে বীতরাগ হয়ে তাঁরা বৃন্দাবনে বসবাস করেছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি ষড়্ গোস্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং রঘুনাথ দাসের শিষ্য হন। কৃষ্ণদাস ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত এই গ্রন্থমধ্যে লেখকের অসাধারণ মনীষা, ধীশক্তি ও পাণ্ডিত্য যেমন প্রকাশিত, তেমনি তাঁর স্বরচিত শ্লোকের উপস্থাপনাও আছে। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান তেইশ সর্গে বিভক্ত গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য। তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকাও রচনা করেছিলেন।

মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীখণ্ড-নিবাসী নরহরিদাস সরকার (জন্ম: ১৪৭৮ খ্রীঃ) ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত। তিনিও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনার মধ্যে গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত চম্পুকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরহরির অপর দুখানি গ্রন্থ 'ভক্তি-চন্দ্রিকা পটল' ও 'ভক্তামৃত অষ্টক'।

শ্রীখণ্ড নিবাসী, পরে তেলিয়াবুধুরী গ্রামবাসী বিখ্যাত পদকর্তা দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৫৩৭-১৬১২ খ্রীঃ) শ্রীখণ্ডে

মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত মাধব নাটক ও কর্ণামৃত নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভক্তি রত্নাকরে সঙ্গীতমাধব থেকে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চা প্রবল ছিল। কবি গোবিন্দদাসের পৌত্র এবং দিব্য সিংহের পুত্র ঘনশ্যাম দাস সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ঘনশ্যাম সংস্কৃত শ্লোক রচনায় দক্ষ ছিলেন। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'গোবিন্দ রতিমঞ্জরী' কতকগুলি শ্লোকের সংকলন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি বর্ধমান জেলার গৌরব। রঘুনাথের জন্ম হয়েছিল মানকরের নিকটবর্তী কোটা গ্রামে। মানকর দুই তিন শতাব্দী ধরে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিল। দারিদ্র্যের জন্য তিনি বাল্যকালেই মায়ের সঙ্গে নবদ্বীপে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারত প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি বাঙ্গালা দেশে নব্যন্যায়ের প্রবর্তক। অন্যমতে বাসুদেব সার্বভৌমই নব্য ন্যায়ের প্রবর্তক। রঘুনাথ নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। তিনি বিচার সভায় আমন্ত্রিত হয়ে মিথিলা গমন করেছিলেন এবং মিথিলাবাসী তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাজিত করে মিথিলার গৌরব হ্রাস করেছিলেন। প্রত্যক্ষমণি দীধিতি, আখ্যাত পদ, পদার্থখণ্ডন, দ্রব্য কিরণাবলী, প্রকাশ দীধিতি, গুণ কিরণাবলী, প্রকাশ দীধিতি, আত্মতত্ত্ব বিবেক দীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থাবলী রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিভার দান।

পণ্ডিত সমাজের জন্য মানকর একসময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ধমানের রাজা জগৎরাম রায় ও তাঁর পত্নীর দীক্ষাগুরু শ্যামসুন্দর গোস্বামী মানকরের সন্নিহিত খাণ্ডারী গ্রামে এসে বসবাস করেন। শ্যামসুন্দরের পুত্র ভক্তলাল গোস্বামী ছিলেন মহারাজ কীর্তিচন্দ্র ও চিত্রসেনের দীক্ষাগুরু। ভক্তলালের প্রপৌত্র অজিতলাল গোস্বামীর দৌহিত্র হিতলাল মিশ্র ছিলেন জমিদার ও নীলকুঠির মালিক। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী। তিনি পণ্ডিতদের সম্মান শ্রদ্ধা করতেন এবং ভরণপোষণ করতেন। তাঁর একটি চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি নিজে গীতার একটি ভাষ্য রচনা করেছিলেন। মানকরে স্বগৃহে ভাগবতালয় প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন বিষয়ে বহু পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন।

হিতলালের সভায় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হয়েছিল। এই সময় বহু পণ্ডিত মানকরে বসবাস করেছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চূড়ামণি, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম, কৈলাসনাথ ভট্টাচার্য, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য মানকরের অলংকার। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গুরু উত্তম ভট্টাচার্য মানকরে বাস করতেন।

মানকরের পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম রঘুনন্দন গোস্বামী। ইনি মানকরের নিকটবর্তী মাড়ো বা মাড়গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অ্যাডাম সাহেবের তালিকা অনুযায়ী রঘুনন্দন ৩৭টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় ৩৫টি ও বঙ্গভাষায় দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রামায়ণ অবলম্বনে 'বৃহৎ রাম রসায়ন' তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। সদাচার নির্ণয়, দুর্জন, মিহির, কলংক, গোবিন্দ চরিত, ভক্তমালা, গৌরাঙ্গ চম্পূ, ভাগবতের সংশয় শাতনী টীকা, ছন্দোমঞ্জরী টীকা, ব্যাখ্যা মঞ্জরী প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী। রঘুনন্দন ছিলেন বংশানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। রোগার্ণব তারিণী ও অরিষ্ট নিরূপণ তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। ধাতুদীপ এবং ঔণাদিকোষ তাঁর ব্যাকরণ বিষয়ক রচনা। রঘুনন্দনের 'গৌরাঙ্গ চম্পূ', বিপুলায়তন গ্রন্থ, ভক্তের দৃষ্টিতে গৌরাঙ্গ চরিত বর্ণনা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থ রঘুনন্দনের কবিত্বশক্তিরও পরিচয় বহন করে। গৌরাঙ্গ বর্ণনার একটি শ্লোক : মন্দং মন্দং চরণকমলে মঞ্জু মঞ্জীর যুক্তে

ন্যস্য ন্যস্য প্রবলিত সুখং মন্থরং সঞ্চরন্তম।
স্মিত্বা স্মিত্বা মৃদু মৃদু মুখং মাতুরালোকমানং
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মনসি বিভুমানন্দমা প্নোত্মি বাঢ়ম্॥

—সুন্দর নূপুরযুক্ত চরণকমলের দ্বারা প্রবল সুখ ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বিচরণকারী, মাতার মুখ দর্শনে মৃদু মৃদু হাস্য কারী প্রভুর মুখ মনে ধ্যান করতে করতে নিশ্চিত আনন্দ ভোগ করি।

বর্ধমান জেলার আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরাঙ্গ মল্লিক বা সেনের পুত্র ভরত মল্লিক বা সেন টীকাকার ছিলেন। বর্ধমানের পাটলী পাড়ার কল্যাণ-মল্লের পৃষ্ঠপোষকতায় ভরত তাঁর গ্রন্থাবলী রচনা করেছিলেন। একবর্ণার্থসংগ্রহ (শ্লোকে রচিত একবর্ণ-বিশিষ্ট শব্দের সংকলন,—অভিধান বিশেষ); দ্বিরূপ ধ্বনি সংগ্রহ (শ্লোকে গ্রথিত দ্বিরূপ বিশিষ্ট সমার্থক শব্দের সংকলন), মুগ্ধবোধিনী ও লিঙ্গাদি সংগ্রহ নামে অমর কোষের দুটি টীকা—ভরত মল্লিকের রচনা।

ভরতের পৃষ্ঠপোষক কল্যাণ মল্লও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মেঘদূত কাব্যের টীকা রচনা করেছিলেন। ভরত এবং কল্যাণ মল্ল সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কেতুগ্রাম নিবাসী নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন অষ্টাদশ শতাব্দীর সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের 'গণমার্তণ্ড' টীকা রচনা করেছিলেন। নৃসিংহ গণমার্তণ্ড টীকার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে তাঁর পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করেছেন। এই তালিকায় দেখা যায় যে নৃসিংহের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। এই তালিকায় উল্লিখিত নাম: চণ্ডিদাস ভট্টাচার্য শিরোমণি, গোপীনাথ, মাধব, নয়ন, শ্রীহরি, শ্যামদাস বিদ্যাবাগীশ, গোপাল সার্বভৌম, কুশল তর্কভূষণ ও নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন।[১]

সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কলানিধি ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠী ছিল। কাইতি-শ্রীরামপুর গ্রামে ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর (১৭শ শতাব্দী) পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর চতুষ্পাঠীতে ১২০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। রায়না থানার পাষণ্ডা ও নিকটবর্তী আড়ুই গ্রামে টোল ও চৌ-পাড়ি ছিল। এখানে প্রায় দেড়শ' ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। রামবাটী গ্রামের চতুষ্পাঠীতে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী (১৮শ শতাব্দী) লেখাপড়া করতেন।[২]

বর্ধমানের নিকটবর্তী তালিতনগরে (আধুনিক তালিতগ্রাম) নিবাসী কবীন্দ্র ভট্টাচার্য ভাগবত অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় উদ্ধব দূত কাব্য রচনা করেছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

সাতগাছিয়া গ্রামে রামদুলাল তর্কবাগীশ একজন অনন্যসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। রামদুলালের জন্ম ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ও মৃত্যু ৮৪ বৎসর বয়সে ১৮১৫ সালে। রামদুলালের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাঙ্গালার বাইরে বহুদূর প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর বহু কৃতবিদ্য খ্যাতিমান ছাত্রের মধ্যে শালিখার জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন তর্কবাগীশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রামদুলালের ন্যায় শাস্ত্র সম্বন্ধে রচনাবলীর অধিকাংশই বিনষ্ট হয়েছে। রামদুলালের চার পুত্র—শিবপ্রসাদ তর্কালংকার, দুর্গাপ্রসাদ, কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ও গুরুচরণ

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৭৮

২। বর্ধমান চর্চা—সম্পাদক: শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪

তর্কপঞ্চানন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় গুরুচরণ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের সন্তুষ্টির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ লীলাম্বুধি নামে একটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের শেষে গুরুচরণ পিতৃপরিচয় সম্পর্কে লিখেছেন :

অসীদাভূমিতলবিদিতযশা রামপূর্বো দুলালঃ
খ্যাতো যস্তর্কবাগীশক ইতি সুধিযোঽদ্যাপি গায়ন্তি কীর্তিং।
যস্যান্বীক্ষাণয়েঽস্মিন্ মহতি জলধৌ দুস্তরেস্যাংকবীনাম্
সন্তরণার্থং ব্যকার্ষীদ্গতিকৃতিসুখদং হেতুমজ্ঞত্বভেত্ত্বম্॥

—পৃথিবীতে যাঁর যশ বিস্তৃত, রামদুলাল তর্কবাগীশ নামে খ্যাত, যাঁর কীর্তি সুধীগণ আজও গান করেন, তিনি অন্বীক্ষিকী ন্যায়শাস্ত্ররূপ কবিদেরও দুস্তর মহাসাগর সন্তরণের নিমিত্ত অজ্ঞতা নাশকারী সুখদায়ী গতিপথ নির্মাণ করেছিলেন।

গুরুচরণের তিন পুত্র—যাদবেন্দ্র তর্করত্ন, মাধবেন্দ্র ন্যায়ালংকার এবং তারিণী-চরণ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

নবদ্বীপের প্রথিতযশা নৈয়ায়িক রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নির্জনে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে অধ্যয়ন ও অধ্যপনায় কালাতিপাত করেছেন। সেইজন্য তিনি বুনো রামনাথ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বুনো রামনাথ বর্ধমানের সন্তান এবং বর্ধমানের গৌরব। "তিনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন না—আমরা যতদূর অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াছি। তিনি ধাত্রীগ্রামের গুরু ভট্টাচার্য্য-বংশীয় অভয়রাম তর্কভূষণের পুত্র ছিলেন এবং নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিয়া নিঃসন্তান পরলোকগত হন।"[১] তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।[২] নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজের অভ্যুদয়ের পূর্বে রাঢ় দেশ বিশেষতঃ দক্ষিণ রাঢ় বাঙ্গালার সারস্বত কেন্দ্র ছিল। বর্ধমানের রাজবংশ বিদ্যোৎসাহিতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বহু চতুষ্পাঠীর অধ্যাপককে তাঁরা বৃত্তিদান করেছেন। তাঁদের বিদ্যোৎ-সাহিতার এবং বদান্যতার ফলে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুধু বর্ধমান শহরে নয়, সমগ্র জেলাতেই বহু শত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল। অ্যাডামের বিবরণী অনুসারে ১৮৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল ১৯০,

১–২। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, পৃঃ ২৮৫, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

তন্মধ্যে চারটি ছিল বৈদ্যশাস্ত্র পঠন পাঠনের নিমিত্ত। রাজা রাজবল্লভের সভায় বর্ধমানবাসী পাঁচজন পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই পাঁচজনের নাম : জগন্নাথ পঞ্চানন, শম্ভুরাম বিদ্যালংকার, মধুসূদন বাচস্পতি, রুদ্রনারায়ণ বিদ্যাবাগীশ এবং রাধাকান্ত ন্যায়ালংকার। রুদ্রনারায়ণের পুত্র নৃসিংহ শিরোমণি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত, তিনি বর্ধমান জেলায় কুবিজপুর গ্রামে বাস করতেন। নৃসিংহের দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুরাম রাজা তিলকচাঁদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। শম্ভুরামের দুই পুত্র কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি ও কৃষ্ণকান্ত তর্কভূষণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কালীকান্তের পুত্রগণও নৈয়ায়িক হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন, উমাপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত ও হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ন কালীকান্তের তিন পুত্র।

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের সময়ে (১৭৭০—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) আনুমানিক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে 'ভারত প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী' স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচীন চতুষ্পাঠীর আদর্শ রক্ষা করে পাশ্চাত্য পদ্ধতির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বর্ধমান-রাজগণ সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তেজশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর এই চতুষ্পাঠীর অবস্থা কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হলেও মহতাপ চাঁদের আমলে (১৮৩৩-৮১ খ্রীষ্টাব্দ) এই চতুষ্পাঠী পুনরায় জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে। এখানে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ও ফার্সী শিক্ষায়ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। বাঁকুড়-সোনামুখী নিবাসী উমাকান্ত তর্কালংকার এই চতুষ্পাঠীতে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। উমাকান্তের মৃত্যুর পর ইল্‌ছোবা নিবাসী বন্দ্যবংশীয় ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন (১২৩৩—১২৯৭) উমাকান্তের শূন্য আসন পূর্ণ করেছিলেন। ব্রজকুমার পরে স্বীয় ছাত্র আদ্যচরণ ন্যায়রত্ন তর্কভূষণকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে কাশীবাস করেন। তাঁর অপর ছাত্র মহামহোপাধ্যায় রামমোহন সার্বভৌম কিছুকাল বর্ধমানে তাঁরই স্থানে অধ্যাপনা করেছিলেন। মহারাজ মহতাপ চাঁদ মহাভারত ও হরিবংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়ে বিতরণ করেছিলেন।

মনেহয় মহতাপ চাঁদের পরে বর্ধমান চতুষ্পাঠীর অবস্থা কিছুটা দীনতা প্রাপ্ত হয়েছিল। মহারাজ বিজয়চাঁদ চতুষ্পাঠীর গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে চতুষ্পাঠীর নাম হয় বিজয় চতুষ্পাঠী।

বৈদ্যপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মহারাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বর্ধমান নিবাসী রামকমল কবিভূষণ মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের জীবনী অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষায় নয়নানন্দ নাটক রচনা করেন। তিনি ভাবার্থদর্শ নামে অপর একটি নাটকও রচনা করেছিলেন।

করকলা গ্রাম নিবাসী রাজবল্লভ বাচস্পতির প্রপৌত্র এবং রামদেব ন্যায়-বাগীশের পুত্র লক্ষ্মণ ন্যায়ালংকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মণ, নদীয়ার শঙ্কর প্রভৃতির সমকালে রাঢ়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। দেবীপুরের বাণেশ্বর তর্কালংকারের প্রপৌত্র, রামনাথ তর্কবাগীশের পৌত্র এবং কৃষ্ণানন্দ বিদ্যালংকারের পুত্র হরচন্দ্র ন্যায়বাগীশ উনিশ শতকে রাঢ় দেশের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। হরচন্দ্রের পৌত্র ও ছাত্র বরদাকান্ত ন্যায়রত্নও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। বাকৃলা মান পাশার নারায়ণচন্দ্র তর্কপঞ্চানন তাঁর ছাত্র ছিলেন।

অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে বর্ধমান জেলার আরও কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে বড়বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মাহাতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ এবং চাণকের রাধাকান্ত বাচস্পতির নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন গৌরচন্দ্রামৃত, মুক্তিদীপিকা ও মনোদূত। কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন অলংকার কৌস্তভ নামে অলংকার শাস্ত্রের টীকা এবং রাধাকান্ত বাচস্পতি রচনা করেছিলেন নিকুঞ্জবিলাস, সূর্যশতক, দুর্গাশতক প্রভৃতি।

অম্বিকা-কালনাও বর্ধমানের রাজাদের আনুকূল্যে সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিল এবং বহু অধ্যাপকের সমাগমে বঙ্গদেশে বিখ্যাত হয়েছিল। অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে বর্ধমান জেলার মধ্যে কালনার চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। কালনা থানার অন্তর্গত অথবা কালনার নিকটবর্তী অঞ্চলের চতুষ্পাঠীগুলি এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমান হয়। রাজা রাজবল্লভ অম্বিকার অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এখানকার শেষ নৈয়ায়িক ছিলেন গুপ্তিপাড়ার গঙ্গাধরের ছাত্র দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন। কালনার পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি। আউসগ্রামও ছিল বর্ধমানের অন্যতম প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র। অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে (১৮৩৭) কালনা থানায় ৩৭টি, আউসগ্রাম থানায় ৩২টি, পূর্বস্থলী থানায় ১৮টি,

রায়না থানায় ১৪টি, মঙ্গলকোট থানায় ১০টি, গাঙ্গুরিয়া থানায় ৭টি এবং বর্ধমান থানায় ২টি চতুষ্পাঠী ছিল।

কালনার প্রসিদ্ধতম উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-৮৫)। তারানাথের পিতামহ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত পূর্ববঙ্গ থেকে কালনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। রামরামের পুত্র কালিদাস সার্বভৌম। কালিদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু: ১৮২৮)। ইনি বর্ধমানের জজ্ পণ্ডিত হয়েছিলেন। কালিদাস সার্বভৌম মিতাক্ষরা ও মনুসংহিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। কালিদাসের পুত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে যে সকল বাঙ্গালী পণ্ডিত সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ও কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারানাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও তারানাথ বহু বিষয়ে ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করে তাঁর সমকালে কর্মবিমুখ বাঙ্গালীকে ব্যবসাবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করতে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। তিনি হয়েছিলেন বাঙ্গালীকে নবজীবনে দীক্ষাদানের অগ্রদূত। এই তীক্ষ্ণধী ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিতকে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং কালনায় পদব্রজে এসে কলিকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য। নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন অসাধারণ বৈয়াকরণও। পাণিনিয় অষ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে তিনি রচনা করেছিলেন আশুবোধ ব্যাকরণ। তারানাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বাচস্পত্যাভিধানম্—৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ বিশাল কোষগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য রচনা শব্দার্থতত্ত্ব ও শব্দস্তোত্রমহানিধি (অভিধান)। তারানাথ কালনায় টোল খুলে অধ্যাপনা করতেন। তারানাথের বাস্তুভূমি হিসাবেই কালনা বঙ্গদেশের সারস্বত তীর্থ।

কালনা নিবাসী শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্যধর্মপ্রচারিণী সভার সম্পাদক-রূপে চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন ১২৯৫ বঙ্গাব্দে। শশীভূষণের সুযোগ্য পুত্র গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ নবদ্বীপে বসবাস করলেও কালনার সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ছিল। তিনি ঋগ্বেদের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।

কালনা থানার অন্তর্গত উপলতি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালংকার। উপলতি গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাশীশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও তাঁর বংশধরদের দ্বারা পূজিত হন। কাশীনাথ কলিকাতার হাতীবাগানের চতুষ্পাঠীতে

অধ্যাপনা করতেন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে একযোগে তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলন উপলক্ষ্যে সে যুগে যে সকল মনোজ্ঞ ছড়া রচিত হয়েছিল, তার একটিতে কাশীনাথের নাম উল্লিখিত আছে। সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গাত্মক ছড়া :

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন পাইবেন মান।
করিতে হইবে তাঁকে মূল সূত্র গান ॥
শাস্ত্রীয় বিচারাসনে যাত্রা হবে ভারি।
হইবেন ব্রজনাথ নিজে অধিকারী ॥

* * *

বামদিকে কাশীনাথ বাজাবেন গাল।
ধরিবেন তালে তালে মৃদঙ্গের তাল ॥

কাশীনাথ শব্দ সন্দর্ভসিন্ধু নামে একটি অভিধান রচনা করেছিলেন।

কালনা থানার মীরহাট বৈদ্যপুর হাসনহাটী এক সময়ে সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান হয়েছিল। বঙ্গবাসী পত্রিকার ১৩০০ সালের ১৫ই মাঘের প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সে সময়ে মীরহাট গ্রামে দুটি টোল ছিল। আরও কিছু পূর্বে এই গ্রামে ৮।১০টি চতুষ্পাঠী ছিল। মীরহাট গ্রামের বন্দ্যবংশীয় দয়ারামের দুই পুত্র রামচাঁদ ও রামলোচন বিদ্যাভূষণ (১৭৬৮-১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছিলেন রামলোচনের পুত্র হরিনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও তৎপুত্র শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ। একটি নিমন্ত্রণ পত্রে হরিনারায়ণ "নানা শাস্ত্রাধ্যাপনাজনিত যশঃ প্রকাশিত দিঙ্‌মণ্ডল ঃ শ্রীল হরি-নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য পীঠাণ :" রূপে অভিহিত হয়েছেন। হরিনারায়ণ নবদ্বীপে বিদ্যার্জন শেষ করে স্বগ্রামে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর লেখা অমরকোষের মুগ্ধবোধিনী টীকা পাওয়া গেছে, আঃ ১২৬৭ বঙ্গাব্দে হরিনারায়ণের দেহান্ত হয়।

হরিনারায়ণের কিঞ্চিৎ পূর্বে মীরহাট গ্রামে খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন, কামদেব ন্যায়রত্ন এবং বহ্নিদাস বিদ্যালংকার বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। হরিনারায়ণের সমকালে এই অঞ্চলে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত

ছিলেন। হরিনারায়ণের সমকালেও এই অঞ্চলে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের বাস ছিল। হাসনহাটী নিবাসী বিশ্বেশ্বর ন্যায়রত্ন, বৈদ্যপুর নিবাসী কাশীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মীরহাট নিবাসী নবীনচন্দ্র শিরোমণি, নীলকণ্ঠ বিদ্যারত্ন, গয়ারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি হরিনারায়ণের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। রামদুলাল তর্কবাগীশ এবং কৃষ্ণদাস ন্যায়ালংকার হরিনারায়ণের সমসাময়িক এবং সমবংশজাত। শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ (মৃত্যুঃ ১৮৫৮-৬০ এর মধ্যে) তর্কপঞ্চাননের উপযুক্ত পুত্র। তিনি স্বগ্রামে পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন যশস্বী অধ্যাপক। শ্রীকণ্ঠ সার্বভৌম, বৈদ্যপুর নিবাসী রামেশ্বর শিরোমণি, নীলমণি ভট্টাচার্য, হাসনহাটী নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণির পুত্র চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি প্রভৃতি শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। হরিনারায়ণ ও শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে যাঁরা যশস্বী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচগড়া নিবাসী দীনবন্ধু বিদ্যারত্ন, পাতিলপাড়া নিবাসী শ্রীনাথ সেনগুপ্ত (কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ), চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি (হাতীবাগানে টোলের অধ্যাপক), বৈদ্যপুরের নিকটবর্তী রামনগর নিবাসী দ্বারকানাথ শিরোমণি (স্বনামখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত), তেহাটা নিবাসী ভবতারণ ভট্টাচার্য ও তারিণীচরণ বিদ্যালংকার, রামনগর নিবাসী শিবনাথ তর্কালংকার, পূরগুণা নিবাসী কৃষ্ণধন ন্যায়রত্ন, চাঁপতার যাদব শিরোমণি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

রামনগরের শিবনাথ তর্কালংকারের পুত্র বিশ্বেশ্বর স্মৃতিতীর্থ (আঃ ১৯০৭-১৯৬৭) স্বগ্রামে শিবনাথ চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। কিছুকাল বৈদ্যপুর চতুষ্পাঠীতে, বিলসরার চতুষ্পাঠীতে এবং শেষদিকে তারকেশ্বরে মহান্ত পরিচালিত চতুষ্পাঠীতে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের পৌত্র সিদ্ধেশ্বর কাব্যস্মৃতিরত্ন স্বগৃহে চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন এবং স্বব্যয়ে ছাত্রদের ভরণ-পোষণ করতেন। ইনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতির ছাত্র ছিলেন। স্মৃতির পণ্ডিত হিসাবেই তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

বৈদ্যপুরের জমিদার ৺নৃসিংহচরণ নন্দী বৈদ্যপুরে জ্ঞানতরঙ্গিণী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। এই চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নিকটবর্তী ভুরকুণ্ডা গ্রাম নিবাসী বাসুদেব কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ (১২৯১-

১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) আমৃত্যু প্রায় ত্রিশ বৎসর উক্ত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেছেন। বাসুদেবের প্রিয় ছাত্র গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যস্মৃতিপুরাণতীর্থ জ্যোতিরত্ন (১৯০৯-১৯৮০ খ্রীঃ) বৈদ্যপুর বাসুদেব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন, পরে স্বগ্রাম রামনগরে চতুষ্পাঠী স্থানান্তরিত করে রামনগর বাসুদেব চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। বৈদ্যপুর নিবাসী রামপদ চক্রবর্তী আই. এ. কাব্যস্মৃতিপুরাণ কৃত্যতীর্থ বেদান্ত জ্যোতিরত্ন স্বগ্রামে (১৯১০-১৯৭০ খ্রীঃ) 'স্মৃতি-জ্যোতিষ বিদ্যামন্দির" নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যপনা করতেন এবং জমিদার নৃসিংহ চরণ নন্দী প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যপুর জ্ঞানতরঙ্গিণী দাতব্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়ের কবিরাজ ছিলেন। বর্ধমানের বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ বৈদ্যপুরের তথা বর্ধমানের গৌরব।

বৈদ্যপুরের সংলগ্ন হাসনহাটী গ্রামে কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মনোহর বিদ্যাভূষণ, বিশেশ্বর ন্যায়রত্ন, কালীনাথ ন্যায়রত্ন, কালাচাঁদ ন্যায়বাগীশ, চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি, রাখালদাস স্মৃতিতীর্থ, কালীপতি স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি কাশীতে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর চট্টোপাধ্যায় বংশীয় কৈলাশচন্দ্র নবদ্বীপের গোলোক ন্যায়রত্নের ছাত্র। কাশীর সংস্কৃত কলেজে তিনি ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়।

বর্ধমান জেলার একজন স্মরণীয় পুরুষ দুর্গাদাস লাহিড়ী (১২৩৯-১৩০৯ বঙ্গাব্দ, নবদ্বীপের নিকটবর্তী চকব্রাহ্মণ গড়িয়া গ্রামে দুর্গাদাসের জন্ম। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। দশ খণ্ডে প্রকাশিত পৃথিবীর ইতিহাস তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। প্রায় সতেরো বৎসরের পরিশ্রমের ফলে তিনি চতুর্বেদ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন। ঋগ্বেদের কিয়দংশের (প্রথম মণ্ডল) মর্মানুসারিনী ব্যাখ্যা নামে ব্রহ্মপর এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা নামক গ্রন্থে চতুর্বেদ থেকে সংকলিত মন্ত্রগুচ্ছের তিনি স্বমতানুসারী নূতন ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও জ্ঞানবেদ ঋগ্বেদের মন্ত্রভাষ্য ও নিত্যপাঠ্য বেদমন্ত্র তাঁর বেদবিষয়ক অপর গ্রন্থ। ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে হাওড়া শহরে বেদ প্রচারের জন্য বেদসভার উদ্বোধন করেন। মণিপুর রাজদরবার তাঁকে বেদাচার্য ও ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে

বেদবিশারদ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল। আত্মপরিচয় সম্পর্কে দুর্গাদাস লিখেছেন,—

কৌলিন্যভূষণোপেত উপাধিলাহিড়ীযুতঃ
শাণ্ডিল্যবংসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ।
বর্ধমানাখ্যজেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরঃপুরে
আসীৎ সুধী সুধারামঃ সর্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।

*   *   *   *

সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ
ব্যাখ্যায়াং চতুর্বেদস্য সম্প্রতি স রতোঽভবৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী॥
মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভবেৎ সর্বেষামন্তরে সদা॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ রায়না থানার শাকনাড়া গ্রামে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। রামচরণ বিদ্যালংকার, অযোধ্যারাম ন্যায়রত্ন, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ, রামনাথ বিদ্যালংকার প্রভৃতি এই বংশকে উজ্জ্বল করেছেন। রামচরণ বিদ্যালংকার সাহিত্যদর্পণের টীকা রচনা করেছিলেন। নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন প্রেমচাঁদের পিতামহের কনিষ্ঠ সহোদর। মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে আবির্ভূত হন এবং তৎকালীন বঙ্গদেশে দর্শনশাস্ত্রের এবং স্মৃতিশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুনিরাম প্রেমচাঁদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। সাহিত্য অলংকার ও ন্যায়শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর নিয়ে তিনি কাশীবাস করেন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে দেহত্যাগ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মদনমোহন তর্কালংকার, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই., মহামহোপাধ্যায় আদিত্যনাথ ভট্টাচার্য এম্. এ., দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ

তাঁর ছাত্র ছিলেন। প্রেমচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র তারাকুমার কবিরত্ন লিখেছিলেন ঃ

যা প্রেমচন্দ্রে জগদেবশ্চন্দ্রেঽপ্যস্তংগতে ভারতভাগ্যদোষাৎ
সমাগতা হা! প্রিয়পুত্রশোকাৎ কবিত্বদেবী মুমূর্ষুর্ভাব্যম্।

প্রেমচাঁদ এগারোটি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেছিলেন, রঘুবংশের কয়েক সর্গ, পূর্বনৈষধ, রাঘব পাণ্ডবীয় মহাকাব্য, কুমারসম্ভব কাব্য, চাটু পুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দ মুক্তাবলী, সপ্তশতী, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, উত্তররামচরিত, অনর্ঘরাঘব এবং কাব্যাদর্শ। দণ্ডী রচিত কাব্যাদর্শের টীকায় প্রেমচাঁদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষোত্তম রাজাবলী কাব্য (৪ সর্গ), নানার্থসংগ্রহ অভিধান এবং অলংকার গ্রন্থ প্রেমচাঁদের মৌলিক রচনা। ভারতে দ্বিতীয় মল্লিনাথ হিসাবে খ্যাতিপ্রাপ্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ বর্ধমান জেলাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

বর্ধমান জেলার প্রসিদ্ধ মহাপীঠ যোগাদ্যার অধিষ্ঠানক্ষেত্র ক্ষীরগ্রামেও যথেষ্ট সংস্কৃত চর্চা হয়েছিল, চতুষ্পাঠীও ছিল একাধিক। রাজা ভট্টাচার্য নামে প্রসিদ্ধ বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উমাচরণ তর্কসিদ্ধান্ত, রঘুপতি বিদ্যালংকার, মথুরানাথ তর্কসিদ্ধান্ত, ভগবান চন্দ্র শিরোমণি, ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ক্ষীরগ্রামের অলংকার। বর্ধমান মহারাজের যোগাদ্যাটীর সভাপণ্ডিত এই পণ্ডিতবংশ স্বীয় ব্যয়ে ভরণপোষণ করে দূরদেশাগত ছাত্রদের ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শিক্ষা দিয়েছেন। মথুরানাথ তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ বর্ধমানের মহারাজ তাঁকে রাজা ভট্টাচার্য উপাধিতে ভূষিত করে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। এই বংশের ভূদেবভূষণ পর্যন্ত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল। ভূদেবভূষণ কর্তৃক ১৩০২ সালে লিখিত হরিনামামৃত ব্যাকরণ পাওয়া গেছে।

শবসাধক ভিক্ষাকর তর্কালংকার মেদিনীপুরের তমলুক থেকে এসে ক্ষীরগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ভিক্ষাকরের পুত্র গুরুপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। ভিক্ষাকরের বংশধরগণ তন্ত্রস্মৃতি জ্যোতিষ প্রভৃতির চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষীরগ্রামবাসী ভরদ্বাজবংশীয় এককড়ি স্মৃতিতীর্থ দীর্ঘকাল রঙ্পুরে অধ্যাপনা করতেন। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রামকিশোর তর্কবাগীশের পূর্বপুরুষগণ চানক থেকে ক্ষীরগ্রামে এসে বসবাস করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ ও তাঁর বংশধরগণ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। রামকৃষ্ণের পুত্র যাদবেন্দ্র ন্যায়বাগীশ প্রথিতযশা পণ্ডিত ছিলেন। এঁরা আদিতে কোড়ুই গ্রামে ও পরে দোনায় বাস করতেন। মহারাজ তিলকচন্দ্র যাদবেন্দ্রকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেন। যাদবেন্দ্র শ্যামাস্বরূপাখ্য স্তোত্রের টীকা রচনা করেছিলেন। এই টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে তিনি লিখেছেন,—

> যে চণ্ডাসুরমুণ্ডখণ্ড-বিগলদ্-রক্তৌঘধারা লসৎ
> কংকালী পরিপংকিল-রসুরপতেঃ সার্থক্য সম্পাদকাঃ।
> কর্ত্রীখড়্গবরৌকপালরচিতং পাত্রং চ নীলোৎপলং
> বিভ্রাণাং প্রসীদন্তু বঃ শুভমহো তে তারিণী-বাহবঃ।
> ভট্টাচার্যতমুজেন দোনাগ্রামনিবাসিনা
> শ্রীমতা যাদবেন্দ্রেণ তন্যতে স্তোত্রবোধিনী ॥

যাদবেন্দ্রের পুত্র রুদ্ররায় বাচস্পতি ও তৎপুত্র হরিরাম তর্কালংকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বর্ধমানের পত্র পত্রিকা

বঙ্গসাহিত্য চর্চা, সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র-চর্চার মত পত্র পত্রিকা প্রকাশনার দিক থেকেও বর্ধমান জেলার ঐতিহ্য গৌরবময়। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশিত হয়েছিল পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী বহড়া গ্রামে জাত গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে বৃহস্পতিবারে কলিকাতার ১৪৫নং চোরবাগান ষ্ট্রীটে বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় থেকে। পরদিন ১৫ই মে শুক্রবার পত্রিকাটি বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়া হয়। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশন থেকে মার্শম্যানের সম্পাদনায় সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে। সুতরাং বাঙ্গাল গেজেটি ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর কলিকাতায় প্রেস স্থাপন করে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর রচিত চিকিৎসার্ণব গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের আমলে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। মনে হয় গঙ্গাকিশোর তেজশ্চন্দ্রের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকাযোগে বহড়ায় স্থানান্তরিত হয়। অগ্রদ্বীপ স্টেশন থেকে দুই কি. মি.

দূরে বহড়া গ্রামের অবস্থান। যে স্থানে ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছিল, সেই স্থান ছাপাখানা ডাঙ্গা নামে পরিচিত। গঙ্গাকিশোরের সহযোগী ছিলেন হরচন্দ্র রায়।

গঙ্গাকিশোরের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর ভাগিনেয় বর্ধমান রাজের সভাপণ্ডিত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশচন্দ্রের পুত্র নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৭ সালে উক্ত ছাপাখানা পুনরায় চালু করেছিলেন। নীলমণির মৃত্যুর পর ছাপাখানা বন্ধ হয়ে যায়। বাঙ্গাল গেজেটি কতদিন প্রকাশিত হয়েছিল, বহড়া গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

বাঙ্গাল গেজেটির পরে দীর্ঘদিন বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত কোন সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রের প্রকাশ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৮৪৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর) বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বর্ধমান শহর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল বর্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এই পত্রিকাটির বিলোপ ঘটে। একই সময়ে বর্ধমান শহর থেকে বর্ধমান চন্দ্রোদয় নামে আর একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামতারণ ভট্টাচার্য। ১৮৫১ সালে এই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু এই পত্রিকার আয়ুষ্কাল কতদিন ছিল তা জানা যায় না।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান মহারাজের অর্থানুকূল্যে কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদ বর্ধমান প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ সালেই রেভাঃ লালবিহারী দে অম্বিকা কালনা থেকে অরুণোদয় নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। লালবিহারী মিশনারীর কাজে কালনায় অবস্থান করায় কলকাতায় মুদ্রিত করে কালনা থেকে প্রকাশ করতেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বর্ধমান মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং এক বৎসর পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত শিক্ষাদর্পণ পত্রিকার সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্যারীলাল সিংহ সম্পাদিত প্রচারিকা পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। ১৮৭৬ সালে বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল সিংহের সম্পাদনায় ভারত ভাতি, রাখালদাস হাজরা সম্পাদিত জ্ঞানদীপিকা এবং দিবাকর নামে অপর একটি পত্রিকা। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় আর্যপ্রতিভা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একই বৎসরে কালনা মহকুমার প্রথম পত্রিকা কালনা প্রকাশ

প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সালে বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র বর্ধমান সঞ্জীবনী প্রকাশিত হয় যোগেশচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায়। ১৯২৭-২৮ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল। বর্ধমান সঞ্জীবনী ছাড়া কোন পত্রিকাই দীর্ঘজীবী হয় নি। এই শতকের একমাত্র দীর্ঘজীবী পত্রিকা পল্লীবাসী।

১৮৯৬ সালে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় অম্বিকা কালনা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি এখনও জীবিত আছে। শশীভূষণের পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্র গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের পরলোক গমনের পরে তাঁর পুত্র অমূল্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন। ১৮৯৭ সালে পাঁচু গোপাল রায়ের সম্পাদনায় বর্ধমান চর্চা এবং ধনপতি ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বর্ধমান সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ আর্থিক কারণেই অধিকাংশ পত্রিকাই স্বল্পকালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বর্ধমান জেলায় নূতন নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কলিকাপুর গেজেট প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কাটোয়া থেকে প্রকাশিত হয় কাটোয়া মহকুমার প্রথম পত্রিকা প্রসূন। পত্রিকাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন লাভ করেছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নবারুণ নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে বহু পত্রিকা বর্ধমান জেলা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ পত্রিকাই স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্পাদিত বর্ধমান (১৯২২), বলাইদেব শর্মা সম্পাদিত শক্তি (১৯২৩)। নাজিরুদ্দিন আহাম্মদ সম্পাদিত বর্ধমানবাসী (১৯২৭), ভিমরুল (১৯২৭), তরুণ (১৯৩০), গোপেন্দু ভূষণ সঙ্গীতাচার্য সম্পাদিত আসানসোল হিতৈষী (১৯৩১), ভুজঙ্গভূষণ সেন সম্পাদিত শান্তিজল (১৯৩০), সুধাংশুমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত দেশপ্রিয় (১৯৩৪), দাশরথি তা সম্পাদিত দামোদর (১৯৩৬), সুশীলকুমার খাঁ সম্পাদিত বর্ধমানের বিজয় বার্তা (১৯৩৮), অজিতকুমার রায় সম্পাদিত দাগ (১৯৩৯), বলাইদেব শর্মা সম্পাদিত শ্রী (১৯০২), কৃষ্ণকিশোর রায় সম্পাদিত দৃষ্টি (১৯৪৪), নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত বর্ধমান (১৯৪৮), রাধা গোবিন্দ দত্ত সম্পাদিত

বর্ধমানের ডাক (১৯৪৯) প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় পত্রিকাগুলি সেকালে স্বদেশী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতো।

দামোদর পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করার পর সম্পাদক দাশরথি তা বর্ধমান বার্তা ও পল্লীর কথা নামে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক দামোদর পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক দামোদর ও শেষে দৈনিক দামোদর প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া পূজাসংখ্যা দামোদর বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা হিসাবেও প্রকাশিত হয়। কিছুকাল দাশরথি তা'র ভ্রাতা দুর্গেশকুমার তা-ও দামোদর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আসানসোল হিতৈষী ১৯৩১ সাল থেকে গোপেন্দুভূষণ সঙ্গীতাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। নারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনা সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে এবং বার্ষিক বিশেষ সংখ্যা বা পূজাসংখ্যা হিসাবে প্রায় ৪৭ বৎসর যাবৎ, প্রকাশিক হয়ে সম্প্রতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

স্বাধীনতার পরে বর্ধমান শহরে এবং বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সকল পত্রিকার কতকগুলি সংবাদপত্র কতকগুলি সাহিত্যপত্রিকা। সুধীর চন্দ্র দাঁ-র বর্ধমান পরিক্রমা গ্রন্থে, শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু সম্পাদিত বর্ধমান চর্চা গ্রন্থে এবং পঃ বঙ্গ সরকার প্রকাশিত বর্ধমান গেজেটিয়ার—১৯৯৪তে বর্ধমান জেলায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকার বিরাট তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। বাহুল্যবোধে পত্রিকার তালিকা এখানে প্রদত্ত হোল না। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের জগতে সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত বর্ধমান বিপুল সংখ্যক দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে যথার্থ ই গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্ধমানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বর্ধমান জেলার দামোদর অজয় অববাহিকায় আবিষ্কৃত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি এই জেলার বিস্তৃত অঞ্চলে আদিম যুগের মানবগোষ্ঠীর বসবাস প্রমাণিত করে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাপুরের নিকটবর্তী বীরভানপুর গ্রামে দামোদর নদের ক্যানেল কাটার সময়ে কিছু প্রস্তর আয়ুধ পাওয়া যায়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্বাঞ্চলের জয়েন্ট্ ডিরেক্টর অধ্যাপক ব্রজবাসী লালের নেতৃত্বে এই অঞ্চলে খননকার্যের ফলে ২৮২টি ক্ষুদ্রাকৃতি আয়ুধ পাওয়া যায়। অধ্যাপক

লাল অনুমান করেন যে এই অঞ্চলে একটি আয়ুধের কারখানা ছিল। ভূগর্ভের এই স্তরে কুটির নির্মাণের গর্ত পাওয়া গেছে। সুতরাং এই অঞ্চলে মনুষ্যবসতি ছিল বলে অনুমান হয়।

কোন প্রকার পোড়ামাটির দ্রব্য আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রাক্-পোড়ামাটির যুগের বলে অনুমিত হয়। আরও মনে হয় যে মানুষগুলি পশু শিকারের দ্বারা জীবনধারণ করতো। আয়ুধগুলির মধ্যে কতক-গুলি পশু শিকারের উপযোগী ও কতকগুলি কৃষিকর্মে ব্যবহারের উপযোগী। সুতরাং পশু শিকারের সঙ্গে এই জনসমষ্টি কৃষিকর্মেও মনোনিবেশ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্গাপুর অঞ্চলে আড়া, সগরভাঙ্গা, গোপালপুর ও কাঁকসার জঙ্গলে এরূপ ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকটি অস্ত্র নির্মাণ স্থলও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর পূর্বে বর্ধমানের এই অঞ্চলে আদিম মানব গোষ্ঠীর বসবাস ছিল।

পানাগড় রেল স্টেশন থেকে ৭ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে বুদবুদ থানার অন্তর্গত দামোদর নদের উত্তর তীরে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভরতপুর গ্রামের ঢিবি খনন কার্যের ফলে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের বহু উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তর নির্মিত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ; তামার তৈরী দ্রব্যাদি, জীবজন্তুর হাড়ের তৈরী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, পুঁতি অলংকার, মাটির পাত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভরতপুরের ঢিবি বা স্তূপ খননের ফলে চারটি স্তরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সব নীচে প্রথম স্তরে প্রস্তর ও হাড়ের তৈরী অস্ত্র, হরিণের শিঙ্, রত্নপ্রস্তর নির্মিত পুঁতি প্রভৃতি পাওয়া গেলেও তামার কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় নি। এই স্তরটিকে পুরাতাত্ত্বিকরা আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

দ্বিতীয় স্তরে প্রাক্-গুপ্তযুগের মৃৎপাত্র, লৌহ ও অন্যান্য ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি, উনান প্রভৃতি পাওয়া গেছে। তৃতীয় স্তরে পাওয়া গেছে রৌদ্রে শুকানো ইটগাঁথা ঘরের নিদর্শন। চতুর্থ স্তরে পাওয়া যায় পঞ্চরথাকৃতি একটি বৌদ্ধ-স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। বর্গাকার ইট দিয়ে তৈরী বৌদ্ধ স্তূপটির চতুর্দিক কারুকার্য-মণ্ডিত এবং বৃহদাকার কুলুঙ্গিতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি।

এইরূপ এগারোটি মূর্তি পাওয়া গেছে। মূর্তিগুলির গঠনশৈলী থেকে অনুমান হয় যে এগুলি অষ্টম নবম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে।

ভরতপুরের খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি থেকে জানা যায় যে এখানে নব্যপ্রস্তর তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পাল রাজাদের যুগ পর্যন্ত একটি সভ্যতার ধারা অব্যাহত ছিল। তৃতীয় স্তরটি গুপ্তযুগের স্থাপত্য বলে অনুমিত হয়। তাম্রযুগের ও পরে লৌহযুগের নিদর্শনগুলি এই স্থানের অধিবাসীদের কৃষিকর্ম নির্ভরতা ও পশু ও মৎস্য শিকারে জীবিকা নির্বাহের প্রমাণ উপস্থাপিত করে। বীরভানপুরের অধিবাসীদের সঙ্গে ভরতপুরের অধিবাসীদের যোগাযোগের সম্ভাবনাও অনুমান করা যেতে পারে। পরবর্তী যুগের সভ্যতা গুপ্তযুগ থেকে পালযুগ পর্যন্ত প্রসারিত।

ভেদিয়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে দশ কি. মি. পশ্চিমে আউসগ্রাম থানার অজয় নদের উপত্যকায় পাণ্ডুক গ্রামে স্তূপ খনন করে বহু মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। পাণ্ডু নামে কোন রাজার রাজধানী ও গড়ের অবস্থান সম্পর্কে কিম্বদন্তী অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ১৯৬২ থেকে ৬৪ সালের মধ্যে চারবার খননকার্যের ফলে প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন এই সভ্যতা সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম জনবসতির সাক্ষ্য বহন করে এবং তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সুপরিকল্পিত নগর নির্মাণ, তামার ব্যবহার, মাটির বাসনের ব্যবহার, কৃষিকর্ম, পশু শিকার প্রভৃতি উন্নতমানের সভ্যতার পরিচায়ক। তিন প্রকারের তেরোটি সমাধির মধ্যে ভস্মাধারও পাওয়া যায়। মৃতদেহ সৎকারের রীতিনীতিও এখানে সুস্পষ্ট। কৃষিকর্ম বিশেষতঃ ধানের চাষ, বাণিজ্য ও পশুপালন ছিল এই অঞ্চলের জীবিকার উপায়। নকসা করা বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র উন্নত রুচির পরিচায়ক। পাণ্ডু রাজার ঢিবির উপরিভাগে পোড়া ইঁটের স্থাপত্য খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর বলে অনুমিত হয়।

দামোদর উপত্যকায় এবং বরাকর নদীর দুপাশে মাইথন, কালীমাটি, কল্যাণেশ্বরী, বগুনিয়া প্রভৃতি স্থানে পাল ও গুপ্তযুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৬২ থেকে ৬৫ সাল পর্যন্ত অজয় কুনুর অববাহিকায় খনন কার্যের ফলে বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে প্রচুর প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন পাওয়া

গেছে। বর্ধমান জেলার গোস্বামী ডাঙ্গা, ডাণ্ডিকর ঢিবি, গঙ্গাভাঙ্গা (কাটোয়া), বসন্তপুর, মঙ্গলকোট প্রভৃতি অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক জনবসতির সাক্ষ্য বহন করে।

ভাতার থানার অধীনস্থ ভাতার রেল স্টেশন থেকে ৮ কি. মি. পূর্বে বড়বেলুন গ্রামের বাণেশ্বর ডাঙ্গায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি তাম্রাশ্মীয় যুগের বলে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাণেশ্বর ডাঙ্গায় খননকার্যের ফলে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সমগোত্রীয় এক সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তিনটি স্তরে বহুবিধ প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তৃতীয় স্তরে লৌহপিণ্ড, বাসগৃহ, চুল্লী, পোড়া ইঁটের বেদী প্রভৃতি উন্নততর সভ্যতার পরিচায়ক।

ভাতার থানার আমারুণ রেল স্টেশনের কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে খড়্গেশ্বরী নদীর তীরে সাঁওতাল ডাঙ্গার ঢিবি খনন করে তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। কৃষ্ণলোহিত কলসের মধ্যে অস্থির অবশেষ, তামার চুড়ি, উত্তর দক্ষিণে শায়িত সমাধি, বিভিন্ন আকৃতির মৃৎপাত্র, রত্নপ্রস্তর নির্মিত পুঁতি, ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ, ঢিবির উপরিভাগে পোড়ামাটির পুতুল, রত্নপ্রস্তর, ক্ষুদ্রাশ্মীয় কুঠার, তামার আংটি ও অন্যান্য দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এই অঞ্চলে আদিমযুগের বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের বসতি প্রতিপাদিত হয়।

১৯৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে মঙ্গলকোট গ্রামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক খননকার্যের ফলে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে কুষাণ ও গুপ্তযুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সিন্ধুসভ্যতার মত পাকা ইঁটের তৈরী ঘরবাড়ীর ভগ্নাংশ, পয়ঃপ্রণালী, ছোট ছোট ইঁটের ভিত, কুষাণ ও গুপ্তযুগের শিলমোহর, বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র, তাম্র-মুদ্রা, টেরাকোটার মূর্তি প্রভৃতি ধারাবাহিক উন্নত সভ্যতার অবস্থিতি প্রমাণিত করে।

মঙ্গলকোটে সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) মসজিদটিও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের পর্যায়ভুক্ত। মসজিদের গায়ে কালো পাথরে খোদাই করা 'শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি' নামটি দেবনাগরী হরফে লেখা। কিম্বদন্তী অনুসারে মঙ্গলকোটে বিক্রমজিৎ নামে এক পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। তিনি গজনবি নামে আউলিয়ার দ্বারা নিহত হন। সম্রাট শাহজাহান ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন।

বর্ধমান জেলার পুরাতত্ত্বের নিদর্শন নানা জায়গায় ছড়ানো আছে। অজয়-

কুনুরের অববাহিকায় অজয়ের দক্ষিণে বনকাঠি গ্রামে গাছের ফসিল থেকে নির্মিত হাতকুঠার আবিষ্কৃত হয়েছে। সেন পাহাড়ী গ্রামে ইছাই ঘোষের দেউলের ধ্বংসাবশেষ, শ্যামারূপার গড়, বরাকরের দেউল, মেমারির দেউল প্রভৃতি বর্ধমান জেলার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবে গণ্য। সুপ্রাচীন তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে গুপ্ত পাল যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক সভ্যতা খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দী পর্যন্ত পুরা সম্পদে বর্ধমানের স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণে বর্ধমান

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অপার্থিব লীলায়, তাঁর জীবনাচরণ, ধর্মাচরণ এবং জনে জনে ছোটবড় উচ্চনীচ নির্বিশেষে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের ফলে গৌড়বঙ্গ উৎকল দেশ দক্ষিণ ভারত কাশী মথুরা বৃন্দাবন ব্যাপ্ত করে,—এক কথায় ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে অভূতপূর্ব জাগরণ সূচিত হয়েছিল। এই জাগরণের প্রাণকেন্দ্র নবদ্বীপ। আধুনিক নবদ্বীপ শহর ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বর্ধমান জেলারই অন্তর্ভুক্ত। তিনদিকে বর্ধমান জেলার ভূভাগ ও পূর্বে ভাগীরথী-গঙ্গার দ্বারা বেষ্টিত বর্তমানের নবদ্বীপ শহর। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপ ছিল গঙ্গার পূর্বতীরে। ক্রমাগত গঙ্গার ভাঙ্গাগড়ায় প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থান নির্ণয় কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তথাপি সেকালেও নবদ্বীপ বর্ধমান জেলার সন্নিহিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গঙ্গার পূর্বতীরে যেমন নদীয়া, পশ্চিম তীরে তেমনি বর্ধমান। গঙ্গা পার হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

আধুনিক নবদ্বীপের পশ্চিমে মাইল দুয়েক দূরে বিদ্যানগর নিমাইএর বিদ্যা-শিক্ষার স্থান বলে প্রচলিত বিশ্বাস। অনেকের মতে এই বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্বভৌম ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ছিল। বাসুদেব মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন। গঙ্গাদাসের চতুষ্পাঠীতে বালক নিমাই বিদ্যাভাস করতেন। শ্রীচৈতন্যের বিদ্যার্জনের স্থান বলেই এই স্থানের নাম হয়েছিল বিদ্যানগর, এরূপ লোকপ্রসিদ্ধি প্রচলিত। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গঙ্গাতীরের পথ ধরে অম্বিকা কালনায় উপনীত হয়েছিলেন। কালনা-নিবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। কালনায় গঙ্গা পার হয়ে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপস্থিত হন।

নীলাচলে দুই বৎসর যাপন করার পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ের পথে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিন্তু নানা কারণে বৃন্দাবন যাত্রা স্থগিত রেখে তিনি গৌড় রামকেলি থেকে নবদ্বীপ শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ঝাড়খণ্ডের পথে মথুরা বৃন্দাবন গমন করেন। মুরারির কড়চা অনুসারে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন কালে গৌড়ের পথে নবদ্বীপ শান্তিপুর হয়ে নীলাচলে গিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর এই যাতায়াতে বর্ধমানের মৃত্তিকা তাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। জয়ানন্দ তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন যে, গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বর্ধমানের নিকট মাঝিপুরা বা আমাইপুরা গ্রামে শ্রীচৈতন্য তাঁর অনুরাগী ভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে বিশ্রাম করেছিলেন। এই সময়ে তিনি সুবুদ্ধির শিশুপুত্রের গুইয়া বা গুয়ে নাম পরিবর্তন করে জয়ানন্দ রেখেছিলেন।

জয়ানন্দের মতে মহাপ্রভু অতঃপর বায়ড়া গ্রামে বাসুদেব সার্বভৌমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থান করেছিলেন। মহাপ্রভুর দর্শন-লাভের জন্য বহু লোকের সমাগম হওয়ায় তিনি বায়ড়া গ্রাম থেকে কুলিয়ায় উপস্থিত হন। কারো কারো মতে বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ী ছিল বিদ্যানগরে। বায়ড়া, কুলিয়া এবং বিদ্যানগর বর্ধমান জেলাতেই অবস্থিত। কুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপের সন্নিকটে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। কুলিয়ায় মাধব দাসের গৃহে মহাপ্রভু সাতদিন অবস্থান করেছিলেন।[১]

নবদ্বীপে ভক্তগৃহে কীর্তন নর্তন করে জননী জন্মভূমি দর্শন করে শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন অম্বিকা কালনায়। কালনায় তিনি নিত্যানন্দের সঙ্গে উপনীত হয়েছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে এবং ভক্ত গৌরীদাসকে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় অনুমতি দিয়েছিলেন—

> তস্য প্রেম্না নিবদ্ধৌ তৌ প্রকাশ্য রুচিরাং শুভাম্
> মূর্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং সর্বশক্তিসমন্বিতাম্
> দদতঃ পরমপ্রীতৌ নিবসন্তৌ যথাসুখম্।[২]

—তাঁর গৌরীদাসের প্রেমে নিবদ্ধ তাঁরা দুজনে (গৌর ও নিতাই) সেখানে সুখে অবস্থান করে নিজ নিজ ভাবরসে পূর্ণ সর্বশক্তি সমন্বিত সুন্দর মঙ্গল মূর্তি প্রকাশ করেছিলেন অর্থাৎ মূর্তি নির্মাণে অনুমতি দিয়েছিলেন।

১। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৬।২০৮-০৯।
২। মুরারি গুপ্তের কড়চা—৪।৪।১৩-১৪

গৌরীদাস পণ্ডিত প্রথম গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বিগ্রহ পূজার গৌরবের অধিকারী। কালনায় মহাপ্রভু পাড়ায় গৌরীদাসের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদ্বয় অদ্যাপি পূজিত হচ্ছেন। এই মন্দিরে শ্রীচৈতন্যের স্বহস্ত লিখিত ভাগবতের পুঁথি আছে বলে পূজারীরা দেখিয়ে থাকেন। শ্রীচৈতন্যের আদেশে প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে নিত্যানন্দ গৌড়দেশে আগমন করে গৌরীদাসের ভ্রাতা সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অপ্রকটের পরে জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণব সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে নরোত্তম দাস আয়োজিত খেতরির মহোৎসবে বৈষ্ণব মহাসম্মেলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাহ্নবা স্বয়ং। সুতরাং বর্ধমানের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সংযোগ ছিল নিবিড়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবে তৎকালীন বঙ্গদেশে যে অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব জাগরণ দেখা গিয়েছিল, সেই জাগরণে মুসলমান শাসক ও তাঁদের কর্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত স্মৃতিশাস্ত্রের কঠিন বিধি নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, লৌকিক দেবদেবীর পূজোৎসব ও বৃথা আমোদ প্রমোদে মত্ত মুমূর্ষু পথহারা বাঙ্গালী-হিন্দু রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণময়ী অহল্যার মত নবপ্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, ফিরে পেয়েছিল আত্মবিশ্বাস উচ্চনীচ ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে মহান ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। এই নব ভাববিপ্লবে বাঙ্গালী মনীষা উদ্বোধিত হয়েছিল। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মনীষা অপরিমেয় কীর্তি স্থাপন করেছিল। বাঙ্গালী জীবনের এই অত্যাশ্চর্য জাগরণে বর্ধমানের ভূমিকা ছিল সর্ববৃহৎ। নদীয়া বা নবদ্বীপ সংলগ্ন বর্ধমান জেলার মানুষ বাঙ্গালীর প্রাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দিব্যলীলা প্রত্যক্ষ করে তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করে এই নবজাগ্রত প্রাণবন্যাকে বিচিত্র ধারায় সর্বতোভাবে পরিপুষ্ট করে ধন্য হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে ও তাঁর দিব্য জীবন সাধনায় দেশব্যাপী যে ভাববন্যা এসেছিল, বাঙ্গালীর জীবনে যে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা গিয়েছিল, নবদ্বীপ-সংলগ্ন বর্ধমানও তার অংশীদার হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বর্ধমান জেলার অধিবাসী। বর্ধমানের বহু মানুষ তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ পরে বর্ধমানের অধিবাসী হয়েছিলেন। বর্ধমান জেলার মেমারির নিকটবর্তী

কুলীনগ্রাম নিবাসী গৌড়েশ্বর কর্তৃক গুণরাজ খান উপাধিতে সম্মানিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রচয়িতা মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খান ও পৌত্র (মতান্তরে অপর পুত্র) রামানন্দ বসু মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন। মহাপ্রভু এঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কুলীনগ্রামের অধিবাসীদেরও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। এমন কি, কুলীনগ্রামের কুকুরকেও তিনি সম্মানের পাত্র মনে করতেন। কুলীন-গ্রাম-বাসীদের তিনি প্রতি বৎসর রথযাত্রায় পুরীতে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।
তোমার কি তোমার গ্রামের কুকুর
সেই মোর প্রিয়, অন্যজনে বহু দূর।[১]

কুলীনগ্রামে একটি বৈষ্ণব পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল এবং এই গ্রাম বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ।
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন
সবেই চৈতন্যভৃত্য, চৈতন্য প্রাণধন।
* * *
কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥[২]

কুলীনগ্রামের ভক্তরা মিলিতভাবে কীর্তনীয়া সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। রথযাত্রার সময়ে তাঁরা পুরীতে মহাপ্রভুর সম্মুখে কীর্তন ও নৃত্য করেছিলেন।

কুলীন গ্রামেরে এক কীর্তনীয়া সমাজ
তাঁহা নৃত্য করেন রামানন্দ সত্যরাজ।[৩]

১। চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা—১৫।৯৮-১০১
২। তদেব—১।১০।৮০-৮১, ৮৩
৩। চৈতন্য চরিতামৃত—২।১৩।৪৪

শ্রীখণ্ড হয়েছিল একটি পরম বৈষ্ণবতীর্থ এবং বাঙ্গালার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। শ্রীখণ্ড সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন বৈদ্যবংশজাত ঠাকুর নরহরি দাস সরকার। জনশ্রুতি অনুসারে নরহরি শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে চার পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের মতে নরহরির পিতা নারায়ণ দাস এবং গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থের মতে নরহরির পিতা নরনারায়ণ দেব সরকার ও মাতা গৌরী দেবী। নরনারায়ণের তিন পুত্র—মুকুন্দ, মাধব ও নরহরি। মুকুন্দ ছিলেন খ্যাতনামা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং গৌড়ের সুলতানদের চিকিৎসক। পিতার মৃত্যুর পর তিনি নরহরিকে নবদ্বীপে রেখে গৌড়ে গিয়েছিলেন। নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নকালে নরহরির সঙ্গে নিমাই এর পরিচয় হয় এবং শ্রীচৈতন্য পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গেও গভীর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গের অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন নরহরি এবং তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদে পরিণত হয়েছিলেন।

ভক্তিরত্নাকর অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গের নগর সংকীর্তনে নরহরিও উপস্থিত থাকতেন, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল অনুসারে শ্রীবাসের গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনেও তিনি অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে যোগ দিতেন। গৌরাঙ্গ কীর্তনে দেখা যায়, গৌরাঙ্গের বামপার্শ্বে গদাধর ও দক্ষিণপার্শ্বে নরহরি বিরাজ করছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীখণ্ডে নরহরির গৃহে পদার্পণ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।[১] নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ ও তাঁর পুত্র রঘুনন্দন ছিলেন শ্রীচৈতন্যের নিষ্ঠাবান ভক্ত। শ্রীখণ্ডে তাঁদের বাড়ীতে নিত্য গোপীনাথ সেবা চলতো। একটি মহোৎসব উপলক্ষ্যে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরির গৃহে উপস্থিত হয়ে ভক্তদের ধন্য করেছিলেন।

শ্রীখণ্ডকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণবধর্মের প্লাবন ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতভূমিকে প্লাবিত করেছিল তার প্রেরণা ছিলেন নরহরি, মুকুন্দ ও রঘুনন্দন। নরহরি শ্রীখণ্ডেই বসবাস করেছিলেন। তাঁর সাধন-ভজনের স্থান ছিল নিকটবর্তী বড়ডাঙ্গায়। এখানে তিনি গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গৌরাঙ্গ নাম জপ করতে করতেই তিনি ১০১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।[২]

১। আমার জানা শ্রীখণ্ড,—নিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ, পৃঃ ৫
২। আমার জানা শ্রীখণ্ড, পৃঃ ১০১

নরহরি, রঘুনন্দন ও শ্রীখণ্ডবাসী অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মিলে একটি কীর্তন সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীখণ্ডের অপর দুই বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন চিরঞ্জীব সেন ও সুলোচন সেন। উভয়েই জ্ঞাতি ভ্রাতা। রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর। নরহরির বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : লোকানন্দাচার্য, দ্বিজ হরিদাস, দ্বিজ গোপাল দাস, (তকিপুর), রামদাস ঘোষাল (একব্বর পুর), গৌরাঙ্গ ঘোষাল, মিশ্র কবিরত্ন, দ্বিজ লক্ষ্মীকান্ত, চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন দাস, পদকর্তা চন্দ্রশেখর, চক্রপানি রায় চৌধুরী ও তদীয় পুত্রদ্বয় নিত্যানন্দ ও জনানন্দ, পদকর্তা শশিশেখর (চন্দ্রশেখরের ভ্রাতা), মধুসূদন দাস (নরহরির সংকীর্তন বাদক), কানাই ঠাকুর, কানাই ঠাকুরের পুত্র মদন রায় ঠাকুর ও বংশী ঠাকুর, কৃষ্ণকিংকর দাস, কবিরাজ যাদব, কংসারি ঘোষ (কুলাইগ্রাম) প্রভৃতি। রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন : পদকর্তা নয়নানন্দ কবিরাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুর (আকাই হাট), মহানন্দ কবিরাজ ও তৎপত্নী মালিনী ঠাকুরাণী, শ্রীমান সেন, বনমালী কবিরাজ (ঘোরাঘাট) ও তৎপত্নী হোরকী ঠাকুরাণী, রামচন্দ্র, পদকর্তা কবিশেখর রায়, পদকর্তা কবিরঞ্জন প্রভৃতি।

চৈতন্যচন্দ্রের কিরণ সম্পাতে শ্রীখণ্ডে একটি জ্যোর্তিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সমাজ বাঙ্গালার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এমন একটি ভূমিকা নিয়েছিল যে তার প্রভায় তৎকালীন বঙ্গদেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শ্রীখণ্ড থেকে নরহরি, মুকুন্দ ও রঘুনন্দন পুরীতে আসতেন মহাপ্রভু দর্শনে। শ্রীখণ্ডের কীর্তনীয়া সম্প্রদায় পুরীতে রথযাত্রার সময়ে কীর্তন নৃত্য করতেন।

> খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।
> নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥[১]

শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সমাজের প্রধান ছিলেন বৈদ্য-পরিবারের তিনজন—

> খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
> শ্রীনরহরি এই মুখ্য তিনজন ॥[২]

এই তিনজনই মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। মহাপ্রভু এই তিন ভক্ত পরিকরকে স্ব স্ব কর্ম ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি মুকুন্দকে বলেছিলেন,

---

১। চৈতন্য চরিতামৃত—২।১৩।৪৬
২। তদেব—২।১৫।১১২

'তোমার কার্য ধর্মে ধন উপার্জন'। রঘুনন্দনকে বলেছিলেন, 'রঘুনন্দনের কার্য কৃষ্ণের সেবন', আর নরহরি সম্বন্ধে বলেছিলেন,—

নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য সদা করহ তিনজনে॥[১]

মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ নরহরি সরকার পরবর্তী দুই বৈষ্ণব আচার্য ও চৈতন্য ধর্মপ্রচারক নরোত্তম দাস ও শ্রীনিবাস আচার্যকে প্রভাবিত করেছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য নরহরির প্রেরণায় ও প্রভাবে সর্বজন বরেণ্য বৈষ্ণব সাধক ও বৈষ্ণধর্ম প্রচারক হয়েছিলেন। নরহরি শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে উপলব্ধি করে তাঁর বিগ্রহ পূজা করেছিলেন এবং গৌরাঙ্গ পূজা পদ্ধতি 'শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা পটল' রচনা করেছিলেন। গৌরাঙ্গ ভজনার রীতি পদ্ধতি তাঁরই আবিষ্কার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার গৌরাঙ্গরূপী কৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পুরুষ। সমস্ত জীব নারীরূপে বা নায়িকারূপে একমাত্র উপাস্য পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভজনা করে থাকে—নদীয়া নাগরভাব বা গৌরাঙ্গ নাগরভাব নামে প্রসিদ্ধ এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে নরহরি গৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব জগৎসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। গৌরাঙ্গ নাগরভাবের বহু পদও তিনি রচনা করেছিলেন।

নরহরির শিষ্য লোচন দাস শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। নরহরি-প্রবর্তিত গৌরাঙ্গ-নাগর ভাবকে তিনি চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাখ্যা করেছেন। গৌরাঙ্গ অবতার না হলে প্রেমরস সীমা শ্রীরাধার মহিমা জগতে প্রচারিত হওয়া সম্ভব ছিল না, এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন ভক্ত নরহরি। তাই তিনি সুস্পষ্টভাবেই লিখেছেন—

যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে।

স্বরূপ দামোদর প্রবর্তিত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-ব্যাখ্যাত চৈতন্যলীলাতত্ত্বকে নরহরি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যের দিব্য সাধনায় শ্রীরাধার ভাবমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে পদাবলী রচনা, শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেবা এবং গৌরাঙ্গ পূজার মন্ত্র উদ্ধার ও পূজা

১। চৈতন্য চরিতামৃত—২।১৫।১৩০-৩২

পদ্ধতি রচনা—এই তিন পথে শ্রীচৈতন্যের মহিমা প্রচার হয়েছিল নরহরির জীবনের ব্রত। তিনি গৌরনাগর ভাবের বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছিলেন এবং শিষ্য লোচন দাসকে চৈতন্য জীবনী রচনায় প্রেরণা দিয়েছিলেন। বাসুদেব ঘোষ নরহরি সম্পর্কে লিখেছেন—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা কৈনু মনে।
সরকার ঠাকুরের অপার মহিমা
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥

বাসুদেব ঘোষের বক্তব্য অনুসারে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের তিনিই প্রথম রচয়িতা। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত, শ্রীচৈতন্য সহস্রনাম, গৌরাঙ্গ কলিকা ও ভাবনামৃত নামে গ্রন্থ রচনা করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন এবং গৌরাঙ্গ লীলাকে জনগণের মনের দ্বারে পৌছে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আদ্বিজচণ্ডালে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের জন্য আদর্শ বহন করেছিলের নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ। নরহরি নিজে অব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলকেই দীক্ষা দিয়ে শ্রীচৈতন্যের সমাজ-নীতিকে ব্যাপ্তি দিয়েছিলেন।

গৌরীদাস পণ্ডিত নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রাম থেকে অম্বিকা-কালনায় বসবাস করেছিলেন। সুবল মঙ্গল নামে একটি গ্রন্থ অনুসারে দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহচৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে নিত্যানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছিলেন। কিন্তু দেবকীনন্দনের বৈষ্ণব বন্দনা ও পাট নির্ণয় গ্রন্থে এবং গৌরগণোদ্দেশ নামক পুঁথিতে সূর্যদাস, গৌরীদাস ও কৃষ্ণদাস তিন ভ্রাতা। ভক্তিরত্নাকর অনুসারে মহাপ্রভু শান্তিপুর থেকে নৌকা করে অম্বিকায় এসে বৈঠাখানি গৌরীদাসকে অর্পণ করেছিলেন। তিনি গৌরীদাসকে স্বহস্তলিখিত গীতাও দিয়েছিলেন। বৈঠা ও গীতা এখনও কালনায় মহাপ্রভুর মন্দিরে রক্ষিত আছে।

গৌরীদাস ও তৎভ্রাতৃবর্গ নিত্যানন্দের সহায়তায় কালনায় একটি ভক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। গৌরীদাসই সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ বিগ্রহ পূজা করেছিলেন। গৌরীদাসের পালিত পুত্র এবং শিষ্য হৃদয়ানন্দ বা হৃদয়চৈতন্য কালনায় অবস্থান করে বিগ্রহপূজা এবং গুরুসেবা করতেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য

শ্যামানন্দ বা দুখিনী কৃষ্ণদাস ছিলেন হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য। অম্বিকা কালনা নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী নকুল ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন।

অম্বুয়ামুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী
পরম বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী।[১]

নকুল ব্রহ্মচারী ছিলেন মহাসাধক। তাঁর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হোত। তাঁর উপরে শ্রীচৈতন্যের আবেশ হয়েছে বলে লোকে মনে করতো। তিনি শ্রীচৈতন্যের আদেশে সর্বজনে কৃষ্ণনাম বিতরণ করতেন। গৌরীদাস পণ্ডিত ও তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, হৃদয়ানন্দ, নকুল ব্রহ্মচারী প্রমুখ সাধক ভক্তগণ কালনায় চৈতন্যভাবের আন্দোলনকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ— তিন ভ্রাতা ছিলেন নবদ্বীপ লীলায় শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী। পাট পর্যটন গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'অগ্রদ্বীপে তিন ভাই লভিল জনম।' কিন্তু কোন কোন পণ্ডিতের মতে এঁদের জন্মস্থান কুমারহট্ট, কারো মতে শ্রীহট্ট। শ্রীচৈন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিন ভ্রাতাই নীলাচলে রথযাত্রার সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং কীর্তন নর্তনে যোগদান করেছিলেন।

গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব ঘোষ—দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥[২]

তিন ভ্রাতার মধ্যে গায়ক হিসাবে মাধবের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। বাসুদেবের খ্যাতি ছিল গীতরচনায়।

শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥[৩]

শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছানুসারে গোবিন্দ প্রভুর সঙ্গে নীলাচলেই অবস্থান করেন।

১। চৈতন্যচরিতামৃত ৩৷২৷১৬।
২। চৈতন্যচরিতামৃত—১৷১৩৷৪২-৪৩।
৩। তদেব ১৷১১

আর মাধব ও বাসুদেব গৌড়ে ফিরে এসে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেছিলেন। মাধব শেষ জীবনে বাস করেছিলেন দাঁইহাটে। গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বসবাস করেন। বাসুদেব বাস করতেন তমলুকে।

অম্বিকা কালনা, অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাট, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, আমাইপুরা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বর্ধমানে যে বৈষ্ণব পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল শ্রীচৈতন্যের ভারতব্যাপী যে ভাবান্দোলন তথা নব-জাগরণে তার গুরুত্ব অপরিসীম। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, শ্রীচৈতন্যকেন্দ্রিক জাতীয় জাগরণে বর্ধমানের ভূমিকাই সর্বাধিক। শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবনের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, তাতেও বর্ধমান শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিল।

শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমময় জীবন তাঁর অনুরাগী ভক্তদের জীবনীকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। দৈব মহিমামূলক কাব্য রচনায় অভ্যস্ত বাঙ্গালী কবি স্বর্গের নন্দন কানন থেকে হাসিকান্নাভরা মর্তের কুটিরে দৃষ্টি ফেরালেন, রচনা করলেন, সেই মহামানবের চরিতগাথা, যিনি ধূলামাটির মানুষ হয়েও অমর্ত্যলোকের আভাস বহন করে এসেছিলেন মাটির পৃথিবীতে। চৈতন্যলীলার ব্যাসরূপে বন্দিত বৃন্দাবন দাস সর্বপ্রথম বঙ্গীয় ভাষায় রচনা করলেন শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন চৈতন্য ভাগবত। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি সবই বর্ধমানের মনীষার দান। বৃন্দাবন দাস ছিলেন লীলাসহচর শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী সম্ভবতঃ নলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণীর সন্তান। বৃন্দাবনের জননী নারায়ণী শিশুপুত্রকে নিয়ে নবদ্বীপের মালঞ্চ পাড়ার মাইল দুই উত্তর পশ্চিমে বাসুদেব দত্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীপাট মামগাছিতে বাস করতেন। বৃন্দাবনের বাল্য কৈশোর কেটেছে মামগাছিতে, শেষ জীবনে তিনি মন্তেশ্বরের নিকটে শ্রীপাট দেনুড়ে বসবাস করেন। সম্ভবতঃ দেনুড়ে বসেই তিনি চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। মামগাছি ও দেনুড় দুইই বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। আন্তরিক ভঙ্গিতে সহজ সরল ভাষায় শ্রীচৈতন্যের নদীয়া লীলার বিশদ বাস্তব বর্ণনার জন্য চৈতন্য ভাগবত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ। ভজন নির্ণয়, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার, চৈতন্য গণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ বৃন্দাবনের নামে প্রচলিত আছে।

বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক কালেই লোচন দাস চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। লোচন তাঁর পরিচয় বিস্তৃতভাবে প্রদান করেছেন গ্রন্থমধ্যে—

চারিখণ্ড কথা সার করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরাগুণগাথা॥

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে সম্ভবতঃ পিতৃমাতৃ বিয়োগে অনাথ হয়ে লোচন শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরহরির আদেশে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা অপেক্ষা পাঁচালী কাব্য ও মঙ্গল কাব্যের ঢঙে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির সাহাযো নরহরি প্রবর্তিত নদীয়া-নাগর ভাবের ব্যাখ্যা লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের বৈশিষ্ট্য। লোচন একজন উৎকৃষ্ট পদকর্তাও ছিলেন। গৌর পদতরঙ্গিণীতে তাঁর ৭১টি পদ সংকলিত হয়েছে। হাল্কা চালের আদি রসাত্মক গৌর-নাগর বিষয়ক পদগুলি ধামালি নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ লোচনই এই জাতীয় পদের স্রষ্টা। এ ছাড়াও দুর্লভসার, আনন্দলতিকা, দেহ নিরূপণ, চৈতন্য প্রেমবিলাস, ধাতুতত্ত্বসার, রাগলহয়ী, রাস-পঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ, বস্তুতত্ত্বসার, শিবদুর্গা সংবাদ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি লোচনের নামে প্রচলিত।

আমাইপুরানিবাসী চৈতন্যভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র জয়ানন্দ মঙ্গলকাব্যের ঢঙে ঐতিহাসিক পটভূমি, তথ্য এবং নানাবিধ অদ্ভুত অজ্ঞাত ঘটনার সমবায়ে রচনা করেছিলেন চৈতন্য-মঙ্গলকাব্য জনসভায় গান করার উদ্দেশ্যে। কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটী গ্রামের নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে রূপ সনাতন, রঘুনাথ দাস, প্রভৃতি গোস্বামীদের ইচ্ছা পূরণ কল্পে বৈষ্ণব দর্শন, চৈতন্যজীবনী ও কবিত্বশক্তির সমন্বয়ে রচনা করেছিলেন অসাধারণ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত। তিনি গোবিন্দলীলামৃত নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি মূল্যবান কাব্যও রচনা করেছিলেন এবং সারঙ্গ-রঙ্গদা নামে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা রচনা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার খুঁটিনাটি তথ্যে পূর্ণ বিতর্কিত গ্রন্থ কড়চার লেখক গোবিন্দ দাস কর্মকার ছিলেন বর্ধমানের কাঞ্চন-নগরবাসী।

শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারাম দাসের পুত্র নিত্যানন্দ দাস। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী বীরচরিত ও শ্রীনিবাস আচার্যের জীবনী প্রেমবিলাসের রচয়িতা।

এই যুগে পদাবলী সাহিত্যেরও চরম বিকাশ হয়েছিল। শ্রীখণ্ডের নরহরি, লোচন, অগ্রদ্বীপ দাঁইহাটের বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। পদাবলী সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস বর্ধমান জেলায় গৌরব। কাঁদড়া নিবাসী জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের উত্তরসাধক হিসাবে আন্তরিকভাবে আক্ষেপানুরাগ ও রসোদ্গারের পদে এবং শ্রীখণ্ড নিবাসী দামোদর সেনের দৌহিত্র ও চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দ দাস কবিরাজ ব্রজবুলি ভাষার পদরচনায় বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও অভিসারের পদরচনায় অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি। এঁদের রচনা যে কোন সাহিত্যেরই সম্পদ।

জনশ্রুতি অনুসারে শ্রীখণ্ড ২৮৫ জন কবির জন্মভূমি। সংখ্যার বিচারে অতিশয়োক্তি থাকলেও শ্রীখণ্ডে বহু বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ, বলরাম দাস, গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্য সিংহ, পৌত্র ঘনশ্যাম দাস, কবিরঞ্জন প্রভৃতি শ্রীখণ্ডের পদকর্তা। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবাচার্য রঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীখণ্ডের রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান রামগোপাল দাস নরহরি শাখা নির্ণয় ও রঘুনন্দন শাখা নির্ণয় নামে গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রামের অধিবাসী মনোহর দাস অনুরাগবল্লী নামে গ্রন্থের লেখক। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর দাস লিখেছিলেন রসমঞ্জরী। শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ভুক্ত কবিবল্লভ রসকদম্ব নামে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতও একজন পদকর্তা। দোগাছিয়া নিবাসী বলরাম দাসও একজন পদকর্তা। কাটোয়ার নিকটবর্তী মালিহাটি গ্রামের বৈদ্যবংশজাত যদুনন্দন কর্ণানন্দ, রাধাকৃষ্ণ লীলা রসকদম্ব, গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীচৈতন্যের প্রতিবেশী ও ভক্ত বংশীবদন চট্ট ছিলেন পদকর্তা এবং বাগনাপাড়া নিবাসী। বংশীবদন ও তাঁর পুত্র পৌত্রদের সাধনায় বাগনাপাড়া বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়েছিল। বাগনাপাড়ার অকিঞ্চন দাস বিবর্তবিলাস নামে সহজিয়া সাধনা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কাটোয়ার নিকটবর্তী সিঙ্গীগ্রাম নিবাসী মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে রচনা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্য। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর রচনা করেছিলেন জগৎমঙ্গল কাব্য। ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে যে ভাবজাগরণের জোয়ার এসেছিল, তার রেশ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যগণ যেমন চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের পরিবারে, মণিপুরে ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত করেছিলেন, বৈষ্ণবীয় সাহিত্যও এই সময়ে কিছু কিছু রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় মানকরের নিকটবর্তী মাড়ো গ্রামের অধিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে গৌরাঙ্গ চম্পু, সদাচার নির্ণয়, দুর্জনমিহির কলংক, গোবিন্দচরিত, ভক্তলীলামৃত, গোবিন্দ মাধবোদয়, স্তবকদম্ব, কৃষ্ণকেলিসুধাকর, সূক্তমাল্য এবং বাঙ্গালা ভাষায় পদাবলী, কৃষ্ণলীলা কাব্য রাধামাধবোদয় এবং বৃহৎ রাম রসায়ন (রামায়ণ) রচনা করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে শ্রীখণ্ডে যে ভাবের উদ্দীপনা জেগেছিল, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। পেশায় মুনসেফ জগদীশ্বর গুপ্ত ১৮৪৫ খ্রীঃ শ্রীখণ্ডের মেহেরপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সটীক চৈতন্য চরিতামৃত, লীলাস্তবক, চৈতন্যলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে এবং নব্যভারত পত্রিকায় মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালার জাগ্রত চেতনার উত্তরসাধক হয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডনিবাসী, পরিণত বয়সে নবদ্বীপবাসী রাখালানন্দ ঠাকুর (জন্ম শ্রীখণ্ডে ১৮৬৭ খ্রীঃ) শ্রীচৈতন্য সহস্রনাম স্তোত্রের টীকা ও বঙ্গানুবাদ, শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা পটলের টীকা ও বঙ্গানুবাদ, হরিনামামৃত সংজ্ঞা প্রকরণের টীকা, হংসদূতের টীকা, রসামৃত সিন্ধুশেষ, শ্লোকমালা ও পদাবলী রচনা করে উক্ত ধারাকেই সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের বংশধর সংকীর্তনাচার্য গৌরগুণানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। তিনি স্বগ্রামবাসী ও নানা স্থান থেকে আগত বহু ছাত্র-শিষ্যকে নিয়ে শ্রীখণ্ডে একটি কীর্তন পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীচৈতন্য সঙ্গীত, শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থদ্বয় ও পদাবলী রচনা করে শ্রীখণ্ডের গৌরবদীপ্তি অম্লান রেখেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালনা নিবাসী মহাসাধক

বৈষ্ণবাচার্য ভগবান দাস বাবাজী কালনায় চৈতন্য ভাবধারাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গালীর জীবনে যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর যুগান্তকারী আবির্ভাব বাঙ্গালীর চিত্তভূমিকে উর্বরা করেছে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। সেই ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্ধমান নবজাগরণের শরিক হয়ে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারা প্রচারে ও বিকাশে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বর্ধমান

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালীর যে নব জাগরণ ঘটেছিল তা প্রধানতঃ কলিকাতা-কেন্দ্রিক। এই জাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন তুইজন মনীষী—একজন রাজা রামমোহন রায় ও অপরজন জন্মসূত্রে পর্তুগীজ হলেও মনেপ্রাণে ভারতীয় হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুলাই স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস স্থরু করেছিলেন। তাঁর বেদান্ত প্রতিপাদ্য একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তা, যুক্তিবাদী দার্শনিকতা, উদার মতবাদ, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি তাঁকে নবযুগের পুরোহিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রামমোহন যে একেশ্বরবাদী ধর্মের আন্দোলনের স্থচনা করেছিলেন, তাকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনরূপে সারা ভারতে ব্যাপ্ত করেছিলেন।

রামমোহনের কৃতিত্ব অস্বীকার না করেও বলা যায় হিন্দু কলেজের শিক্ষকরূপে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী শিক্ষা এবং সম্মোহনী বক্তৃতায় ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে নূতন ধ্যানধারণা ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন তারই ফলে তৎকালীন বঙ্গদেশে এক অসাধারণ জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও একাডেমিক এসোসিয়েসন নামে একটি আলোচনা সভা স্থাপন করেন। কলেজ ছাড়াও এই সভায় ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম, দর্শন, কাব্য-সাহিত্য, স্বদেশ প্রেম, পাপ-পুণ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, সত্যবাদিতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে আলোচনা, বিতর্ক, প্রবন্ধপাঠ

নিয়মিত ব্যাপার ছিল। ডিরোজিও প্রতিভার যাদুতে সেকালে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রধানতঃ তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী শিক্ষার ফলেই হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে অনেকে নাস্তিক হয়েছিলেন, অনেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে সুরু করেছিলেন। কেউ কেউ খ্রীষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছিলেন। রাধানাথ শিকদার রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতিও তাঁর ক্লাশে বক্তৃতা শুনতেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ডিরোজিও হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঐ বৎসরই ২৬শে ডিসেম্বর ডিরোজিওর মৃত্যু হয়। মাত্র পাঁচ বৎসরেই ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নূতন ভাবের আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

ডিরোজিওর ছাত্র ও অনুগামীরা ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছিলেন। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যে নূতন চেতনা সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তারই ফলে ধর্মের আন্দোলনে, সমাজসংস্কারে, সাহিত্যে, দার্শনিক চিন্তায় নবযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল তাঁর প্রভাব সক্রিয় ছিল। ইয়ংবেঙ্গল সেকালে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে যেমন প্রভূত উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বহু অসাধারণ প্রতিভাধব মনীষীর আবির্ভাব তৎকালীন বাংলাদেশকে ভারতের সর্বোচ্চ গৌরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইয়ংবেঙ্গল দলের উপরে পাদ্রী ডফের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ডিরোজিও শিষ্যদের মধ্যে মহেশ চন্দ্র ঘোষ প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। কিছু পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাদ্রী ডফ তেরোজন যুবককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন লালবিহারী দে। ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েসন ও রামমোহনের আত্মীয় সভা (১৮১৫ পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজ) বাঙ্গালার নবজাগরণের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। নবজাগরণের এই উদ্দীপনায় বর্ধমানও বিশেষ অংশীদার হয়েছিল।

নবজাগরণের যুগের দুই প্রধান পুরুষ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও অক্ষয়কুমার

ও বর্ধমান জেলার সন্তান। বর্ধমান জেলার সোনাপলাশীতে লালবিহারীর (১৮২৪-৯৪) জন্ম। পাদ্রী ডফ্ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত (১৮৪৩) লালবিহারী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং হুগলী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত জমিদারের শোষণ সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Bengal Peasant Life বা গোবিন্দ সামন্ত। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে Folk Tales of Bengal, বাসর যামিনী গীতিনাট্য প্রভৃতি।

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) জন্মগ্রহণ করেছিলেন পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী চুপি গ্রামে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করলে (১৮৪০) অক্ষয়কুমার উক্ত পাঠশালায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৪৩)। তিনি একটি আত্মীয় সভাও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (১৮৫৩)। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে চেয়েছিলেন এবং নিজেও অনেকগুলি ইতিহাস বা বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা-ধর্মী রচনার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষার মত কমনীয়তা তাঁর রচনায় না থাকলেও তিনিই বাঙ্গালা গদ্যে মননশীল গবেষণাধর্মী রচনার উপযোগী দৃঢ় সংযত রূপ দান করেছিলেন।

ডিরোজিয়ানদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রামতনু লাহিড়ী বর্ধমানে বসবাস করেছেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ ডেপুটি কালেক্টররূপে বর্ধমানে এসে অনেকদিন বাস করেছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সরকারের সাহায্যে বর্ধমানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জে. ওয়ার্ডের নামানুসারে ওয়ার্ড্‌স্ ইন্‌স্টিটিউসন নামে পরিচিত হয়। এই বিদ্যালয়ে তৃতীয় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন রামতনু লাহিড়ী। রসিককৃষ্ণ ও রামতনু দুই বন্ধুতে বর্ধমানে একত্র বাস করতেন। বর্ধমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে রামতনু ও রসিককৃষ্ণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

নবজাগরণ আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, যুক্তিবাদ এবং স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। বর্ধমানের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের সংযোগ স্থাপিত হয়। বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র, জ্যেষ্ঠা

মহিষী নানকী দেবী, তাঁর পুত্র প্রতাপ চাঁদ, অন্যতমা মহিষী কমলকুমারী জীবিত থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সে কমলকুমারীর ভ্রাতা এবং বর্ধমানের দেওয়ান পরাণচাঁদ কাপুরের বালিকা কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। তেজশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর মহারানী বসন্তকুমারী বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে একপ্রকার বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। কোন এক বসন্ত পঞ্চমীর মহোৎসবে দক্ষিণারঞ্জন বর্ধমানে আমন্ত্রিত হয়ে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এই সময়েই সদর আদালতের উকিল দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে বসন্তকুমারীর যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং বসন্তকুমারী দক্ষিণারঞ্জনের সাহায্যে স্বীয় বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য গোপনে পরামর্শ করে দুইজন দাসী ও একজন পুরুষ আত্মীয়সহ দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে বর্ধমান ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে পরাণচাঁদ ও কমলকুমারীর চেষ্টায় বসন্তকুমারী পুনরায় রাজপ্রাসাদে নীতা হয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে সদর আদালতে বসন্তকুমারীর বিষয় সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মোকদ্দমা করেন। সদর আদালতের আদেশে বসন্তকুমারী বিনা বাধায় কলিকাতায় আগমণ করেন। বসন্তকুমারীর প্রতি দক্ষিণারঞ্জনের সহানুভূতি ও সমবেদনা এবং দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি বসন্তকুমারীর বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা ক্রমে গভীর প্রেমে পরিণত হয়। দক্ষিণারঞ্জন মনে করতেন যে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা হিন্দুমতে তিনি বিধবা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেছিলেন। পরে তৎকালীন কলিকাতার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্চের সম্মুখে সাক্ষী রেখে তিনি সিভিল ম্যারেজ নামক বিবাহ করে অসবর্ণ বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করেছিলেন। বিবাহের পরে মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হয় এবং মহারানী বসন্তকুমারী বর্ধমান রাজকোষ থেকে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকুমারীর মৃত্যু হয়।[১] বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পূর্বেই দক্ষিণারঞ্জন একইসঙ্গে অসবর্ণ এবং বিধবা বিবাহ করেছিলেন।

বাঙ্গালার নবজাগরণের প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান বর্তমানে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে হলেও তৎকালে রাধানগর ছিল বর্ধমানের অন্তর্গত ভুরশুট পরগণায় অবস্থিত। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন বর্ধমানের

১। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ, সম্পাদক অলোক ঘোষ, ঋদ্ধি ইণ্ডিয়া প্রকাশিত, ১৯৮২, পৃঃ ৩৭ -৪৪।

মহারানী বিষ্ণুকুমারীর গুরু ও মোক্তার। সুতরাং রামমোহন রায়কে বর্ধমান জেলার সন্তান বললে ভুল হয় না। সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য বর্ধমানে এসেছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রকৃত রূপকার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে দামোদরের উপর দিয়ে নৌকাযোগে বর্ধমান এসেছিলেন। বর্ধমান রাজ মহতাবচাঁদ স্বয়ং মহর্ষিকে আপ্যায়ন করেন এবং রাজবাড়ীতে আতিথ্য স্বীকারের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে মহতাবচাঁদ দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই বর্ধমান রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ সালে সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজের আমন্ত্রণে দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় বর্ধমানে এসেছিলেন এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ষাঁড়খানা গলিতে বিরাট আকারে ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই স্কুল মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়।[১] নবজাগরণের অন্যতম অঙ্গ যে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন, বর্ধমান তাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

নবজাগরণে বর্ধমানের রাজ পরিবারও অংশ গ্রহণ করেছে। তেজশ্চন্দ্র এবং মহতাবচাঁদ শিক্ষা বিস্তারে মহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তেজশ্চন্দ্রের চেষ্টায় ভারত প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী (১৮১৫) এবং ভার্নাকুলার স্কুল (১৮১৭) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয় বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। মহতাবচাঁদের চেষ্টাতেই রাজ কলেজিয়েট স্কুল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে (১৮৫৪) উন্নীত হয়। মহতাবচাঁদ বর্ধমানে ও অম্বিকা কালনায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বর্ধমানে স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেকটর ছিলেন কালিদাস মৈত্র ও নবজাগরণের যুগের অন্যতম মনীষী হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কালিদাস মৈত্রের তত্ত্বাবধানে ৩৫টি স্কুল ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ৪০টি স্কুল ছিল। তাছাড়া একটি গুরুট্রেনিং স্কুলও বর্ধমানে স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন (১৮৬৪)। এ ছাড়াও বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য মহতাবচাঁদ অনেকগুলি নৈশ বিদ্যালয়, আর্ট স্কুল ও ব্যায়ামের আখড়া স্থাপন করেছিলেন।[২]

১। বর্ধমান পরিক্রমা—সুধীরচন্দ্র দাঁ, পৃঃ ২৮৬-৮৭।
২। তদেব পৃঃ ২৮৯-২৮৩।

বাঙ্গালার রেনেসাঁসের অন্যতম প্রাণপুরুষ শিক্ষা সংস্কারক, বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, সাহিত্যিক, গদ্যের স্রষ্টা, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বর্ধমানের আত্মিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের প্রধান পরিদর্শক হওয়ার পর তিনি বর্ধমানে এসেছিলেন। বর্ধমানে পার্কাস রোডের (বর্তমানে মহম্মদ ইয়াসিন রোড্) একটি বাড়ীতে থাকতেন। বর্ধমান জেলায় তিনি পাঁচটি মডেল স্কুল ও এগারোটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রসুলপুরে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। রসুলপুরে তিনি বন্ধু উমেশচন্দ্র তর্কালংকারের বাড়ীতেও যেতেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনের পরে প্রত্যাবর্তনের সময় গাড়ী উল্টে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। সুস্থ হওয়ার পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত তিনি কিছুকাল পরম মিত্র প্যারীচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে অবস্থান করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বর্ধমানের জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। প্যারীচাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরকে বর্ধমানে যেতে হোত।

১৮৬৮ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া জ্বর মহামারীর আকার ধারণ করলে মানবদরদী কোমলপ্রাণ বিদ্যাসাগর স্থির থাকতে পারেন নি। তিনি এই মহামারীর ঘটনা ছোটলাট গ্রে সাহেবের কাছে জানিয়েছিলেন, নিজে বর্ধমানে ডিস্‌পেনসারি খুলে রোগীদের ঔষধ পথ্য ও অর্থসাহায্য করতেন। প্রায় দু হাজার টাকার কাপড়ও তিনি দান করেছিলেন। বর্ধমানে বসেই তিনি ভ্রান্তিবিলাস নামক কৌতুকরসাশ্রিত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।[১]

বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচাঁদ বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। ফলে আন্দোলন অনেকটা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছিল। বিদ্যাসাগর মহতাবচাঁদকে **the first man of Bengal** আখ্যা দিয়েছিলেন।[২] মহতাবচাঁদ নব্যবঙ্গীদের মতই উদার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন। বর্ধমানের রাজ পরিবারে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও মহতাবচাঁদ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লেজিস্‌লেটিভ্ কাউনসিলে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে দরখাস্ত

১। বিদ্যাসাগর—বিহারীলাল সরকার, নবপত্র সং, পৃঃ ২৮২-২৮৯
২। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, বিনয় ঘোষ, ওরিয়েন্ট লংম্যান সং, পৃঃ ২৬১

করেছিলেন। "In 1855 the Maharaja of Burdwan presented a petition to the Legislative Council setting forth the monstrous evils arising from the practice of unrestricted polygamy especially among the kulins".[১]

এই সময়ে নবযুগের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত তাঁর বাসায় আসতেন। এই সকল মনীষীদের সমাগমে বর্ধমান অবশ্যই নবজাগৃতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছিল। বিদ্যাসাগরের বন্ধুও বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগী চুপি নিবাসী অক্ষয়কুমার দত্ত নূতন যুগে গদ্যরচনার অন্যতম স্তম্ভ।

নবজাগরণের যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বহুমুখী বিকাশ ঘটেছিল, বর্ধমানের ভূমিকা সেখানেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে একত্রে সম্বাদকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক, পরে রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭—১৮৪৮ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার উখরার নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে। কলিকাতা কমলালয়, নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক রচনার দ্বারা তিনি যেমন বিদ্যাসাগরেরও পূর্বে সহজ ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক রচনার পথিকৃৎ তেমনি উপন্যাস রচনার পথও প্রদর্শন করেছিলেন।

ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স রচনার পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের পদাংক অনুসরণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)। ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ্, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদক ও ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতা, মাধবী কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা রচনা করে নবজাগৃতির যুগে অন্যতম প্রতিভাধর ঔপন্যাসিকের গৌরবে বঙ্গসাহিত্যকে তথা বর্ধমানকে গৌরবান্বিত করেছেন। রমেশচন্দ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার অন্বাপুর গ্রামে। বর্ধমান জেলার অন্যতম গৌরব এই যুগেরই অন্যতম কৃতী পুরুষ বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনীচরিত, চিনিবাস চরিতামৃত প্রভৃতি বিচিত্র রসের উপন্যাস স্রষ্টা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর (১৮৫৪-১৯০৫) জন্মস্থান মেমারির নিকটবর্তী ইলসবা গ্রামে মাতুলালয়ে।

১। Renascent India—Dr. Rames Chandra Mazumdar, 1976, Page 92.

তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল দামোদর তীরবর্তী বেড়ুগ্রামে। এই যুগেরই অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি এবং পঞ্চানন্দ বা পাঁচুঠাকুর ছদ্মনামে ব্যঙ্গ লেখক, কল্পতরু, পাঁচু ঠাকুর ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থ লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) জন্ম বর্ধমান জেলার পাণ্ডুগ্রামে। তিনি কাটোয়ার নিকটবর্তী গঙ্গাটিকুরিতে বাস করতেন। নবজাগরণের অন্যতম প্রধান বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যুক্তিবাদী মানবতাবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসূত্রে বর্ধমান জেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

নবজাগরণের যুগের প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন আখ্যায়িকা কাব্য রচনা করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) বাঙ্গালা কাব্যে নূতন যুগের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮) রচনা করে তিনি মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। কালনার নিকটবর্তী বাবুলিয়ার মাতুলালয়ে রঙ্গলালের জন্ম ও বাল্যকাল অতিবাহিত। তাঁর পৈতৃক নিবাস কালনার নিকটবর্তী রামেশ্বর-পুর গ্রামে।

ধর্মীয় আন্দোলনে, সমাজ সংসারে, শিক্ষার প্রসারে, এবং নবযুগের ভাবধারা-বাহী সাহিত্যসৃষ্টিতে স্বদেশ প্রেমের জাগরণে, নবজাগরণের প্রাণ-স্পন্দন বর্ধমানে যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হয়েছিল। এই প্রাণস্পন্দন বাঙ্গালার নবজাগরণকেও প্রাণবন্ত করেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান

ইংরাজ সরকারের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন তার প্রকৃত সূচনা হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জনের হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ ও মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গকে পৃথক প্রদেশ হিসাবে অখণ্ড বঙ্গভূমিকে দ্বিধা বিভক্ত করার প্রয়াসের প্রতিবাদে। এই আন্দোলনে প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মনীষী রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরে এই আন্দোলন বিদেশী পণ্য বর্জনের মাদকতায় পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গ রহিত করার এই আন্দোলন ক্রমে ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ ধারণ করে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল আংশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ

করা। পূর্ণ স্বরাজের দাবী আসে আরও অনেক পরে। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিবোধ যখন জনমানসে জাগ্রত হয় নি, সেই সময় কয়েকজন সাহিত্যিকের মনোদর্পণে তার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। জন্মসূত্রে বিদেশী হলেও হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই **Mother Land** বলে ঘোষণা করে একটি কবিতায় জন্মভূমির দুঃখে অশ্রুমোচন করেছিলেন। আধুনিক যুগের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রথম পরাধীনতার বেদনা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পরাধীনতার জ্বালা তীব্র ভাবে প্রকাশিত বর্ধমান জেলার কবি, ইংরাজী প্রভাবিত প্রথম বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যে (১৮৫৮)। রঙ্গলাল স্পষ্ট ভাষায় পরাধীনতার বেদনাকে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

রঙ্গলাল ঘোষণা করলেন যে 'দিনেতে স্বাধীনতা স্বর্গসুখ'। বঙ্কিমচন্দ্রের পরই প্রাজ্ঞ ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা উপন্যাসদ্বয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জলন্ত উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়েছিল বর্ধমান শহরে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন অম্বিকা চরণ মজুমদার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বর্ধমানে ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের আর একটি অধিবেশন হয়েছিল।

ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের জন্মের পূর্বে ১৮৭৬ সালে কলিকাতায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের তিনটি শাখা বর্ধমান জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়—বর্ধমান ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, কালনা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং পূর্বস্থলী হিতকরী সভা। কালনা থেকে কাটোয়ার মধ্যে জাতীয় আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। উপেন্দ্রনাথ হাজরা, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং উপেন্দ্রনাথ সেনের উদ্যোগে কালনার মহিষমর্দিনী তলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে

বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বর্ধমানের জননেতা আবুল কাশেম প্রভৃতি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলনে পরিণত হলে বাঘনাপাড়ার পাঁচজন সাহসী যুবক—গৌরগোবিন্দ গোস্বামী, ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় ও বলাইচাঁদ গাঙ্গুলী বিদেশী বস্ত্র লুণ্ঠন করে ভস্মসাৎ করেছিলেন। এই অপরাধের জন্য এঁরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কালনা অঞ্চলে প্রথম স্বদেশী কাপড়ের দোকান খুলেছিলেন শ্যামলাল গোস্বামী। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালনার পাথুরিয়া ঘাটায় স্বদেশী ভাণ্ডার খুলেছিলেন। এই স্বদেশী ভাণ্ডার পরে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় পরিণত হয়েছিল। কালনার অন্তর্গত ভগবানপুরনিবাসী উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী এবং উকিল পূর্ণচন্দ্র দত্ত স্বদেশী কাপড় তৈরীর জন্য তাঁত বসিয়েছিলেন। কৃষ্ণধন রায় নামে এক অশীতিপর বৃদ্ধও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ হাজরা রাঢ় অঞ্চলে বিপ্লববাদ প্রচার করতেন।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি অঙ্গ বিলাতি পণ্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণের প্রয়াস ও বিপ্লবাত্মক কর্ম। অপর অঙ্গ ইংরাজের কেরানী গড়ার কারখানা, যাকে গোলামখানা বলা হোত, সেই ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিবর্তে দেশের সর্বত্র জাতীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন। এই উদ্দেশ্যে রাসবিহারী ঘোষ বিপুল অর্থ দান করেছিলেন। অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কালনা অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। এঁরা ন্যাশন্যাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। পরে নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, রমাপতি রায় ও বলাইচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় ন্যাশন্যাল কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। কালনা, উপলতি, বর্ধমান সদর ও বৈকুণ্ঠপুরে চারটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

স্বদেশী আন্দোলন অল্পকালের মধ্যেই সন্ত্রাসবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থীরাও সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বর্ধমান সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বর্ধমানের যে সকল যুবক সন্ত্রাসবাদে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিন বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বর্ধমানের চান্না গ্রাম। তিনি প্রথম

জীবনে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে গোয়ালিয়রের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শিখে বোমা তৈরী করার কৌশল রপ্ত করে বিপ্লবী আন্দোলনের সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প করেছিলেন। পরে সোহহং স্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে নিরালম্ব স্বামী নামে প্রসিদ্ধ হন। বান্ধব সমিতি, মহামায়া সমিতি, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি প্রভৃতি নামে কালনা, পূর্বস্থলী, মন্তেশ্বর অঞ্চলে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। যুগান্তর সমিতির নেতা ছিলেন বীরেন্দ্রকুমার মল্লিক ও কার্তিক দত্ত। স্বামী বিদ্যানন্দ অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁরা স্বদেশী ডাকাতিতেও অংশ গ্রহণ করতেন। সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে রাসবিহারী বসু ও বটুকেশ্বর দত্ত বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গদেশের বাইরে এঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছিল।

জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কাটোয়া অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দক্ষ সংগঠক, অনন্য সাধারণ বাগ্মী স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় জিতেন্দ্রনাথ মিত্র কালনা কাটোয়া ও আসানসোল মহকুমার কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯০৬ সালে বর্ধমানের রেলকর্মীরা রেলধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ যুগান্তর দলের ক্রিয়া-কলাপ বর্ধিত হয়। সরোজ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী সিয়ারসোলে একটি গুপ্তসমিতি গঠন করেছিলেন, বলাই দেবশর্মা (গাঙ্গুলী), যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা এবং জিতেন্দ্রনাথ মিত্র পরে সম্পূর্ণরূপে গান্ধীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। বলাই দেবশর্মা ও সুকুমার মিত্র পরে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত হন।

অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন এবং মানকরের জমিদার রাধাকান্ত দীক্ষিত। ফকিরচন্দ্র রায় স্বদেশী আন্দোলনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। ইংরাজের শাসনকালে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য বর্ধমানের প্রয়াস অগ্রপথিকের। বর্ধমান শহরে দুবার প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। প্রখ্যাত আইনজীবী নলিনাক্ষ বসুর উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে এই সম্মেলন সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী।

বর্ধমানে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন অরবিন্দ প্রকাশ

ঘোষ। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শশিভূষণ রায়চৌধুরীর প্রভাবে তিনি স্বদেশের মুক্তিব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হিন্দু স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করেন। কালনা, বেলেরহাট, পাঁচরকি, আকাল পৌষ, বৈদ্যপুর, বাঘনাপাড়া, ধাত্রীগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য কালনার প্রসিদ্ধ কবিরাজবংশীয় উপেন্দ্রনাথ সেন ও দেবেন্দ্রনাথ সেন, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, ললিত মোহন ঘোষাল প্রভৃতি নেতৃবর্গকে কালনায় আহ্বান করে এক বিরাট সভার আয়োজন করেছিলেন। এই সময়ে যুবক ও বালকেরা মাথায় করে স্বদেশী কাপড় বিক্রী করতেন। কালনার মোক্তার উপেন্দ্রনাথ হাজরা চৌধুরী ও উকিল পূর্ণচন্দ্র দত্ত স্বদেশী তাঁত স্থাপন করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ উত্তররাঢ়ে বিপ্লববাদ প্রচার করেছিলেন। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সার্ভেন্ট পত্রিকা সম্পাদনা করে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

মানকরের জমিদার রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত ছিলেন দুর্গাপুর মহকুমার প্রথম জমিদার, যিনি ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাধাকান্ত দীক্ষিত বর্ধমান জেলার কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। দুর্গাপুরের টালি কোম্পানীর পরিচালক ভোলানাথ রায় দুর্গাপুরের স্বদেশী আন্দোলনে অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে। গোপালপুর গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনে পথিকৃৎ ছিলেন গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রজীবনে বৈপ্লবিক কবিতা লেখার জন্য তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পরে গোপালপুর স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজকে স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

গোপালবাবুর ছাত্র ও স্বদেশপ্রেমিক ডাঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কৈশোরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি রাণীগঞ্জের বল্লভপুরে বেঙ্গল পেপার মিলের ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহ-সম্পাদক হন। পেপার মিলে এক শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্বদানকালে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল (১৫।১১।৩৮)। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সহযোগী ছিলেন ধবনীগ্রামের হাজারীলাল মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের নির্দেশে মাদক দ্রব্য বর্জন

ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে পিকেটিং করার অপরাধে এবং লবণ আইন অমান্য করার অপরাধে তিনি একাধিকবার সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে তাঁকে তাম্রপত্র ও স্বাধীনতাসংগ্রামীর ভাতা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল (১৯৭৩)।

হাজারীলালের সহকর্মীদের মধ্যে কাঁকসা থানার প্যারীগঞ্জের কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়। ধবনী গ্রামের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আর একটি স্বদেশী আন্দোলনের দল গড়ে ওঠে। এই দলের কিছু কিছু সদস্যের সঙ্গে গুপ্ত কাজকর্ম চলতো, গোপনে আগ্নেয়াস্ত্রও সংগৃহীত হোত। ভিড়িঙ্গীগ্রামের স্বদেশী আন্দোলনের পরিচালক গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ ইন্‌স্টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক রাম বন্ধু পট্টনায়ক। রামভদ্র স্বদেশী ভাবের কাব্য ও নাটক লিখে নাট্যাভিনয়ের দ্বারা স্বদেশীভাব প্রচারের আয়োজন করেছিলেন।

রাণীগঞ্জে ভীমাচরণ রায় প্রতিষ্ঠিত সরস্বতী কর্মমন্দির ছিল এই অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র। মেজেডিহি গ্রামের অধিবাসীরা সরস্বতী কর্মমন্দিরের আদর্শে সরস্বতী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করা হোত স্বদেশ প্রেমমূলক নাটক অভিনয় করে। উখরার নিবারণ ঘটক, মলানদীঘির ব্রহ্মপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল পুরের প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডালের হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, করঙ্গপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র কেশ প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তি স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি হন। বর্ধমানের মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আবুল কাসেম পরে দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে আবুল কাসেম ও মহম্মদ ইয়াসিন চিরস্মরণীয়। কচি মিঞা রাণীগঞ্জে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ঘোলা গ্রাম নিবাসী সুবক্তা দক্ষ সংগঠক আবদুস সাত্তার জেলা কংগ্রেসের নেতা হয়েছিলেন। পরে ইনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। কাটোয়ার গুণীন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র রায়, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল প্রভৃতি বারংবার কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।

১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তিলক স্বরাজ ফাণ্ডে টাকা তোলার জন্য বর্ধমানে এসেছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন মহম্মদ ইয়াসিন, আবুল কাসেম, অনিলবরণ রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। গান্ধীজীর আদর্শে অবিচল আস্থা রেখে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন যাদবেন্দ্র পাঁজা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিজয় ভট্টাচার্য গান্ধীজীর অনুসরণে গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করে কলানবগ্রামে শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৫ সালের ৮ই মে গান্ধীজী বর্ধমানে এসে মহারাজ বিজয়চন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। বিজয়চন্দ্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। চকদীঘির জমিদার মণিলাল সিংহও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে বর্ধমান টাউন হলে যে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, সেই সভায় অভিনন্দন পত্র পাঠ করেছিলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ভামিনীরঞ্জন সেন। ইংরাজ সরকারের উকিল সন্তোষকুমার বসু খদ্দরের পোষাক পরে গান্ধীজীর পদপ্রান্তে বসেছিলেন। বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন গোলাম মহম্মদ, কচি মিঞা প্রভৃতি গান্ধী টুপি পরে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। এই সময়ে যাদবেন্দ্র পাঁজা, কাটোয়ার অন্নদাপ্রসাদ সাহা, ডাঃ গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরেরাম মণ্ডল, কালনার গোপেন কুণ্ডু, রাণীগঞ্জের ভীমাচরণ রায়, বরাকরের কালুরাম মাড়োয়ারী, চুরুলিয়ার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯২০ থেকে ৩০ সালের মধ্যে বর্ধমানে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করেছিল। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে বর্ধমাম শহরে পূর্ণস্বরাজ দাবী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। যাদবেন্দ্র পাঁজা, আবুল হায়াত, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিজয় ভট্টাচার্য এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সরোজ মুখোপাধ্যায়, দাশরথি তা, আবদুস সাত্তার, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শ্রীকুমার মিত্র, বলাইদেব শর্মা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন সংগঠক। প্রকৃতিভূষণ গুপ্ত, ভীমাচরণ রায়, ফকিরচন্দ্র রায়, প্রণবেশ্বর সরকার, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন বিশ্বাস প্রভৃতি ছাত্র যুবক দল স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অগ্নিক্ষরা ভাষায় পরাধীনতা অন্যায় অসাম্য অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কবিতা ও গান লিখে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। বিদ্রোত্মক

কবিতা ও সঙ্গীত রচনার অপরাধে তিনি কারাদণ্ডিতও হয়েছিলেন।

রাণীগঞ্জের সরস্বতী কর্মমন্দিরের তরুণ কর্মিবৃন্দও স্বাধীনতা আন্দোলনে অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। পাতিলপাড়া নিবাসী কবি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সরস্বতী কর্মমন্দিরের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তাঁর মন্দিরের চাবি কাব্যগ্রন্থ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কংগ্রেস নেতা। তিনি এসেমব্লিতে কংগ্রেসী সদস্য ছিলেন। আসানসোল নিবাসী নিবারণচন্দ্র ঘটক ও তাঁর মাতৃস্বসা ছকড়ি দেবী বিপ্লবী আন্দোলনে সংযুক্ত থাকায় অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

দুর্গাপুর সগরভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের তন্তুবায় শ্রেণী ইংরাজ শাসনে ও শোষণে চরম দুরবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। ১৯৩০-৩১ সালে জ্যোতিষচন্দ্র পালের উদ্যোগে দুর্গাপুরে তাঁতশালা স্থাপিত হয়। এখানে তাঁতের কাপড় ও খাদি বস্ত্র তৈরী হতে থাকে। গান্ধীজী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনে বর্ধমানের বহু যুবক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে খণ্ড ঘোষের কিশোরী মোহন রায়, রায়নার দাশরথি তা, মেমারির প্রমথনাথ বিষয়ী, মহাপ্রসাদ কোনার, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বর্ধমান সদরের বিজয় চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। মহিলারাও এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন নি। রেণু দিদি, সুরমা মুখার্জী, নির্মলা সান্যাল প্রভৃতি রমণীরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পুলিশের দমন পীড়ন এঁদের স্বদেশব্রত থেকে বিরত করতে পারে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে গান্ধীজীর প্রবর্তনায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়েছিল বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য তাতে সর্বপ্রথম যোগ দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন ও জাতীয় ভাব প্রচারের নিমিত্ত ভোলানাথ ভঞ্জ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বর্ধমান নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। স্বাধীনতার আন্দোলনে হিতবাদী পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন কালনার সেন ভ্রাতৃদ্বয়। কাটোয়া মহকুমার অধিবাসী মানবেন্দ্র নাথ রায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের পরে বিপ্লবীদের মুখপত্র সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। দুর্লভকিশোর মিশ্রের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে ১৩৩২ সালে বিপ্লববাদী শক্তি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই

পিতৃভূমি বর্ধমান। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের পিতৃভূমি মেমারির নিকটে ভেয়ে মগরায়। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পালের পৈতৃক নিবাস কাটোয়া মহকুমায়। ছকড়ি দেবী, সোনামণি দেবী, নারী-বাঘিনী প্রভৃতি রমণীগণও স্বাধীনতা সংগ্রামে মহত্তর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল বর্ধমানে পৌরসভা স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পৌরসভার নির্বাচন উপলক্ষ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বর্ধমানে এসেছিলেন। কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি ঈশ্বরীতলায় বক্তৃতা করেছিলেন। বর্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র পর বৎসর বর্ধমানে এসেছিলেন ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করার উদ্দেশ্যে।

১৯৩১ সালের পর থেকে বর্ধমানে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির ক্রিয়াকলাপ বর্ধিত হয়। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সন্তোষ মিত্র প্রমুখ বিপ্লবীগণ বারংবার বর্ধমানে এসেছেন যুবকদের সংগঠিত করার জন্য। নবকুমার বাজপাই, ফকিরচন্দ্র রায় প্রমুখ বিপ্লবীরা বোমা তৈরীর কাজে লিপ্ত ছিলেন। বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার, সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা বিভিন্ন সময়ে গ্রেপ্তার হন ও দণ্ডিত হন।

কংগ্রেসের উদ্যোগে ১৯৩১ সালে বর্ধমানে কৃষক সমিতি স্থাপিত হয়। হেলারাম চ্যাটার্জি ছিলেন এই সমিতির প্রথম সভাপতি এবং রামেন্দ্রসুন্দর চৌধুরী সম্পাদক। ১৯৩৩ সালে হাটগোবিন্দ পুরে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে কৃষক সমিতির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যানেল কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনও ব্যাপকতা লাভ করে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের জন্য ডাঃ রবীন্দ্রনাথ রায়, অজিতকুমার রায়, ডাঃ অম্বুজা বসু, নারায়ণ চৌধুরী, বিজয় ভট্টাচার্য, দাশরথি তা প্রমুখ অসংখ্য নারী-পুরুষ গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। রাণীগঞ্জের সুকুমার ব্যানার্জি ব্রিটিশ শাসকের দ্বারা নিহত হন। কালনা কাটোয়াতেও এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। অসংখ্য মানুষ গ্রেপ্তার হন ও নির্যাতন ভোগ করেন। এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্ধমান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

দেবতা দেবোৎসব ও মেলা

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের মত বর্ধমান জেলাতেও গ্রামে গঞ্জে শহরে নানা দেবতার অধিষ্ঠান। প্রায় প্রতি গ্রামেই কোন গ্রাম্য দেবতা সর্বসাধারণের ভক্তি ও পূজা লাভ করে থাকেন। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এই রাঢ় অঞ্চল। শিব-শক্তির প্রাধান্য বর্ধমানের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক দেবতাত্রয়ীর অন্যতম বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এই জেলার অন্যতম প্রধান দেবতা। তথাকথিত লৌকিক দেবতা মনসা ও ধর্মরাজ এখানে স্থায়ী আসন অধিকার করেছেন। ধর্মরাজও রাঢ়েরই বিশেষ দেবতা। ধর্মরাজের অধিষ্ঠান বর্ধমান জেলায় যত্রতত্র। এই সকল পৌরাণিক ও অপৌরাণিক দেবকুলের বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান জেলার গ্রামে শহরে। বারো মাসে তেরো পার্বন ও আনুষঙ্গিক উৎসব ও মেলা এতদঞ্চলের মানুষের মানসিক মুক্তির প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণেই ছোটবড় জাতিধর্ম ভেদাভেদ ভুলে মানুষ মহামানবের সাগরতীরে হয়ে যায়।

বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা

বর্ধমান শহরে অধিষ্ঠিতা আছেন সুপ্রসিদ্ধ দেবী সর্বমঙ্গলা। কালো পাথরে গড়া অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী সর্বমঙ্গলা নামে খ্যাতা। বর্ধমানরাজ চিত্রসেন সর্বমঙ্গলার মন্দির নির্মাণ করিয়ে মন্দির মধ্যে দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুর্গাপূজার সময়ে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সাড়ম্বরে দেবীর পূজা হয় এবং মন্দিরের চতুর্দিকে পাঁচদিন ব্যাপী মেলা বসে।

বর্ধমান শহরের মিঠা পুকুরে নারায়ণী শক্তিবাড়ীতে অধিষ্ঠিত আছেন ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ, বিগ্রহের দক্ষিণে অবস্থিত কালী ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন, পূর্বদিকে পৃথক প্রকোষ্ঠে আছেন চণ্ডিকাদেবী, তার দক্ষিণে শিবমন্দির। মহারাজ মহাতাব চাঁদ মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। জাঁকজমক মন্দিরে দেবীর পূজা হোত, এবং শত শত ভক্ত পুণ্যার্থী হাজির হতেন। জমিদারী উচ্ছেদের পর মন্দিরের উৎসব স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বর্ধমান শহরের পশ্চিমে কাঞ্চননগরে বাঁকা ও দামোদরের মধ্যবর্তী স্থলে কংকালেশ্বরীর মন্দির। পাথরে খোদাইকরা প্রায় সাড়ে ছ' ফুট উঁচু অষ্টভুজা নির্মাংসা চামুণ্ডা খড়্গ ও নরমুণ্ড ধারিণী দেবী কংকালেশ্বরী। দেবীর মস্তকে

হস্তী ও পদতলে শিব শায়িত। দামোদরের বালুকাগর্ভ থেকে ডুমুরদহের পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী কমলানন্দ ঠাকুর উদ্ধার করে কাঞ্চন-নগরে একটি বিষ্ণুমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। দৈনিক পূজার সময় ও বহু দূর থেকে ভক্তরা দিতে পূজা আসেন। কার্তিকমাসে দীপান্বিতা অমাবস্যায় সাড়ম্বরে দেবীর পূজা হয়। এই সময়ে এখানে মেলা বসে।

কংকালেশ্বরীর মেলা

বর্ধমান শহরের কোটালহাটে সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের কালীবাড়ী। এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে কমলাকান্ত সাধনা করতেন। বর্ধমানেশ্বর প্রতাপচাঁদ এই মন্দিরটি তৈরী করিয়েছিলেন। বিশালাকৃতি চতুর্ভুজা মৃন্ময়ী কালিকা মূর্তি মন্দিরে বিরাজমানা। প্রতিবৎসর মৃন্ময়ী মূর্তির অঙ্গরাগ হয় এবং কার্তিক মাসের অমাবস্যায় বিপুল সমারোহে পূজা ও উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে মেলা বসে। এই সময়ে কালীকীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, সাহিত্যসভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয়।

কোটালহাটে কালী-পূজার মেলা

বর্ধমান শহরের উত্তর পশ্চিমে দুই কি. মি. দূরে নবাবহাট গ্রামে মহারাজ তিলকচন্দ্রের বিধবা পত্নী বিষণকুমারী ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে একশ' আটটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালক্রমে জীর্ণদশা প্রাপ্ত মন্দিরগুলির সংস্কার সাধন করে বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট ১৯৬৭ সালে। মহারাজাধিরাজ উদয় চাঁদ মহতাব মন্দিরগুলি পরিচালনার জন্য একটি ট্রাষ্ট বোর্ড গঠন করেন। এই ট্রাষ্ট-বোর্ডের উদ্যোগে প্রতি বৎসর শিবচতুর্দশীর সময়ে সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা বসে। যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ, কথকতা, যাত্রা, কীর্তন, বাউলগান, রামায়ণ ইত্যাদির অনুষ্ঠানও এই উপলক্ষ্যে হয়ে থাকে।

বর্ধমানে ১০৮ শিবের মেলা

বর্ধমানের সদর থানার অন্তর্গত বোড়ো গ্রামে প্রসিদ্ধ দেবতা বলরাম বিরাজমান। দশহাত দীর্ঘ চতুর্দশভুজ, লাঙ্গল ও কৃষি যন্ত্রধারী, মস্তকোপরি ত্রয়োদশ সর্পফণার ছত্র বিশিষ্ট, ত্রিনয়ন দারুনির্মিত বিগ্রহ বলরামের। ধর্মরাজের মত বৈশাখ মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিশেষ পূজা-উৎসব হয় বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়ায়, ভাদ্রমাসে অনন্ত চতুর্দশীতে, পৌষমাসে মকর সংক্রান্তিতে এবং মাঘ মাসে মকর সপ্তমীতে। মকর সপ্তমীতে বিরাট মেলা বসে। এই মেলা থাকে এগারো দিন।

বোড়ের বলরাম

১৩৭৯ বঙ্গাব্দে ২৫শে শ্রাবণ (১০।৮।১৯৭২) বাঁকা ও দামোদরের মধ্যবর্তী আলমগঞ্জ মহল্লায় ভাঙ্গা জমি খনন কার্যের সময়ে কালো পাথরের তৈরী ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ সাড়ে বারোটন ওজনের ১৮ ফুট পরিধি বিশিষ্ট এক বিরাট শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়। লিঙ্গমূর্তিকে বাবা বর্ধমানেশ্বর নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি টিনের চালাঘরে বর্ধমানেশ্বরের অবস্থান। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয় এবং বিরাট মেলা বসে। শিবরাত্রিতে এবং ২৫শে শ্রাবণ সারারাত ধরে মেয়েরা শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালে।

বর্ধমানেশ্বর

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে জৌগ্রাম স্টেশন থেকে ৫ কি. মি. দূরে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় প্রণেতা মালাধর বসু ও তৎপুত্র শ্রীচৈতন্যপার্ষদ রামানন্দ বসু ও সত্যরাজ খানের জন্মভূমি ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুলীন গ্রামের গ্রাম্য দেবতা মদনগোপাল প্রাচীন মন্দিরে অধিষ্ঠিত। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান মদনগোপালের দুদিকে শ্রীরাধা ও ললিতা। ঝুলন, রাস ও দোলের সময় উৎসব হয়। মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী থেকে সংক্রান্ত পর্যন্ত প্রায় কুড়ি দিন ধরে মেলা বসে। এই মেলা দর্শনের মেলা নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরের সম্মুখে সত্যরাজ খাঁ'র নামাঙ্কিত একটি বৃষমূর্তি। মাঘ মাসের উত্তরায়ণের দিন হাজার হাজার ভক্ত মন্দিরের সমুখস্থ পুকুরে স্নান করে। সত্যরাজ খান কুলীন গ্রামে একটি শিবমন্দিরের মধ্যে গৌরীপট্টহীন একলিঙ্গ গোপেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কুলীন গ্রামের মেলা

বর্ধমান সদর মহকুমার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ ব্লকে বোঁয়াইচণ্ডী গ্রামে বসন্তচণ্ডী নামে গ্রাম্য-দেবতা আসীনা। দরদালান যুক্ত চণ্ডীর মন্দির বর্ধমানের মহারাজার দানে নির্মিত। মন্দিরের ভিতরে দেবী চণ্ডী—দুপাশে নীলকণ্ঠ এবং ভৈরব। প্রতি শনি মঙ্গলবারে মন্দিরে ভক্তদের ভিড় হয়। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর সময়ে এবং দুর্গাপূজার সময় নবমী তিথিতে জাঁক-জমক সহকারে দেবীর পূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। অম্বুবাচীর সময়ে তিন দিন ও মহানবমীর সময়ে একদিন মেলা থাকে।

বসন্তচণ্ডীর মেলা

রায়না ও খণ্ডঘোষ ব্লকের দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁকে একলক্ষী গ্রামে

শা-চাঁদ পীরের দরগা। মাঘমাসের পূর্ণিমায় পীরের দরগায় বহু লোকের সমাগম হয়,—পীরের গান হয়, মুরগী জবাই করে পীরের ভোগ হয়। সারারাত্রি ব্যাপী মেলা হয়।

শা-চাঁদ পীরের মেলা

খণ্ডঘোষ ব্লকের গোপালবেড়া গ্রামে মকদম পীরের আস্তানা। মকদম সাহেব এখানেই আস্তানা গেড়েছিলেন। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করতেন। মাঘমাসের প্রথম দিনে মকদম পীরের তিরোধান দিবসে সারারাত ধরে পীরের গান হয় এবং পরদিন বিরাট মেলা বসে। পাঁচ ছ'-হাজার লোকের সমাগম হয়।

ভাতাড় ব্লকের এরুয়ার গ্রামে কালী ও মদনগোপাল গ্রাম-দেবতা হিসাবে কালী ও মদনগোপাল পূজিত হন। কোন এক গোঁসাই ঠাকুর এখানে কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করে কালী ও মদনগোপালকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায় গোঁসাই ঠাকুরের তিরোধান হয়। তাঁর সমাধির উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শারদীয়া নবমী ও কার্তিকী অমাবস্যায় বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। শ্রাবণী অমাবস্যায় গোঁসাই ঠাকুরের তিরোধান দিবসে বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে এবং ১৫ দিন মেলা থাকে।

এরুয়ার গ্রামের মেলা

ভাতাড় ব্লকের রামচন্দ্রপুর ও পারহাট গ্রামে ধর্মরাজের পূজায় জাঁকজমক হয়। অন্যান্য স্থানের মতই এই দুই গ্রামে ধর্মরাজের গাজন উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়ে থাকে। পারহাট গ্রামে গাজনের মেলা দুদিন স্থায়ী হয়।

পার-হাটের মেলা

হাওড়া বর্ধমান কর্ডলাইনে জৌগ্রাম স্টেশনের উত্তরে জৌগ্রামে প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন শিখরাকৃতি সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরে জলেশ্বরনাথ নামে দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্তি বিরাজমান। দামোদরের মরা খাত কংস নদীর তীরে শ্মশানে এই মন্দির অবস্থিত। জৈন তীর্থংকর মহাবীরের বর্ধমানে আগমন ও কৈবল্যলাভের স্থান হিসাবে জৌ গ্রামের প্রসিদ্ধি আছে। শিবরাত্রির সময়ে ও বর্ষশেষে নীল পূজা অনুষ্ঠানের সময়ে জলেশ্বরনাথের প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে।

জৌ-গ্রামের মেলা

আউসগ্রাম ২নং ব্লকের অন্তর্গত একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু সুয়াতা গ্রামে সৈয়দ মেহমুদ বাহমণি বা বহমান বা বম্মান পীর বসবাস করতেন, তিনি হিন্দু-

মুসলমান সকলের কাছেই শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করেছিলেন। মেহালা দীঘির পশ্চিমে বহমান পীরের জীর্ণ সমাধি ও মসজিদ বর্তমান। গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন শাহ্ পীরের মৃত্যুর পর ৯১৬ হিজরিতে এই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে ও মাঘমাসের প্রথম দিনে বহমান পীরের উরস উৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসংখ্য নরনারী এই উৎসবে ও মেলায় সমবেত হয়ে থাকে এবং পীরের দরগায় পূজা ও শিরনি দিয়ে থাকে।

বহমান পীরের উরস উৎসব

বর্ধমান জেলার দুইটি গ্রামে জগৎগৌরী দেবীর অধিষ্ঠান। মেমারি থেকে বারো মাইল উত্তরে মণ্ডল গ্রামে জগৎগৌরী অধিষ্ঠিতা আছেন। প্রস্তর নির্মিত চতুর্ভুজা মনসার বিগ্রহ জগৎগৌরী। কিম্বদন্তী অনুসারে নরপাল নামক রাজার দ্বারা দেবী পূজিতা হতেন, বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে রাজা নিকটবর্তী একটি পুকুরে দেবীকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, পরে ধীবরের জালে ধরা পড়ার পরে গ্রামবাসীরা তাঁকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। আষাঢ় মাসে দশহরার পরের পঞ্চমীতে দেবীর বিশেষ পূজা উৎসব হয় এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলাও বসে।

মণ্ডল গ্রামের জগৎগৌরী

কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর গ্রামের নিকটবর্তী নারিকেলডাঙ্গা গ্রামেও জগৎগৌরী অধিষ্ঠিতা আছেন। কোষ্টিপাথরে খোদিত দ্বিভুজা সিংহপৃষ্ঠে পদ্মের উপরে পর্যঙ্কভঙ্গীতে আসীনা দেবীর বামক্রোড়ে শিশু, পদতলে কালর ছিন্ন মুণ্ড এবং মস্তকোপরি পঞ্চ বা অষ্টনাগের ফণাছত্র। দেবীর নিত্যপূজায় প্রথমে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান মন্ত্র ও পরে মনসার ধ্যানমন্ত্র পাঠ করা হয়। দেবী শক্তি ও মনসার মিশ্রিত রূপ। কিম্বদন্তী অনুসারে বৈদ্যপুরের বৈদ্যরাজা (সামন্ত) কিঙ্কর মাধব সেন জগৎগৌরীর প্রতিষ্ঠাতা ও ভক্ত। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে কবি ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস বেহুলা কর্তৃক নারিকেলডাঙ্গায় মনসা পূজার উল্লেখ করেছেন। কিম্বদন্তী আছে যে, কালা পাহাড় জগৎগৌরীকে বেহুলা নদীর জলে নিক্ষেপ করেছিলেন, পরে তিনি জেলের জালে উদ্ধার প্রাপ্ত হন। গ্রামের কল্যাণার্থে বিশেষতঃ কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী থেকে মুক্তি কামনায় জগৎগৌরীকে চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পূজা ও উৎসব হয়।

নারিকেলডাঙ্গার ঝাপান

বৈশাখের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে সিঙ্গারকোণ গ্রামে জগৎগৌরীকে নিয়ে গিয়ে

ঝাপান উৎসব হয়। ঠিক একমাস পরে জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে (দশহরার পরের পঞ্চমী) নারিকেল ডাঙ্গায় ঝাপান হয়। বিষবৈদ্য বা ওঝার দল এই উৎসবে বিষধর সাপের খেলা দেখাতেন। ঝাপানের পূর্বদিনকে বলা হয় সহেলা। এইদিনে দেবীর রাজবেশ হয়, অনেক গ্রামে বাজি পোড়ে এবং কোন কোন গ্রামে গরুর গাড়ীর উপরে ছোট স্টেজ তৈরী করে তার মধ্যে পুরুষ বা নারীবেশী পুরুষ নৃত্যগীত করে থাকেন। একে সাজঘর বলা হয়। ঝাপানের দিন দেবীকে সিংহাসনে চাপিয়ে ঝাপানতলার মন্দিরে বসিয়ে বিশেষ পূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশাল মেলা বসে। প্রচুর পাঁঠা বলি হয়। হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ 'থাকা'। বাঁশ ও বাখারি দিয়ে তৈরী ধাপে ধাপে উঁচু সিংহাসনের মত তৈরী থাকায় বিভিন্ন পৌরাণিক পালা অনুসারে মাটির পুতুল বানিয়ে সাজানো হয়, কখনও চিনির কলস বা পিতলের গামলা বা ঘড়া দিয়ে থাকা সাজানো হয়। পৌরাণিক পালা অনুসারে নির্মিত পুতুলগুলি দর্শনীয়। পরের দিন পান্টা পূজা। এই দিন বাদ্যভাণ্ড সহকারে প্রচুর পাঁঠা বলি দিয়ে চিনির কলস ও অন্যান্য উপচারে দেবীর পূজা হয় মূল মন্দিরে দেবীর বাড়ীতে। ঝাপানের উৎসব মোট তিন দিনের উৎসব।

কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুরের সন্নিকটে উত্তরে বেহুলা নদীর তীরে উদয়পুর গ্রাম। কথিত আছে সতী বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়ার সময়ে এখানে উদিত হন, তাই গ্রামের নাম উদয়পুর। কথিত আছে বেহুলা কোন মুসলমান গৃহে মানবীর ছদ্মবেশে আবির্ভূতা হয়ে পরে পাষাণে পরিণত হন। এখনও সেই মুসলমানের বংশধরের পূজা সর্বপ্রথম হয় ঝাপানের দিনে। দেবীর আদি সেবায়েত ছিলেন বাগদীবংশীয়। দেবীকে বাগদীর ঠাকুর বলা হয়।

উদয়পুরে বেহুলার ঝাপান

বেহুলার কোন পূর্ণাবয়ব বিগ্রহ নেই। প্রস্তরে ক্ষোদিত সর্বাঙ্গে সিঁদুরলিপ্ত একটি মুখমণ্ডল মাত্র। উন্নত নাসা ও স্বর্ণপাতে নির্মিত চক্ষুদ্বয় ছাড়া মুখের আর কোন বৈশিষ্ট্য প্রকট নয়। বেহুলার বামে মনসা ও দক্ষিণে নেতা ধোপানীর সিঁদুরলিপ্ত মুখমণ্ডলমাত্র—দণ্ডোপরি স্থাপিত। নেতার পাশে একটি মৃৎকলসে দুটি ফণাবিস্তারকারী সর্প। মনসার ধ্যানমন্ত্রে বেহুলার পূজা হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে হোরা পঞ্চমীতে বেহুলার ঝাপান উৎসব হয়। পূর্বদিনে

দেবীর অধিবাস হয়, বারুদ পোড়ানো হয়। ঝাপান উপলক্ষ্যে মেলা বসে। লেটো গান, তর্জা গান, কবি গান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হয়।

পূর্বস্থলী থানার ভাণ্ডার-টিকুরিতে শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসাপূজা উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা হয়। দেবীর কোন বিগ্রহ নেই। বৃক্ষতলে বেদীতে দেবীর পূজা হয়। বিশ পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম হয় এই মেলায়। দূর দূরান্ত থেকে আগত বিপুলসংখ্যক ফুল-ফলের চারা বা কলম আসে এই মেলায়। অজস্র গাছ বা গাছের চারার সমাগম এই মেলার বৈশিষ্ট্য। তাই এই মেলাকে বলা হয় গাছের মেলা। যাত্রীরা সকলেই এক বা একাধিক গাছ কিনে বাড়ী ফেরে।

ভাণ্ডার-টিকুরির গাছের মেলা

কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত পাটুলী স্টেশন থেকে ছয় সাত মাইল দূরে জামালপুর নামে ক্ষুদ্র গ্রামে খড়ের চালায় বুড়োরাজের অধিষ্ঠান। বুড়োরাজ পাথরের শিবলিঙ্গ—মাথায় একটি ফণাধারী বিরাট সাপ—পাশে ত্রিশূল। বুড়োরাজ ধর্মরাজ হিসাবেই প্রসিদ্ধ। আবার কারো মতে অনাদিলিঙ্গ শিব। সম্ভবতঃ বুড়োশিবের বুড়ো ও ধর্মরাজের রাজ মিলে হয়েছেন বুড়োরাজ। বুড়োরাজের নৈবেদ্যের মাঝখানে দাগ কাটা থাকে, অর্থাৎ নৈবেদ্যের অর্ধাংশ শিবের ও অর্ধাংশ ধর্মরাজের। বৈদিক-পৌরাণিক শিব ও অপৌরাণিক ধর্মরাজের সম্মেলন বুড়োরাজের নামে ও পূজায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে হয় শিবের গাজন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের পূজা উৎসব ও গাজন হয়। সারা বৈশাখ মাস এখানে যাত্রী সমাগম হয়। বুড়োরাজের গাজনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সন্ন্যাসী হন। বিরাট মেলা বসে। সাতদিন মেলা থাকে। হাজার লোক লাঠি টাঙ্গি ও পাঁঠা নিয়ে গাজনে সমবেত হয়। অসংখ্য পাঁঠা বলি হয়। হাড়ি ও ডোম জাতির লোকেরা শূয়োর বলি দেয়, হাঁস বলিও হয়। পাঁঠা কাড়াকাড়ি ও লাঠালাঠি এই উৎসবের অঙ্গ। মুসলমানরাও পাঁঠা মানত করে বলি দেয়।

জামালপুরের বুড়োরাজের গাজন

কালনা থানার অন্তর্গত মেদগাছি গ্রামে মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় ধর্মরাজের পূজা, উৎসব ও মেলা হয়। এই উৎসব ১০৯০ বঙ্গাব্দেরও পূর্ব থেকে চলে আসছে। একটি ছোট কৌটার মধ্যে দেবতা থাকেন। তাঁর রূপ বা আকৃতি লোকচক্ষের অগোচরেই থাকে। ধর্মরাজ প্রথমে ছিলেন সলগড়া গ্রামে এক বাগ্দীর বাড়ীতে। সর্বেশ্বর মোদক ১০৯০ বঙ্গাব্দের পূর্বে ধর্মরাজকে

মাণিকহার মৌজায় নিয়ে আসেন। মাণিকহারে ঠাকুরের মুখ ধোওয়া হয় মুক্ত-ধারা নামক পুষ্করিণীতে স্নান করানো হয় মেদগাছি গ্রামে ধর্মপুকুরে। বহু প্রাচীন একটি নিমগাছের তলায় প্রয়াত রবীন্দ্রনাথ সিংহরায় একটি বেদী নির্মাণ করিয়েছিলেন। মাঘ মাসের অমাবস্যার রাত্রিতে ঠাকুরকে বার করা হয় এবং নিমতলায় বিবাহ হয়। প্রতিপদে ডোমপাড়ায় পূজা ও বলিদান হয়। এই দিন রাত্রিতে ঠাকুরকে বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করানো হয়। দ্বিতীয়াতে তাঁকে বেদীতে আনা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। এই মেলা জাতের মেলা নামে খ্যাত।[১]

মেদগাছির জাতের মেলা

ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে পূর্বস্থলী স্টেশনের নিকটে শীতলা পূজা উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। শীতলা দেবীর স্থায়ী কোন বিগ্রহ নেই। একটি বেদী আছে। ২৫।৩০ হাজার লোকের সমাগম হয়। যাত্রীরা গঙ্গাস্নান করে চিঁড়ামুড়ি কিনে দেবীর পূজা দেয়। পূজায় প্রচুর ছাগবলি হয়। বিপুল পরিমাণ মাটির বাসন এই মেলায় আমদানি হয়। মৃৎপাত্রের বিপুল সমাবেশ এই মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাত্রীরা হাঁড়ি, জালা, কলস প্রভৃতি মাটির বাসন কিনে বাড়ী যায়।

পূর্বস্থলীর শীতলার মেলা

কালনার নিকটবর্তী নেপাকুলি গ্রামে মণ্ডলবাড়ীতে মনসাদেবীর প্রস্তর-মূর্তি আছে। একহাত দীর্ঘ দেবী দণ্ডায়মানা দ্বিভুজা। দেবীর দুই নাম—কমলা ও বিমলা। কিম্বদন্তী আছে যে, দেবী প্রথমে উদয়পুরে এক মুসলমান গৃহে অধিষ্ঠিতা হন, পরে সেখান থেকে বাগ্দীবাড়ীতে নীত হন। সেখানে নেপাকুলির ৺ পরাণ মণ্ডলের বাড়ী অধিষ্ঠিতা হন। দেবীর পূজক তারাপদ মুখোপাধ্যায়। আষাঢ়ের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে দেবীর ঝাপান উৎসব হয়। পাঁঠা বলি হয়। কালনা বৈদ্যপুর রোডের ধারে ঝাপানতলায় মেলা বসে, মেলায় দেড় দুই হাজার লোকের সমাগম হয়।

নেপাকুলির মনসার ঝাপান

কালনা থেকে আট মাইল ও বৈঁচি থেকে পাঁচ মাইল দূরে কালনা বৈঁচি রাস্তার ধারে হুগলী জেলার সীমান্তে বর্ধিষ্ণু গ্রাম বৈদ্যপুর। এই গ্রামের জমিদার নন্দী পরিবারের আদিপুরুষ হারাধন নন্দীর পৌত্র শিশুরাম নন্দীর পত্নী দ্রৌপদী

১। প্রয়াত খগেন্দ্র গোপাল সিংহরায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১১২২ সালে কোন এক সাধুর কাছ থেকে কুলদেবতা রাজরাজেশ্বর শালগ্রাম শিলা লাভ করেন। এই বংশেরই ঠাকুরদাস নন্দীর পুত্র মধুসূদন নন্দী ১২৫২ বঙ্গাব্দে বৃন্দাবন চন্দ্র (রাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহ পৃথক মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দী পরিবারের সমৃদ্ধি বর্ধিত হওয়ায় তাঁরা বিপুল জমিদারীর মালিক হন এবং দেবসেবার জন্য রাজরাজেশ্বর এষ্টেট নামে বিপুল সম্পত্তি নির্দিষ্ট করেন। এই সম্পত্তির আয় থেকে নিত্যসেবা এবং বহুবিধ দেবোৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবগুলির মধ্যে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, রাস, দোল ও রথযাত্রা প্রধান। নয়টি চূড়া সহ সুদৃশ্য রাসমন্দির নির্মিত হয় ১২৪৩ সালে।

বৈদ্যপুরের রাস ও রথ

রাসের উৎসব বৈদ্যপুরের অন্যতম প্রধান উৎসব। অষ্টসখী ও বড়াইবুড়িসহ রাধাকৃষ্ণের মৃন্ময় বিগ্রহ রাসে স্থাপিত হয়। রাজরাজেশ্বর ও বৃন্দাবনচন্দ্র রাসমঞ্চে অধিষ্ঠান করেন। রাসমন্দির ও মঞ্চ সুন্দরভাবে সাজানো হয়। চারদিন যাবৎ রাসের উৎসব চলে। দিবাভাগে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান, রাত্রিতে থিয়েটার ও সন্ধ্যার সময় ঢপকীর্তন হয়। বহু দূর গ্রাম থেকে যাত্রীরা আসে; হরেক রকম দ্রব্যসম্ভার নিয়ে রাস্তার ধারে মেলা বসে।

বৃন্দাবন চন্দ্রের দোলোৎসব হয় দোল পূর্ণিমার পঞ্চম দিনে—এই দোল পঞ্চম দোল নামে খ্যাত। গ্রামের প্রান্তে একটি পুকুরের ধারে বেদীতে দোল হয়। পূর্বরাত্রে চাঁচরে পুকুরপাড়ে বারুদ ও আতস বাজি পোড়ান হয়। পুকুরটি বাজিয়ান পুকুর নামে পরিচিত। দোলের দিন বিকালে চিঁড়া মুড়ির মোয়া বিতরণ করা হয় ও মোয়া কাড়াকাড়ি হয়।

বৈদ্যপুর নিকটবর্তী মিরহাট ও হাসনহাটী গ্রামে, সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজায় দুদিন ধরে উৎসব হয়। পাড়ায় পাড়ায় দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা বলিদান ও যাত্রাগান হয়।

বৈদ্যপুরের রথের মেলা প্রসিদ্ধ। রথ ছিল দুটি,—একটি ছোট ও একটি বড়। বড় রথে বৃন্দাবন চন্দ্র ও রাজরাজেশ্বর অধিষ্ঠান করেন। ছোট রথে আরোহণ করতেন মধুসূদন নন্দীর নিজস্ব দেবতা গোপাল। ছোট রথটি বর্তমানে বিনষ্ট হয়ে গেছে। নয়টি চূড়াবিশিষ্ট ৩৮ ফুট উঁচু— চারটি প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া ও ২৬টি প্রকাণ্ড চাকা সমেত রথটির সর্বাঙ্গে নানাবিধ চিত্র ও মূর্তি খোদিত আছে। প্রসিদ্ধ আছে যে বড় রথটির তেরটি চূড়া ছিল। চারটি চূড়া অগ্নিদগ্ধ

হয়। রথতলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রথ টানা হয়। সোজা রথে ও উল্টো রথে একদিন করে প্রকাণ্ড মেলা বসে। রথের মেলার প্রধান আকর্ষণ প্রচুর কাঁঠালের আমদানি।

কালনা-বৈঁচি রাস্তার বৈদ্যপুরের নিকটবর্তী সিঙ্গারকোণ গ্রামে দোলের মেলা বিখ্যাত। দোলতলার প্রাঙ্গণে—মন্দিরে রাধাগোবিন্দের দোলোৎসব হয়। চাঁচরে অর্থাৎ পূর্বদিনের সন্ধ্যায় বারুদ পোড়ানো হয়। দোল উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। এই মেলা আট দশ দিন স্থায়ী হয়। বহু দূর গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ মেলায় যাতায়াত করে। মেলার অন্যতম আকর্ষণ হাঁড়ি, কলসী, জালা, মুড়িভাজার খোলা প্রভৃতি মাটির পাত্র। অনেকে মাটির বাসন কেনার জন্যই মেলায় আগমন করেন।

সিঙ্গারকোণের দোল

বৈদ্যপুর থেকে তিন চার মাইল দূরে গোপালদাসপুর গ্রাম। এই গ্রামে অধিষ্ঠান করছেন রাখালরাজ নামে প্রসিদ্ধ দেবতা। প্রায় চার'শ বৎসর পূর্বে রামকানু গোস্বামী এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান দারু নির্মিত বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ। গোপীনাথ নামে রাখালরাজের বামে থাকেন রাখালরাজ রামকানুর স্বপ্নলব্ধ বিগ্রহ—নিমকাঠে তৈরী সোজা ভাবে দণ্ডায়মান গোচারণরত শ্রীকৃষ্ণ,—তাঁর ডান হাতে পাঁচনী, বাম হাতে কোন খাদ্য ধরার ভঙ্গী। ঐ হাতে ননী ক্ষীর ইত্যাদি দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর মাঘ-ফালগুণ মাসে বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। অঙ্গরাগের পরে অভিষেক হয়। তমাল গাছের ছায়ায় ঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণের পশ্চাতে রাখালরাজের মন্দির। প্রত্যহ ভোগারতি, শীতলারতি ও পূজা হয়। বহু দূর দেশ থেকে ভক্তদের সমাগম হয়। জন্মাষ্টমীতে ও রামনবমীতে বিশেষ পূজা উৎসব হয়। রামনবমীতে রাখালরাজের দোল হয়। বারোমাসই অভ্যাগত ভিক্ষুক অতিথিদের প্রসাদী অন্নে তৃপ্ত করার রীতি। জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসবের দিন সংকীর্তন হয়, নারিকেল কাড়াকাড়ি হয় ও দধির হাঁড়ি ভাঙ্গা হয়। রামনবমীর পূর্ব দিনে চাঁচরে বারুদ পোড়ে। রামনবমীর দিন দোলোৎসবে দেবতায় রাজবেশ হয়। এই উপলক্ষ্যে মাঝামাঝি একটি মেলা বসে। হাঁড়ি কলসী মনোহারী দ্রব্যাদি মেলায় আসে। মেলায় দেড় দু' হাজার লোকের সমাগম হয়।

গোপালপুরের রাখালরাজ

কালনা থানার অন্তর্গত সিমলনের নিকটে উপলতি গ্রামে উদয়পুরের অনুরূপ সিঁদুরলিপ্ত তিনটি মুখমণ্ডল বেহুলা মনসা ও নেতা ধোপানী নামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিগ্রহের সেবক ছিলেন পঞ্চানন রজকের পূর্বপুরুষ। পঞ্চানন দেবসেবার ভার দেবোত্তর জমি সহ নিত্যগোপাল ঘোষালকে দিয়েছিলেন। নিত্যগোপালের পরে তাঁর জামাতা দেবসেবা চালান। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে মনসা ও বেহুলার ঝাপান হয়। ঝাপানে বিগ্রহকে মাথায় করে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। মই এর উপরে চিনির ছাঁচ সাজিয়ে সাঁওতাল দিয়ে বহন করিয়ে দেবীর স্থানে আনা হলে ঐ দ্রব্যে দেবীর পূজা হয়, পাঁঠা বলিও হয়। এই উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য একটি ছোটখাট মেলাও বসে।

উপলতির বেহুলার ঝাপান ও হনুমানজীর মেলা

উপলতি গ্রামের পশ্চিমে একটি পুকুরের পাড়ে খোলা আকাশের নীচে গদা স্কন্ধে প্রস্তর নির্মিত হনুমানজীর দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। গ্রামের লোকের বিশ্বাস, হনুমানজীর পূজা দিলে বৃষ্টি হয়। মাঘী পূর্ণিমায় হনুমানজীর পূজা উৎসব হয়। এই দিনে হরিনাম সংকীর্তন হয়। হনুমানজীর ভোগ হয় মুড়ির মোয়া দিয়ে। একটি বড় মোয়া হনুমানজীর মাথায় ও একটি হাতে দেওয়া হয়, অবশিষ্ট মোয়াগুলি বিগ্রহের সম্মুখে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। লোকে মোয়া কুড়িয়ে খায়। দেবতাকে খিচুড়ি ভোগ দিয়ে সর্বসাধারণকে খাওয়ানো হয়। এই উপলক্ষ্যে ছোটখাট একটি মেলা বসে।

কালনা থানার সমুদ্রগড়ের নিকটে জালুই ডাঙ্গায় গঙ্গার তীরে মকর সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা বসে। এই দিন গঙ্গা পূজা হয়। পুণ্যার্থীরা গঙ্গাস্নান করে মেলা দেখে বাড়ী ফেরে। এই মেলায় প্রচুর মাটির বাসন আসে। যাত্রীরা মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি কিনে মেলা-তলায় ভাত রান্না করে খেয়ে পুণ্যের ঝুলি ভর্তি করে বাড়ী ফেরে।

জালুই ডাঙ্গার মেলা

আসানসোলের নিকটে রাণীগঞ্জে প্রতি বৎসর ৪ঠা ফাল্গুন পীরবাবার মেলা নামে বেশ বড় মেলা হয়। পীর সৈয়দ সামসুদ্দিন শাহ বহুজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁরই স্মৃতিতে এই বিশাল মেলা বসে।

রাণীগঞ্জে পীরবাবার মেলা

কালনা শহরে শ্রাবণী পূর্ণিমায় মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমায় পূজা হয়। বহু পূর্বে রাণঘাটে পালচৌধুরীদের বাড়ীতে এই দিনেই দেবীর

পূজা হোত। সম্ভবতঃ বাণিজ্যসূত্রে পালচৌধুরীরা কালনায় আসেন এবং মহিষমর্দিনী পূজার সূচনা করেন। পূর্ণিমা থেকে তিন দিন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী বিহিত পূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে মহিষমর্দিনী তলায় ও রাস্তার আশে পাশে মেলা বসে। পুতুল নাচ যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হয়। প্রতি দিনই ২।৩ হাজার লোকের সমাগম হয়।

কালনার মহিষমর্দিনী

কালনা থানার নাদনঘাট কুসুমগ্রামের নিকটে রাইগ্রাম। এই গ্রামে গোরাচাঁদ ফকির সাহেবের মেলা বিখ্যাত। প্রতি বৎসর ১৩ই ফালগুণ ফকিরের মৃত্যু দিনে বিরাট মেলা বসে; মেলা থাকে ১৫।২০ দিন। উৎসরের দিনে ফকিরের পূজা দেয় ভক্তরা। ধান, চাল, মুরগী, পাকা শিরনি (পাটালি) ইত্যাদি পূজার উপকরণ। মনস্কামনা সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভক্তরা মানত করে থাকে। মেলার প্রধান আকর্ষণ লেটোর গান। যাত্রা, থিয়েটার, সার্কাস মেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

রাইগ্রামে গোরাচাঁদ সাহেবের মেলা

ইছু ভাকরা গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের মেলা বসে। এখানে ধর্মরাজের কোন বিগ্রহ বা প্রতীক নেই। গাছতলায় বাঁধানো বেদীতে ধর্মরাজের পূজা হয়। সহস্রাধিক লোকের সমাগম হয় মেলায়।

ইছু ভাকরার মেলা

কালনা শহরের কাছে ও ধাত্রিগ্রামের নিকটে সার গড়িয়া গ্রামের গ্রাম্য দেবতা শীতলার মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে সার্বজনীন পূজা উৎসব হয় বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশীতে। এই পূজা প্রায় তিনশ বছরের প্রাচীন। এই মূর্তি চতুর্ভুজা রক্তবসনা—দুই হস্তে অস্ত্র ও সম্মার্জনী ধারিণী-উগ্ররূপা। মনসা গাছের তলা বাঁধানো বেদীতে দেবীর অধিষ্ঠান। পূজায় ছাগবলি হয়—সারা রাত্রি চণ্ডীপাঠ ও পূজা হয়। দুই দিন মেলা থাকে।

সারগড়িয়ার শীতলার মেলা

কালনার নিকটবর্তী রাণীবন্দ গ্রামে দেবী চণ্ডীর অধিষ্ঠান। প্রসিদ্ধি আছে যে কোন তান্ত্রিক সাধক দেড় ফুট কষ্টি পাথরের চণ্ডী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; ঐ মূর্তি অপহৃত হওয়ায় পিতলের বিগ্রহ স্থাপিত হয়। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে দেবীর পূজা ও উৎসব হয়।

রাণীবন্দের চণ্ডীর মেলা

অষ্টমীর রাত্রিতে বাজি পোড়ানো হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। কয়েক হাজার লোক মেলায় যাতায়াত করে। প্রচুর পাঁঠা বলি হয়। মেলা পাঁচ-সাত দিন স্থায়ী হয়।

কালনার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ বাঘনাপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ দেবতা বলরাম-কৃষ্ণ। বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদের আদি পুরুষ রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাই গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণবলরামের দারুময় বিগ্রহ এনে বাঘনাপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে। রামচন্দ্র ছিলেন নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য এবং পালিত পুত্র। রামচন্দ্র নরোত্তম ঠাকুর আয়োজিত খেতরির মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। আটচালার রীতিতে তৈরী মূল মন্দির ও চারচালা রীতির জগমোহন বিচিত্র টেরাকোটার অলংকরণ সমৃদ্ধ মন্দির নির্মিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামচন্দ্রের উত্তর পুরুষ রমাপতির সময়ে। মন্দিরের সম্মুখে একচালা নাটমন্দির, নহবতখানা, ঘড়িঘর, রন্ধনশালা, জগন্নাথের গুণ্ডিচাঘর, দুর্গামন্দির, গাজন মন্দির প্রভৃতি।

বাঘনাপাড়ার মহোৎসব

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরে চৈতন্য-পার্ষদ বংশীবদন বাঘনাপাড়ায় বাস করে বহু লোককে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এই সময় থেকেই বাঘনাপাড়া বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়। রামচন্দ্রের আমলে বাঘনাপাড়ার গৌরব বর্ধিত হয়। প্রতি বৎসর নবান্নের পর বিগ্রহের অঙ্গরাগ হয়। মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে রামচন্দ্রের তিরোভাব উৎসব হয়। পূর্বদিনে হয় অধিবাস। অকৃতদার রামচন্দ্রের তিরোধান উৎসবে কৃষ্ণ-বলরামকে কাছা পরিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ করানো হয়। আটদিন ব্যাপী এই উৎসবে কৃষ্ণ বলরামকে প্রতিদিন নূতন নূতন পোষাক পরানো হয়। সাত দিন ধরে অন্নকূট বা পর্বতপ্রমাণ অন্নের স্তূপ ভোগ দেওয়া হয় এবং হাজার হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অষ্টমীতে হয় ধূলোট—এই দিন কৃষ্ণ বলরামকে ফকিরের বেশে সাজানো হয়। এই উৎসবে হাজার হাজার বৈষ্ণবের সমাগম হয়। বিরাট মেলা বসে। তৃতীয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত মেলা থাকে। কৃষ্ণ বলরামের মন্দিরের পাশে চারচালা রীতি ম.ন্দরে গোপীশ্বর শিব আছেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে গোপীশ্বরের গাজন মেলা হয়।

কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী অগ্রদ্বীপ গ্রামে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ

গোবিন্দ ঘোষ গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সাধন ভজন করতেন। গোবিন্দ ঘোষের দেহত্যাগের পরে এই গ্রামেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। গোপীনাথ কোষ্টিপাথরে গড়া সুন্দর ত্রিভঙ্গ বংশীধারী কৃষ্ণ। গোবিন্দর তিরোধান উপলক্ষ্যে অগ্রদ্বীপে হয় মহোৎসব, চৈত্রমাসে বারুণীর কৃষ্ণা একাদশীতে আমবারুণীর পূর্বে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর ঘোষঠাকুর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে গোবিন্দ শোকাতুর হয়ে পড়েন। কথিত আছে যে, গোপীনাথ স্বয়ং ঘোষঠাকুরের পুত্রত্ব স্বীকার করে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সমাধা করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তদনুসারে প্রতি বৎসর কৃষ্ণা একাদশীতে গোপীনাথকে কাছা পরিয়ে তাঁর হাত দিয়ে পিণ্ডদান করানো হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। প্রথম দিন চিঁড়া ভোগ হয়, দ্বিতীয় দিনে হয় অন্নভোগ, তৃতীয় দিনে বারুণী স্নান হয়। বহু দূর দেশ থেকে বৈষ্ণবগণ এবং অন্যান্য যাত্রীরা সমাগত হন। নামসংকীর্তন হয়, আখড়া বসে। গোপীনাথ সহ অগ্রদ্বীপের জমিদারী কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে আসে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরের সমাধির পাশে গোপীনাথের মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপনে গোপীনাথকে কলকাতায় নিয়ে যান। কৃষ্ণচন্দ্র গোপীনাথকে উদ্ধার করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রদ্বীপের মল্লিকরা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে অগ্রদ্বীপ মহল ক্রয় করায় মেলার দায়িত্ব লাভ করেন। প্রায় পনেরো দিন মেলা থাকে।

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ

বর্ধমান সদর মহকুমার অন্তর্গত পালসিট গ্রামে অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য বৈষ্ণব আচার্য শ্যামাদাস প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল অধিষ্ঠিত আছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে তৃতীয়া পর্যন্ত মদনগোপালের পূজা মহোৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে বৈষ্ণব মেলা হয়। মেলায় বাউল গান ও লীলা কীর্তন হয়।

পালসিটের মদনগোপাল

অগ্রদ্বীপের পূর্ববর্তী রেলস্টেশন পাটুলি। এখানে উত্তর বাহিনী। মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যার্থীরা উত্তরবাহিনীর মুখে গঙ্গা স্নান করেন। ঐ দিনে একটি বড় মেলা বসে। দোলের দিনে দোল মন্দিরে এবং বারো দোলের পর কয়েকদিন ধরে কৃষ্ণদেব ঠাকুরের উৎসব হয়।

পাটুলির মেলা

কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বস্থলী থানায় ন'পাড়া গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালীর অধিষ্ঠান; প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধেশ্বরীর ধূমধাম করে পূজা হয়। ৬৭ জন ব্রাহ্মণ পূজায় ব্যাপৃত থাকেন। এই পূজার উৎসবে বহু লোকের সমাগম হয়, গ্রামে যাত্রা গান অনুষ্ঠিত হয়।[১]

ন'পাড়ায় সিদ্ধেশ্বরী

অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রাচীন কণ্টকনগর বা কাটোয়া। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপ কাটোয়াতেই কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান গৌরাঙ্গবাড়ী, মাধাই-এর সমাধি, সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রভৃতি কাটোয়ায় দর্শনীয়। মাঘ মাসের প্রথম দিকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষ্যে মহোৎসব হয়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ স্মরণে গৌরাঙ্গদেবকে ডোর, কৌপিন, গেরুয়া বস্ত্র পরিয়ে হাতে দণ্ড কমণ্ডলু দিয়ে সন্ন্যাসী সাজানো হয়। কাটোয়ায় জনপ্রিয় সার্বজনীন উৎসব কার্তিক পূজা ও কার্তিক লড়াই। বাঁশের থাকায় প্রতিমা সাজিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়।

কাটোয়া উৎসব

কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকে বর্ধিষ্ণু গ্রাম দধিয়া। বর্ধমান পালিটা-বাকলসা বাসপথে রতনপুর থেকে তুই কি. মি. দূরে দধিয়া। গোপালদাস প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ জিউ এই গ্রামের গ্রাম-দেবতা। বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস এই গ্রামে রঘুনাথজীকে প্রতিষ্ঠা করে মন্দির নির্মাণ করেন। রঘুনাথ জিউর প্রতিষ্ঠা দিনে মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে অর্থাৎ সরস্বতী পূজার একদিন পরে বিরাট উৎসব ও মেলা হয়। মেলা তিন-দিনের হলেও বেশ কিছুদিন লোকজনের সমাগম হয়। লক্ষাধিক লোকের সমাগমে গ্রামের পরিবেশ সজীব হয়ে ওঠে। উৎসব উপলক্ষে বাউল গান, কীর্তন গান, রামায়ণ গানের অনুষ্ঠান হয়।

দধিয়ায় রঘুনাথজীর মেলা

কেতুগ্রাম ব্লকের অন্তর্গত নৈহাটী গড় সপ্তগ্রাম নিবাসী বণিক নিত্যানন্দ-শিষ্য উদ্ধারণ দত্তের সাধন ভজনের স্থান হিসাবে উদ্ধারণপুর নামে পরিচিত হয়। নৈহাটী গ্রামে উদ্ধারণ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম ছিল বৈষ্ণব খণ্ড। ভাগীরথীর তীরে ভক্তগণ নির্মিত ঘাটের নাম উদ্ধারণপুরের ঘাট। বৈষ্ণব খণ্ড আশ্রমে

১। বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা।

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, উদ্ধারণ দত্ত প্রভৃতি দারুময় বারোটি বিগ্রহ দ্বাদশ গোপাল নামে প্রসিদ্ধ। পৌষ সংক্রান্তিতে উদ্ধারণ ঠাকুরের সমাধির কাছে তাঁর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। মাঘের প্রথম দিনে দ্বাদশ গোপালের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সাতদিন মেলা থাকে। বহু বৈষ্ণব ভক্তের সমাগম হয়। চিঁড়া, ফল, ভোগ, অন্নকূটের অন্নপ্রসাদ ভক্তদের বিতরণ করা হয়। কীর্তন গান ও বাউল গান মেলাপ্রাঙ্গণ মুখরিত করে তোলে।

উদ্ধারণপুরের দ্বাদশ গোপালের উৎসব

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি মহাজন জ্ঞানদাসের জন্মস্থান ও সাধন-ভজনের স্থান কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকে কাটোয়া আহমেদপুর ছোট রেললাইনের স্টেশন কাঁদরা গ্রাম। জ্ঞানদাসের সাধনপীঠ জ্ঞানদাসপাট নামে পরিচিত। জ্ঞানদাস এখানে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পৌষ সংক্রান্তিতে জ্ঞানদাসের তিরোভাব উৎসব তিন দিন ধরে সাড়ম্বরে পালিত হয়। নানা স্থান থেকে বহু বৈষ্ণব ভক্তের সমাগম হয়। ছোটখাট মেলাও বসে। হরিনাম সংকীর্তন, পদাবলী কীর্তন, ভাগবত পাঠ প্রভৃতিতে উৎসবপ্রাঙ্গণ ভক্তিরসের প্লাবনে ভেসে যায়।

কাঁদরায় জ্ঞানদাসের তিরোধান দিবস

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণের পর ৩রা মাঘ কাঁদরায় এসে মঙ্গল ঠাকুরের আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। মঙ্গল ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আগমণ উপলক্ষ্যে এখানে সাড়ম্বরে উৎসব পালত হয়।

বর্ধমান জেলা বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র, বহু বৈষ্ণব কবির আবির্ভাবে ধন্য শ্রীপাট শ্রীখণ্ড প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ নরহরি সরকারের জন্মস্থান ও সাধন-ভজনের স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। শ্রীখণ্ডের পূর্বনাম ছিল বৈদ্যখণ্ড। নরহরিই সম্ভবতঃ প্রথম গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেছিলেন। এই অঞ্চলে এক সময়ে শ্রীখণ্ডে তান্ত্রিকতার প্রাধান্য ছিল। এই গ্রামের দেবীর নাম: খণ্ডেশ্বরী —এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। শ্রীখণ্ডের দক্ষিণে বড়ডাঙ্গা নরহরির সাধন স্থল। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে নরহরি ঠাকুরের তিরোধান উৎসব হয়। এই উৎসব বড়ডাঙ্গার মহোৎসব নানা স্থান থেকে বৈষ্ণবদের ও বাউলদের সমাগম হয়, কীর্তন গানে. বাউল গানে ও কবি গানে বড়ডাঙ্গা মুখর হয়ে ওঠে।

শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের তিরোধান দিবস

কাটোয়ার উত্তরপশ্চিমে বীরভূম সীমান্তে কাঁকোড়া গ্রামের দেবতা কর্কটনাগ। কর্কটনাগের শক্তি মধুপুর গ্রামের বিষহরি মনসা ও মাঝিগ্রামের শাকম্ভরী। দশহরার পরবর্তী নাগপঞ্চমীতে কর্কটনাগের পূজা ও উৎসব হয়। নাগদেবতা ছিলেন বাগদী জাতির উপাস্য। বাগদী ব্রাহ্মণ ছিলেন পূজারী। বর্তমানে উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণই পূজা করে থাকেন। উৎসবের দিনে বালক বালিকারা নূতন জামাকাপড় পরে, চাল আলু কলা দুধ দিয়ে দেবতার পূজা হয়। পাঁঠা বলি হয়।

কর্কটনাগ

কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকের অধীনস্থ শ্রীপুর গ্রামে ধর্মরাজের মেলা হয়। শ্রীপুরের নিকটবর্তী বাণনাগরার জঙ্গলে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এই ধ্বংসস্তূপ ও ভগ্নমন্দির পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ধর্মরাজ ও শিবের মন্দির বলে অনুমান করা হয়েছে। এই ধ্বংসস্তূপের পাশে রাণী ভবাণী মন্দির নির্মাণ করে কালী ও শিবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আষাঢ় মাসের নবমী তিথিতে ও পরের দিন মহাসমারোহে ধর্মরাজের পূজা ও উৎসব হয়। দুদিন মেলা থাকে। ২৫শে চৈত্র থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত শিবের গাজন উৎসব হয়। ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র বোলান গানের অনুষ্ঠান হয়। চড়ক সংক্রান্তির দিন রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদির কাহিনী অবলম্বনে তৈরী সঙের শোভাযাত্রা দর্শনীয়।

শ্রীপুরের ধর্মরাজ ও শিবের গাজন

কাটোয়ার ২ নং ব্লকের অধীন প্রাচীন ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রামের গ্রাম-দেবতা ক্ষেত্রপাল। একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ ক্ষেত্রপাল নামে পূজিত হয়। সাহা পদবীধারী শুঁড়ি সম্প্রদায় এই দেবতার পূজা করে থাকেন। প্রতি সপ্তাহেই শনি মঙ্গলবার পাঁঠাবলি হয়। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা নবমীতে হয় বিশেষ পূজা ও উৎসব। বটগাছের চতুর্দিকে ঘটস্থাপন করে পূজা হয়। ছাগল, ভেড়া, শূকর বলি হয়। মেলা থাকে এক সপ্তাহ।

সিঙ্গিগ্রামের ক্ষেত্রপাল ও বুড়োশিবের মেলা

দাঁইহাট ও ন' পাড়ার মধ্যবর্তী জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত সরবেশ নামক দীঘি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত আড়াই ফুট উঁচু কোষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গকে সিঙ্গি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করা হয় একটি মাটির ঘরে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যে নয় চূড়ার এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করান।

গাজনের সময় বুড়োশিবকে এই মন্দিরে স্থাপন করা হয়। শিবরাত্রিতে ও চৈত্র সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা বসে। মেলা তিন চারদিন স্থায়ী হয়। হাজার হাজার লোকের সমাবেশে মেলা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

চৈতন্যপুরের শৈলেশ্বর শিব

কাটোয়া মহকুমায় সমৃদ্ধ গ্রাম চৈতন্যপুরে অধিষ্ঠান করছেন গ্রাম-দেবতা শৈলেশ্বর শিব। প্রায় বিশ ফুট উঁচু স্তূপের উপরে ছাদখোলা মন্দিরে শৈলেশ্বর শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। কিম্বদন্তী অনুসারে হরি ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি এই শিবের আবিষ্কর্তা। মদন চতুর্দশীর দিন সাড়ম্বরে শিবের পূজা ও উৎসব হয়। হরি ঘোষের বংশধরেরা শিবের মাথায় দুধ ঢালেন। শিবচতুর্দশীতে বিরাট মেলা বসে। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি কামনায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

কুড়ই গ্রামে শিবের মেলা

কাটোয়া মহকুমার কুড়ই গ্রামের গ্রাম-দেবতা বুড়োশিব। সারা বৎসর বুড়োশিবকে শিবপুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির সময় জল থেকে তুলে শিবের পূজা উৎসব হয়। গাজন উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

পাণ্ডবেশ্বরে পাণ্ডবনাথ

দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্গত অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথে পাণ্ডবেশ্বর রেল-স্টেশনের নিকটে অজয় নদের তীরে পাণ্ডবেশ্বর গ্রামে পাণ্ডবনাথ নামে ছয়টি শিবলিঙ্গ আছে। কিম্বদন্তী অনুসারে মাতা কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব এই গ্রামে বাস করেছিলেন। মাতা কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডব একটি করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরে শিব ছাড়াও হনুমান ও ভৈরবের মূর্তি আছে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহন্ত পাণ্ডবনাথের পূজারী। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে পাণ্ডবনাথের পূজা ও উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে বড় মেলা বসে। বহু দূর থেকে পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে।

ভরতপুরের ধর্মরাজ

দামোদরের তীরে অবস্থিত কাঁকসা ব্লকের ভরতপুর গ্রামে ধর্মরাজের শিলামূর্তি বিদ্যমান। মন্দিরমধ্যে ধর্মরাজ ছাড়াও গণেশ, শিব, ভৈরব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতাদের শিলামূর্তি আছে। এই গ্রামে একটি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষ্যে তিনদিন ধরে বিরাট মেলা বসে।

কাঁকসা থানার গোপালপুর এবং আড়রা গ্রামের নিকটে প্রস্তর নির্মিত বিশাল মন্দিরে অষ্টমুখ শীর্ণশীর্ষ বৃহদাকার শিবলিঙ্গ রাঢ়েশ্বর শিব নামে পূজিত

রাঢ়েশ্বর শিব

হন। প্রসিদ্ধি আছে যে রাঢ়ের রাজা শিবভক্ত মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে ধ্বংসলীলা থেকে নিবৃত্তির জন্ত রাঢ়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মতান্তরে গোপভূমের রাজা ভল্লুপদ ঘোষ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। চৈত্রমাসে জাঁকজমকের সঙ্গে গাজন উৎসব হয়। শিবরাত্রিতে ও মাঘী চতুর্দশীতে এখানে বিরাট মেলা বসে।

আসানসোল মহকুমায় জামুরিয়া ব্লকের অন্তর্গত ঝুমুরিয়া-অণ্ডাল যাওয়ার রাস্তায় পড়ে দামোদরপুর গ্রাম। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামের গ্রাম-দেবতা ছাতা ঠাকুর। প্রতি বৎসরে আশ্বিনের প্রথম দিনে আদিবাসী কল্যাণ পরিষদ

দামোদরপুরের ছাতা ঠাকুর

পরিচালিত চল্লিশ ফুট দীর্ঘ বাঁশের আগায় ছাতা বেঁধে ছাতা ঠাকুরের উৎসব পালন করা হয়। পরদিন ছাতা নামিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ছাগ, মোরগ বলি হয়। আদিবাসী নারী পুরুষ দলবদ্ধভাবে নাচে গানে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখর করে তোলে। উৎসবকে আকর্ষণীয় করে তোলে মেলা। আদিবাসীদের হাতের কাজ অর্থাৎ কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার এবং সাঁওতালী যাত্রা এই মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য।[১]

শিব বিষ্ণু ধর্মরাজ ও অন্যান্য লৌকিক দেবতার সঙ্গে শক্তি-পূজার ব্যাপকতাও বর্ধমান জেলার বৈশিষ্ট্য। কতকগুলি শক্তিপীঠও এই জেলায় বিদ্যমান। দক্ষযজ্ঞে অপমাণিতা দক্ষ-দুহিতা শিবজায়া সতী—দেহত্যাগ ক্রোধোন্মত্ত রুদ্রের স্কন্ধস্থিত সতীর শবদেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে নানাস্থানে পতিত হওয়ায় সেই সেইস্থানে শক্তিপীঠের উদ্ভব হয়। বর্ধমান জেলাতেও কয়েকটি শক্তিপীঠ অবস্থিত।

উজানী এইরূপ একটি শক্তিপীঠ। কাটোয়া মহকুমার অধীনস্থ আজমৎসাহী পরগণায় উজানী নগর অবস্থিত। এককালে উজানী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। এই উজানী ছিল বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের জন্মস্থান। লোচনদাস

উজানি-কো-গ্রামে মঙ্গলচণ্ডী

নিজ জন্মস্থানের নাম কো-গ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে উজানী কো-গ্রাম নামেই পরিচিত। অজয় নদের সঙ্গে কুনুর নদী এখানে মিলিত হয়েছে। এই কো-গ্রামই রবীন্দ্রানুসারী পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থান। উজানী কো-গ্রামে সতীর কুনুই পড়েছিল। এই পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী মঙ্গলচণ্ডী।

১। বর্ধমান পরিক্রমা—সুধীরচন্দ্র দাঁ, পৃঃ ৩৫৩

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে—

উজানীতে কফোনী মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যারে সেবি॥

পীঠ নির্ণয় তন্ত্রে ত্রয়োদশতম পীঠ উজানী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

উজ্জয়িন্যাং কুর্পরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদেবী মঙ্গলচণ্ডিকা॥

মঙ্গলচণ্ডী দেবীর ভৈরবের নাম কপিলাশ্বর। মঙ্গলচণ্ডী পিঙ্গলময়ী দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী। কাঠের সিংহাসনের পুরাভাগে একটি প্রস্তর নির্মিত বৃষ। বামে কপিলাম্বর শিব লিঙ্গ। তাঁর বামে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। মন্দিরের উত্তর-পূর্বে লোচনদাসের পাট। এখানেই লোচনদাসের সমাধি আছে। দুর্গাপূজার সাড়ম্বরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা গ্রাম্য উৎসবের রূপ ধারণ করে। লোচনদাসের স্মরণে উজানীর মেলাও হয়।[১]

আর একটি মহাপীঠ কেতুগ্রামে। এই স্থানের প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে দেবীর বাম বাহু পতিত হয়েছিল বলে প্রসিদ্ধি। পীঠ নির্ণয়ে দ্বাদশতম পীঠের বর্ণনা :

বহুলায়াং বাম বাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুক দেবতাস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥

অন্নদামঙ্গলে আছে—

বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব।

প্রসিদ্ধি আছে যে এই স্থানের রাজা চন্দ্রকেতুর নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে কেতুগ্রাম। জনশ্রুতি অনুসারে রাও পদবীধারী জমিদার বহুলা দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। দেবীর নামান্তর বহুলাক্ষী। কাটোয়া থেকে কেতুগ্রাম ১৩ কি. মি. বাসে যাওয়া যায়। কাল পাথরে গড়া সাড়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ সুদৃশ্য পীঠের উপরে স্থাপিত চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি। দেবীর মুখভিন্ন সকল অঙ্গই কাপড়ে ঢাকা থাকে। দেবীর দক্ষিণে গণেশ ও বামে কার্তিকেয়। দুর্গাপূজার সময়ে ছাগ ও মহিষ বলি সহ মহা আড়ম্বরে দেবীর পূজা হয়।

কেতুগ্রামের বহুলা

১। পশ্চিমবঙ্গের পীঠস্থান—কঙ্করায় পৃঃ ৭, অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ১৩২১ পৃ: ২২-২৪।

শিব চরিত মতে যেখানে ভগবতীর কুনুই, সেই স্থানের নাম রণখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম বহুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে দেবীর বামবাহু পড়েছিল, সেইস্থানের নাম বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা ও বহুলাক্ষী এই দুই দেবীর অবস্থান পীঠকেই যুগ্মপীঠ বলা হয়। শিবচরিতের রণখণ্ড বর্তমানে মরাঘাট নামে পরিচিত। বহুলার মন্দির থেকে এক মাইলের মধ্যে বহুলাক্ষী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। দেবীর মূর্তির অস্তিত্ব বর্তমানে না থাকলেও মহাকাল ভৈরব এখনও আছেন।[১]

যুগ্মপীঠ বহুলা ও বহুলাক্ষী

মঙ্গলকোট—উজানী—কো-গ্রাম—আড়াল প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে ছিল সেকালের উজানী নগর। উজানী ছিল বণিক প্রধান স্থান। মনসামঙ্গল কাব্যে উজানী বেহুলার পিতৃগৃহ হিসাবে প্রসিদ্ধ। মঙ্গলকাব্যের ধনপতি সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগর, চাঁদ সওদাগর, লখিন্দর প্রভৃতি এই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন বলে মনে হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী লাউসেনকে উজানী-কো-গ্রামের পাশে মঙ্গলকোটে হরি তাম্বূলির গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। উজানীর মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলকোটের দেবী বলেই মঙ্গলচণ্ডী বলে খ্যাতা হয়েছিলেন। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ মহাযানীদের এক সময়ে প্রাধান্য ছিল। অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলে ভ্রমরার দহ। ভ্রমরার দহে সওদাগরদের বাণিজ্যতরী বাঁধা থাকতো। ভ্রমরার দহ থেকেই শ্রীমন্ত সওদাগর সপ্ত-ডিঙ্গা ভাসিয়ে সিংহল যাত্রা করে-ছিলেন। মঙ্গলচণ্ডীর দেউল থেকে পূর্বদিকে অল্প দূরে শ্রীমন্তের ডাঙ্গা।

মঙ্গলকোটে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায় প্রাচীন কাব্যে। বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যে বিক্রম কেশরী ও তাঁর পূর্বপুরুষ শ্বেত নামে রাজার নাম পাওয়া যায়, তাঁর রাজধানী ছিল মঙ্গলকোটে। এখানে গোলাম পঞ্জতন নামে পাঁচজন গাজীর সমাধি আছে। তাঁরা মঙ্গলকোট অধিকার করতে এসে জনৈক হিন্দু নরপতির দ্বারা নিহত হন। এখানেই নূতনহাটে সুলতান হোসেন শাহের আমলের একটি মসজিদে বঙ্গাক্ষরে শ্রীচন্দ্র সেন নৃপতির নাম আছে। আঠারো জন আউলিয়া বা সাধুপুরুষের স্মৃতি বিজড়িত মঙ্গলকোট। মঙ্গলকোট অধিকার করতে এসে বিক্রমজিৎ নামে এক হিন্দু রাজার দ্বারা এই আঠারো জন নিহত

মঙ্গলকোটে পীরপঞ্জতনের মেলা

১। স্থান পরিচয়,—অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—১৯১৫।

হয়েছিলেন। পরে গজনবী নামে এক গাজী বা পীর হিন্দুরাজাকে নিহত করে মঙ্গলকোট অধিকার করেছিলেন। অদ্যাপি মঙ্গলকোটে পীর পঞ্জতনের মেলা হয়।[১]

কেতুগ্রাম ২নং ব্লকের অন্তর্গত নিরোল মৌজার দক্ষিণডিহিগ্রাম অট্টহাস পীঠ নামে প্রসিদ্ধ। মরাঘাট থেকে মাত্র এক মাইল দূরে অট্টহাস। আহমদপুর কাটোয়া ছোট লাইনে পাঁচন্দী স্টেশন থেকে এক কি. মি. দূরে দক্ষিণডিহি।

দক্ষিণডিহি বা অট্টহাস

তন্ত্র-চূড়ামণি ও শিব চরিতের মতে এখানে সতীর ওষ্ঠাংশ পড়েছিল; এখানে শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব বিশ্বেশ বা বিশ্বনাথ। কুব্জিকাতন্ত্রের মতে এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দাদেবী বাস করেন। অট্টহাস পীঠ ফাঁকা মাঠের মধ্যে উঁচু জায়গায়। মন্দির বেশী প্রাচীন নয়, সাধারণ দালান। দেবীর কোন মূর্তি নেই। গর্ভগৃহে ঘট স্থাপনা করে জয়দুর্গার ধ্যানে নিত্যপূজা হয়। ডান দিকে একটি ভিন্ন প্রকোষ্ঠে আছেন চন্দ্রশেখর শিব। মন্দিরের সামনে বটগাছের নীচে আছেন ছোট মন্দিরে বিশ্বেশ্বর ভৈরব। নিকটে পুকুরের কোণে পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। মাঘমাসে রটন্তী চতুর্দশী থেকে তিনদিন অট্টহাস দেবীর বার্ষিক উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। তিনদিন ধরে নানা গ্রাম থেকে বহু লোকের সমাগম হয়।[২]

কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যপ্রধান বাঙ্গালার সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নরহরি সরকার। নরহরি শিষ্য সুকবি লোচনদাস, নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব সেন, দামোদর সেন, চিরঞ্জীবের পুত্র ও দামোদরের দৌহিত্র গোবিন্দদাস কবিরাজ, বলরাম দাস, রতিকান্ত, শচীনন্দন, কানাই ঠাকুর, নয়নানন্দ, রায়শেখর, জগদানন্দ প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবকবি সাধক

শ্রীখণ্ডের খণ্ডেশ্বরী

মহাজনের নিবাসস্থল বৈদ্যপ্রধান শ্রীখণ্ডের প্রাচীন নাম ছিল বৈদ্যখণ্ড। শ্রীখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী খণ্ডেশ্বরী। গ্রামের উত্তর প্রান্তে ভূতনাথ নামে অনাদিলিঙ্গ শিব আছেন। এ ছাড়াও আছেন বটুক ভৈরব ও দুধকুমার নামে ছোট শিবলিঙ্গ। শ্বেত পাথরের দুটি বৃষও আছে। প্রাণতোষিণী তন্ত্রের মতে কেতুগ্রামের বহুলা দেবীর ভৈরব ভীরুকই ভূতনাথ—

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ ১ম সং পৃঃ ২৭৯-২৮৫। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উজানি ও মঙ্গলকোট।

২। পশ্চিমবঙ্গের পীঠস্থান পৃঃ ৩০, বর্ধমান পরিক্রমা পৃঃ ৩৪০-৪১, ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন পৃঃ ৪৬-৬৭।

নমস্তে ভীরুকায় ভূতনাথ নামধারিণে।
বহুলাক্ষী ভৈরবায় সদা শ্রীখণ্ড বাসিনে ॥[১]

মহাসমারোহে ভূতনাথের গাজন উৎসব হয়। শ্রীখণ্ড গ্রামে বড়ভাঙ্গা নামক স্থানে নরহরি সরকার ঠাকুরের সাধন-ভজন ও তিরোধানের স্থান। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে নরহরির তিরোধান দিবসে বড়ভাঙ্গায় মহোৎসব হয়। এই সময়ে নানা স্থান থেকে বৈষ্ণব, বাউল ও কীর্তনীয়ারা সমবেত হন। কয়েকদিন ধরে উৎসব চলে। কীর্তন ও বাউলগানে শ্রীখণ্ডগ্রাম মুখর হয়ে ওঠে।[২]

মঙ্গলকোট বর্ধমান কাটোয়া রাজপথের ধারে কৈচর গ্রাম থেকে কয়েক কি. মি. দূরে প্রাচান বর্ধিষ্ণু গ্রাম মাজিগ্রামে অধিষ্ঠিতা আছেন শাকম্ভরী দেবী।

মাজিগ্রামের শাকম্ভরী

কালো পাথরে তৈরী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা শঙ্খ চক্র ত্রিশূল ও কৃপাণধারিণী শাকম্ভরী দেবী। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে শাকম্ভরীর বিশেষ পূজা উৎসব হয় হোমযাগ ও বলিদান সহ। শাকম্ভরী তলায় মেলা বসে। মদন চতুর্দশীতে দেবীর বিবাহ উৎসব হয়। দেউলেশ্বর শিবের সঙ্গে শাকম্ভরীর বিয়েতে উভয়পক্ষের পূজারীরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কাটোয়া মহকুমায় কাটোয়া থেকে ১৭ কি. মি., বর্ধমান থেকে ৩৬ কি. মি. এবং কৈচর স্টেশন থেকে ৩ কি. মি. দূরে পীঠস্থান ক্ষীরগ্রাম। কথিত আছে মহীরাবণ বধের পরে মহীরাবণ পূজিতা মহামায়া মহাপীঠ ক্ষীরগ্রামে অবাস্থান করেন। সতীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ এখানে পতিত হয়। পীঠ নির্ণয় গ্রন্থে অষ্টাদশ মহাপীঠের দেবীর বর্ণনা :

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈববঃ ক্ষীরখণ্ডক :
যুগাদ্যা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদোসম।

অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভারতচন্দ্র বলেছেন—

ক্ষীরগ্রামে ডানিপা'র অঙ্গুষ্ঠ ভৈরব।
যোগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব ॥

ক্ষীরগ্রামের দেবী যুগাদ্যা বা যোগাদ্যা এবং ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক। যোগাদ্যার

১। পশ্চিমবঙ্গের পীঠস্থান
২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ২৯৭

শাঁখা পরার কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়। বৃহৎ জলাশয় ক্ষীরদীঘিতে দেবীর পদাঙ্গুষ্ঠ পড়েছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। সেইজন্য জলগর্ভে দেবীর অধিষ্ঠান।

ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা

শতাধিক বৎসর পূর্বে দাঁইহাটের ভাস্কর নবীনচন্দ্র কোষ্টি-পাথরের দেবীমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন পূর্বতন মূর্তির অনুসরণে। অপূর্ব গঠন সিংহবাহিনী দশভুজা মহিষমর্দিনী যোগাদ্যার বিগ্রহ। সপ্তরথ পীঠের উপরে মহাপদ্ম তদুপরি সিংহবাহিনী, নিম্নে অসি-চর্মধারিণী দেবীর দুই সঙ্গিনী। মন্দিরের প্রথমে প্রবেশ মণ্ডপ ও পরে গর্ভগৃহ। দেবী-প্রতিমা মন্দিরে থাকেন না—গর্ভগৃহে বেদীতে নিত্যপূজা হয়। বেদীর মধ্যস্থলে হনুমানের পাতাল থেকে আগমনের সুরঙ্গী মুখ। কিছু দূরে উঁচু ঢিপির উপরে বেলে পাথরে নির্মিত শিবলিঙ্গ ক্ষীরেশ্বর বা ক্ষীরখণ্ডক।

১৫ই বৈশাখ থেকে যোগাদ্যার বিশেষ পূজার উৎসব সুরু হয়। এইদিন থেকে প্রতিদিনই নানাবিধ অনুষ্ঠান হতে থাকে। ২৭শে বৈশাখ ময়ুর নাচ বা মৌরনাচ নামে একপ্রকার অনুষ্ঠান হয়। ঐই দিন সন্ধ্যায় রামায়ণ গায়করা যুগাদ্যার বন্দনা গান করে মহীরাবণ বধ পালা গান করে থাকেন। ২৯শে বৈশাখ গভীর রাত্রিতে দেবীকে জল থেকে তোলা হয়। দত্ত সামন্ত পুরোহিত রাজসভাপণ্ডিত ও ডোম এই অনুষ্ঠানে অপরিহার্য। ২৯শে বৈশাখ পাটনড়ানের রাত্রিতে, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির ব্রাহ্ম মুহূর্তে ও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে অভিষেকের রাত্রিতে দেবীকে ক্ষীরদীঘি থেকে তুলে অর্চনা করা হয়। এছাড়া আষাঢ়ী শুক্লা নবমীতে, বিজয়া দশমীতে, ১৫ই পৌষ মাকরী সপ্তমীর গভীর রাত্রিতে দেবীকে জল থেকে তুলে বিশেষ পূজার পর পুনরায় জলে নিমজ্জিত করা হয়। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে দেবীর মহাপূজা হয়। এই দিন ময়ুর নাচ শেষ হলে ডোম বাঁশের শলাকা এবং চক্রবর্তী (সাত ভাই) তরবারি নিয়ে মৃদঙ্গের তালে তালে যুদ্ধের অভিনয় করেন। এই অনুষ্ঠানকে ডোমচোয়াড়ী বলে।[১] আগুড়ি, ব্রাহ্মণ, ডোম, দত্তসামন্ত প্রভৃতি সকলেই এই পূজায় অংশগ্রহণ করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। বহু দূর অঞ্চল থেকে যাত্রীরা আসেন মেলায় অংশগ্রহণ করতে।

পুরাণতন্ত্রবর্ণিত দেবীর অঙ্গপতনে ধন্য কয়েকটি পীঠস্থান ছাড়াও বর্ধমান

১। শ্রীযোগাদ্যা বাণীপীঠ পত্রিকায় ৺ সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ অনুসরণে লিখিত।

জেলার কয়েক জায়গায় স্থানীয় শক্তি দেবী দীর্ঘকাল ধরে ভক্তদের পূজা পাচ্ছেন। যাঁদের জনপ্রিয়তা ও মহিমা পুরাণতন্ত্রের মহাপীঠ অপেক্ষা ন্যূন নয়। দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসা থানায় গোপালপুরের নিকটবর্তী শ্যামারূপা এমনি এক প্রসিদ্ধ দেবী। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সুপরিচিত শ্যামা-ভক্ত ইছাই ঘোষ শ্যামারূপাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন খিলানযুক্ত পোড়ামাটির ইটের তৈরী মন্দিরে। শ্বেতপাথরের তৈরী এক ফুট পরিমিত দশভুজা দুর্গা শ্যামারূপা। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায় দেবীর বিরাট উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। বহু দূর থেকে পুণ্যার্থীরা মেলায় সমবেত হন। এক সময়ে প্রচুর ছাগ ও মহিষ বলি হোত। ভক্তরা দেবীর কাছে মানত করে মন্দির পার্শ্বের গাছের ডালে ইট ঝুলিয়ে দিয়ে যান।

শ্যামারূপা

ইতিহাস-সিদ্ধ কল্যাণেশ্বরীর মন্দির বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিমের শেষ শহর বরাকর থেকে ৬ কি. মি. হালদা পাহাড়ে অবস্থিত। শিখরভূমের রাজারা হালদা পাহাড়ের চতুর্দিকে কল্যাণপুরের পত্তন করেছিলেন বলে দেবীর নাম কল্যাণেশ্বরী বলে অনুমান করা হয়। মতান্তরে শিখরভূমের রাজা কল্যাণেশ্বর সিং দেবীর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে রাজার নামানুসারে দেবীর নাম হয় কল্যাণেশ্বরী। কালক্রমে কল্যাণেশ্বর সিং প্রতিষ্ঠিত মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় দেবীও বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত হন। পরে কাশীধাম থেকে আগত শিবচৈতন্য নামে এক সাধক শিখরভূম বা পঞ্চকোটের রাজার আনুকূল্যে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করেন। ১২৩০ বঙ্গাব্দে কাশীপুরের রাজা বিক্রম সিংহ পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপরে নূতন মন্দির নির্মাণ করে কল্যাণেশ্বরীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানটি 'মায়ি-কি স্থান' থেকে মাইথন নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের নিকট কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। কল্যাণেশ্বরীরও যোগাদ্যার মত শাঁখা পরার কাহিনী প্রচলিত। কার্তিক মাসে কালীপূজার সময়ে বিশেষ উৎসব হয়। এক সময়ে দেবীর নিকট নরবলি দেওয়া হোত। ছাগবলি এখনও প্রচুর হয়। সন্তান কামনায় বন্ধ্যা রমণীরা দেবীর নিকট মানত করেন।

বরাকরের কল্যাণেশ্বরী

বরাকর রেলস্টেশন থেকে দেড় কি. মি. দূরে বেগুনিয়া বাজারের ডান দিকে চারটি শিখর দেউল বর্তমান। পাশাপাশি দুটি দেউল ৬০ ফুট উঁচু।

মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ আছেন, বামদিকের মন্দির গাত্রে বিরাট গণেশমূর্তি ও ডানদিকের মন্দিরের দেওয়ালে মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে। মন্দির গাত্রের প্রতিষ্ঠা লিপি থেকে জানা যায় যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী হরিপ্রিয়া দেবী ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৃতীয় দেউলটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ। এই মন্দিরের মধ্যে ৫ ফুট ৯ই ইঞ্চি দীর্ঘ একটি পাথরের উপরে একটি মৎস্যের উপরে পাঁচটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। চতুর্থ মন্দিরটি সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির। পূর্বমুখী এই মন্দিরের উপরিভাগে চৈত্য গবাক্ষে জটাকূটধারী ধ্যানমগ্ন এক ঋষির মূর্তি আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথে দুদিকে দুটি বৃষ আছে। এই অঞ্চলে যে শৈব ধর্ম বা পাশুপত ধর্ম এবং শাক্ত ধর্মের প্রসার ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বরাকরের দেউল ও উৎসব

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়পুর নিবাসী সাধক সীতারাম বাবা ১৩৩১ বঙ্গাব্দে এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দালালকোঠা মন্দিরে গৌর নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশে প্রতিষ্ঠা করেন জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মূর্তি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে নবরাত্র কীর্তন ও উৎসব হয়। রাস ও রথযাত্রার সময়েও বিপুল সমারোহ সহকারে উৎসব পালিত হয়।

মন্তেশ্বর ব্লকের ভাতার-নাসিগ্রাম রাস্তার ধারে শুশুনিয়া গ্রামে প্রাচীন মন্দিরে অধিষ্ঠিতা আছেন তারাখ্যা দেবী। এই গ্রামের খাঁ উপাধিধারী জমিদারদের 'তারা খাঁ' নামক দীঘি থেকে মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় দেবী তারাখ্যা দেবী নামে পরিচিতা হন। দেবী চতুর্ভুজা ত্রিনয়না পদ্মাসীনা, নিম্নাঙ্গে রক্ত পট্টবস্ত্র পরিহিতা, উর্ধ্বাঙ্গে অনাবৃতা—নিম্ন দক্ষিণ হস্তে গদাধারিণী, বামহস্ত দ্বারা শিবকে স্তন্যদানে নিয়তা। দেবীর দুই পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া। মন্দির মধ্যে একটি গজলক্ষ্মীর মূর্তিও বিদ্যমান। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজা কয়েক শ একর ভূমি দান করে দেবীর পূজা ও উৎসবের ব্যয় নির্বাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছিলেম। দুর্গা পূজার সময় দেবীর বিশেষ পূজার উৎসব ও মেলা হয়।

শুশুনিয়ার তারাখ্যা দেবী

জামালপুর থানার অন্তর্গত চকদীঘি থেকে ৩ কি. মি. পূর্বে মহলা বা মৌলা গ্রামে রক্ষিণী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, বলরাম দাসের কালিকামঙ্গলে, রূপরাম চক্রবর্তী ও মাণিকরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে মৌলায় রক্ষিণী দেবীর উল্লেখ আছে। দুর্গাপূজার

মৌলার রক্ষিণী

সময়ে শারদীয়া মহাষ্টমী ও মহানবমীতে জাঁকজমক সহকারে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। রঙ্কিণী দেবীর মন্দির থেকে কিছুদূরে চড়ক উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

বর্ধমান রেলস্টেশন থেকে ১০ মাইল উত্তরপূর্বে কুড়মুন গ্রামে একটি দালান মন্দিরে ঈশানেশ্বর শিব ও ইন্দ্রাণী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। কাল কোষ্টিপাথরে নির্মিত ইন্দ্রাণী বিগ্রহ আঃ ১৪শ শতাব্দীতে নির্মিত। ইন্দ্রাণী দেবী ললিত ভঙ্গীতে একটি হাতীর উপরে উপবিষ্টা,—দ্বিভুজা,—দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বামহস্তে অঙ্কুশ-ধারিণী। তাঁর নাসিকা শুকপক্ষীর ঠোঁটের মত। এই গ্রামে তন্তুবায় পরিবারে কালাচাঁদ নামে কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ আছেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় কালাচাঁদের গাজন হয়। এই গ্রামের প্রধান উৎসব ঈশানেশ্বর শিবের গাজন। ১৩ই চৈত্র ঈশানেশ্বরকে গাজনতলায় মন্দিরে আনা হয়। গাজন সুরু হয় চৈত্রের ২৫/২৬ তারিখ থেকে। পাল্‌কি করে শিবকে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রদক্ষিণ করানো হয়। সন্ন্যাসীরা মড়ার মাথা তরোয়াল ও বেতের ডগায় গেঁথে নৃত্য করেন। বাঁশের তৈরী থাকায় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মাটির ঘর তৈরী করে শোভাযাত্রা হয়।

কুড়মুনে ইন্দ্রাণী ও ঈশানেশ্বর শিব

জাড়গ্রামে কালুরায় নামে ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত আছেন। কালুরায়ের গাজন অনুষ্ঠান হয় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ অথবা আষাঢ় মাসের যে কোন মঙ্গলবার থেকে বারোদিন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল গান করা হয়। রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে জাড়গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দশমদিনে কালুরায়ের বিবাহ উৎসব হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রচুর বাজি পোড়ানো হয়। দ্বাদশতম দিনে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে সঙ্‌ বার হয়। উৎসব শেষ হয় ত্রয়োদশতম দিনে।

জাড়গ্রামের কালুরায়

বর্ধমান-ব্যাণ্ডেল মেন লাইনের রেল স্টেশন পালসিট স্টেশন থেকে ২ কি.মি. দূরে ভৈটা গ্রামে শ্যামাদাস আচার্য নামক এক বৈষ্ণব সাধকের প্রতিষ্ঠিত নিমকাষ্ঠের তৈরী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ মদন-গোপাল নামে প্রসিদ্ধ। বর্ধমানের রাজারা মদনগোপালের সেবার জন্য প্রভূত নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। রাস ও দোলের সময় মদনগোপালের উৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা বসে। নানা স্থান

ভৈটার মদনগোপাল

থেকে কীর্তনীয়ারা সমবেত হয়ে কীর্তন পরিবেশন করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় শ্যামাদাসের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মদনগোপালের পোড়ামাটির অলংকরণশোভিত নাটমন্দিরসহ আটচালা মন্দিরটি দর্শনীয়।

অণ্ডাল স্টেশন থেকে ট্রেনে বা বাসে উখড়া নামে প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। এখানকার জমিদার মেহেরচাঁদ হাণ্ডার কন্যা বিষণকুমারীর সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদের বিবাহ হয়। মেহেরচাঁদ দাঁইহাট থেকে প্রস্তরনির্মিত গোপীনাথ বিগ্রহ উখড়ায় এনে প্রতিষ্ঠা করেন। মেহেরচাঁদের পুত্র বক্তার সিং গোপীনাথের জন্য পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন, দোলযাত্রা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে গোপীনাথের জাঁকজমক সহকারে উৎসব হয়।

উখড়ার গোপীনাথ

রথযাত্রা এবং ঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে সর্ববৃহৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঝুলন-উৎসব সুরু করেছিলেন জমিদার শম্ভুনাথ লক্ষ্মণসিং হাণ্ডে ১২২০ বঙ্গাব্দে। ঝুলনযাত্রা উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। এই মেলা থাকে পনেরো দিন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যেও বিরাট মেলা বসে।

মানকর বা গুসকরা থেকে বাসে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ একদা নানাবিধ কুটির-শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ দিগনগর গ্রামে নানাবিধ দেবদেবী অধিষ্ঠিত আছেন। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র এখানে হাট-কীর্তিনগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে একটি সরোবরের নিকটে শিখর রীতির মন্দিরে প্রস্তর-নির্মিত চতুর্ভুজা মহিষাসুরমর্দিনী এবং অখিলেশ্বরী নামে চামুণ্ডা এখনও পূজিতা হচ্ছেন। গ্রামধ্যে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র-নির্মিত মন্দিরে আছেন জগন্নাথ, সুভদ্রা বলরামের বিগ্রহ। কীর্তিচন্দ্র নির্মিত মন্দির ধ্বংস হওয়ায় মহারাজ বিজয়চাঁদ নূতন মন্দির নির্মাণ করেন। জগন্নাথ মন্দিরের অদূরে চারচালা মন্দিরে প্রস্তরখণ্ডের উপরে খোদিত যোগীর মূর্তির মত বাঁকুড়া রায় নামে ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত। ধর্মরাজের মূর্তির পাশে একটি পাথরে ক্ষোদিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মূর্তি আছে। জগন্নাথের রথযাত্রা ও বাঁকুড়া রায়ের গাজন দিগনগরের বড় উৎসব। বাঁকুড়া রায়ের গাজন সুরু হয় দশহরার দিন, শেষ হয় জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার দিন। রথযাত্রা ও স্নানযাত্রায় এবং শিবরাত্রির দিন গ্রামে মেলা বসে।

দিগনগরের মেলা

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ও তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস দীক্ষার গুরু

কেশব ভারতীর জন্মস্থান কাটোয়ার নিকটবর্তী আউরিয়া গ্রামে। মাঘ মাসের ভীম একাদশীতে কেশব ভারতীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। মেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে আগত কীর্তনীয়াদের কীর্তন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আউরিয়ার মেলা

কালনা থানার অন্তর্গত কালনা থেকে ৫ কি. মি. পশ্চিমে আমুখাল গ্রামে মজুমদার পরিবারের অষ্টধাতুর জয়দুর্গা বিগ্রহ নিত্য পূজা পান। জয়দুর্গার গাজন হয়। গাজন উপলক্ষ্যে মেলা বসে ও বহু লোকের সমাবেশ হয়। আমুখালের চড়ক উৎসবে ফোঁড় হয়। বহুলোক চড়ক দেখার জন্য সমবেত হন।

আমুখালের গাজন উৎসব

কেতুগ্রাম থানায় কুমারপুর রেল-স্টেশনের অদূরে আমগড়িয়া গ্রামে রাধামাধব নামে রাধাকৃষ্ণের চার ফুট উঁচু দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসে রাধামাধবের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে একটি বড় মেলা বসে। মেলাটি বেশ প্রাচীন।

আমগড়িয়ার মেলা

পারাজ স্টেশন থেকে অথবা অভিরামপুরে বাস থেকে নেমে সুপ্রাচীন এড়াল গ্রামে বুদ্ধেশ্বর শিব অধিষ্ঠিত আছেন। এই গ্রামের বড় উৎসব কালীপূজা। ১৫ ফুট উঁচু কালীপ্রতিমাকে কেন্দ্র করে গ্রাম্য উৎসব বহুজনের সমাগমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কালীপূজা উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে।

বর্ধমানের কয়েকজন কৃতী মানুষ

বহু জ্ঞানীগুণী চিন্তানায়ক মনীষীর আবির্ভাবে ধন্য এই বর্ধমান জেলা। তাঁদের কীর্তি, তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের চরিত্রগৌরব বর্ধমানকে গৌরবের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে নানা প্রসঙ্গে তাঁদের কথা কিছু কিছু উল্লিখিত হয়েছে। যাঁদের কীর্তিকলাপ পূর্বে কথিত হয়েছে পুনরুক্তির অযৌক্তিকতাবোধে এই অধ্যায়ে তাঁদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্যান্যদের কথাই এখানে আলোচনা করেছি।

বর্ধমান জেলার গৌরব স্বদেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী অতুলচন্দ্র ঘোষ (১৮৮১-১৯৬১) বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম মাখনলাল ঘোষ। তিনি বর্ধমানে মহারাজা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৯) ও রাজ কলেজ থেকে এফ্. এ. পাশ করার পরে কলিকাতা মেট্রো-

পলিটান কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হওয়ার পরে পুরুলিয়ায় আইন ব্যবসায় লিপ্ত হন। পুরুলিয়ায় অঘোরচন্দ্র রায়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভাকে বিবাহ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি (১৯২১-৩৫), মানভূম জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (১৯৩৫-৪৭) এবং জেলা সত্যাগ্রহ কমিটির সেক্রেটারি (১৯৩০) হিসাবে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে তিনি কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেস সরকারের ভাষানীতি সম্পর্কে মতবিরোধের ফলে ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে লোকসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে বিহার সরকারের অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী অতুলচন্দ্র ও তাঁর সঙ্ঘ বিহারে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অতুলচন্দ্র ঘোষ

শ্রীখণ্ডনিবাসী উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয় মৃত্যুঞ্জয় দত্তের পুত্র অনুপচন্দ্র দত্ত বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদের শিষ্য ছিলেন। সাধক প্রকৃতির প্রতাপচাঁদ জাল প্রতাপচাঁদ কাহিনীর নায়ক হিসাবে পরিচিত হন। অনুপচন্দ্র প্রতাপচন্দ্র লীলারস প্রসঙ্গ নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

অনুপচন্দ্র দত্ত

পাহাড়হাটির গোলাম আসগর জাহেদীর পুত্র আবদুল জব্বার খান বাহাদুর সি. আই. ই. (জন্ম: ১৮৩৭) উনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা পাস করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন। ফারসী ভাষা, গণিত ও ধর্মশাস্ত্রে ছিল প্রভূত পাণ্ডিত্য। তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পরে গাইবান্ধার মহকুমাশাসক, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৭৬) এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৮৪) হয়েছিলেন। সরকারী কর্ম থেকে অবসর নিয়ে তিনি মক্কা গিয়েছিলেন তীর্থদর্শনে (১৮৯৫)। ১৮৯৭ সাল থেকে পাঁচ বৎসর ভূপালে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে ভূপালের নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। কলিকাতার টাউনহলে রাজনৈতিক সভায় সভাপতিরূপে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন। রক্ষণশীল মুসলমান হলেও তিনি ছিলেন

আবদুল জব্বার খান বাহাদুর

দানশীলতার জন্য খ্যাত। তিনি দুটি উর্দু ভাষায় পুস্তিকা ও বঙ্গভাষায় ইসলাম ধর্ম পরিচয় নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিপ্লবী ও অধ্যাত্মসাধক অনিলবরণ রায় (১৮৯০-?) জন্মগ্রহণ করেন গুইরগ্রামে। অধ্যাপনা ত্যাগ করে ইনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, পরে কংগ্রেস ত্যাগ করে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন এবং সেণ্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ হন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে কারাগারেই যোগসাধনা করতে থাকেন, অবশেষে পণ্ডিচেরিতে অরবিন্দের সান্নিধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন। অনিলবরণ শ্রীঅরবিন্দের Essays on Gita গ্রন্থের বঙ্গভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: Mother India, India's mission in the world, Songs from the Soul, Sri Aurobindo and the new age, পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ, যোগে দীক্ষা, গীতার বাণী।

অনিলবরণ রায়

কবিরাজ অমূল্যচরণ সেনের জন্ম (১৮৯৭) সাতগড়িয়ায়। তিনি শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ হাসপাতালে চিকিৎসক ছিলেন এবং আয়ুর্বেদ সম্পর্কে গবেষণায় রত ছিলেন। আয়ুর্বেদ মঞ্জরী নামে একটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থেরও তিনি প্রণেতা।

অমূল্যচরণ সেন

অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ কালনা থানার অন্তর্গত অকাল পৌষ গ্রামে জন্মগ্রহণ (১৮৭০) করেছিলেন। শিক্ষকতাকেই তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি ছিলেন হিন্দু স্কুলের শিক্ষক, পরে শিক্ষকতা ত্যাগ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তিনি ছিলেন ডন সোসাইটি ও ডন পত্রিকার সম্পাদক। বর্ধমান সম্মিলনীরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী (১৮৮৬—১৯৫২) জন্মগ্রহণ করেছিলেন মাতুলালয়ে বর্ধমান জেলার টুব গ্রামে। আদি নিবাস চট্টগ্রামের সুলতানপুর ত্যাগ করে তাঁর পিতা মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত মওলানা আবদুল হাদী দিনাজপুরের মহম্মদ বাকী আরবী সাহিত্য, ইতিহাস ও হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি খিলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে গ্রেপ্তার বরণ করেন (১৯৩০) এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করে কারাবরণ করেন (১৯৩২)। পরে তিনি ফজলুল হকের

আবদুল্লাহেল বাকী

প্রজা আন্দোলনে যোগ দেন এবং ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন (১৯৩৪) পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অবিভক্ত বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হন (১৯৪৬), পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ও পরে সভাপতি হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গণ-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। পীরের ধ্যান নামে একটি পুস্তিকা এবং বহু প্রবন্ধের তিনি রচয়িতা।

কাশীনাথ তর্কালংকার

পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালংকার (মৃত্যুর ১৮৫৭) জন্মগ্রহণ করেছিলেন: কালনা থানার অন্তর্গত উপলতি গ্রামে। মহামহোপাধ্যায় কাশীনাথ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। হাতীবাগানে ছিল তাঁর চতুষ্পাঠী। ছাত্রদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা তিনি স্বয়ং করতেন। প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ নামে একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন।

কৃষ্ণধন দে

কবিকৃষ্ণধন দে'র (মৃতু: ৩০।৩।১৯৭৩) জন্মস্থান বর্ধমান জেলার আঝাপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শতাধিক কবিতার সংকলন গ্রন্থ প্রণয় গীতিমালা প্রকাশিত হয় মৃত্যুর পর। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ: ব্যথার পরাগ। ছোটদের জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থ: লিপি লেখা, রঘুবংশের গল্প, গল্পে কাদম্বরী, দশকুমার চরিতের গল্প, নলোদয় প্রভৃতি।

কৃষ্ণধন ন্যায়পঞ্চানন

মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণধন ন্যায় পঞ্চানন (১২৪০—২৬।৮।১৩১৮) পূর্বস্থলীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভারত মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে আসীন ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে প্রধান স্মার্তের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বগ্রামেও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে তিনি অধ্যাপনা করতেন। বাতদূত, স্মৃতিসিদ্ধান্ত, বৃহমুগ্ধবোধ, শ্যামাসন্তোষ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ: অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, কর্পূরাদি স্তোত্র, মলমাসতত্ত্ব, বেদান্ত পরিভাষা, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি।

বিগত দিনের খ্যাতনামা গায়ক কে. মল্লিক বর্ধমানের কুসুম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম: মুন্সী মহম্মদ কাসেম; মহম্মদ ইসমাইল

নামে পরিচিত ছিলেন। কলিকাতায় মাড়োয়ারীর দোকানে কাজ করার পর

কে. মল্লিক

কানপুরে ব্যালি ব্রাদার্সের কর্মী। কানপুরে আবদুল হাই হাকিমের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার পর কলিকাতায় ২০ টাকা বেতনে কর্ম করার সময়ে জার্মান রেকর্ড কোম্পানী 'বেকা'-তে ১২টি গানের রেকর্ড করে গায়ক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন। বাঙ্গালা গানে কে. মল্লিক, হিন্দীগানে পণ্ডিত শংকর মিশ্র এবং ইসলামী গানে মুন্সী মহম্মদ কাসেম নামে ১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অজস্র গানের রেকর্ড করেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতির গান গেয়ে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (৬।৭।১৮৭৫-৬।২।১৯৪৬) মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীর বংশে সরডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হিসাবে গণিতে ১ম শ্রেণীর অনার্স সহ

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

বি. এ. (১৮৯৩), রসায়নে প্রথম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৮৯৪), মেডিসিন ও সার্জারীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. বি. (১৮৯৮), এম্. ডি. (১৯০২) ও শরীর তত্ত্বে পি-এইচ্-ডি. (১৯০৪) ডিগ্রী লাভ করেন, বহু পদক এবং পুরস্কারও লাভ করেন। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে (১৯০৫-২৩) ও পরে কলিকাতায় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি নাইট্ উপাধি পান। ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইন্স্টিটিউসন প্রতিষ্ঠা করে তিনি দেশী ঔষধ প্রস্তুত করতেন। কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' আবিষ্কার করে তিনি মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ট্রিটিজ্ অন্ কালাজ্বর।

শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কেশব ভারতীর জন্মস্থান বর্ধমানের

কেশব ভারতী

কুলিয়া গ্রামে। তাঁর পূর্বনাম কাশীনাথ আচার্য। বিশ্বম্ভর পণ্ডিত ও তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপকে তিনি সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

ঘনশ্যাম সার্বভৌমের পুত্র কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় ধাত্রীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৩০ সালে। ন্যায়শাস্ত্র পাঠ সমাপ্ত করে কাশীতে

কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি

সরকারী সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাঙ্গালা দেশের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। ভাষ্যছায়া নামে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের একটি টীকা রচনা করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাগুরু বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জননী কুড়ুনী দেবীও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। স্বামী রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনি নিজেই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর শ্বশুরালয় তথা নিবাস ছিল বর্ধমান জেলারই শাকনাড়া গ্রামে।

কুড়ুনী দেবী

বর্ধমানের সাদিপুর গ্রামের অধিবাসী গোরাচাঁদ বসুর পুত্র ক্ষুদিরাম বসু। (৩১।১।১২৬০—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষাব্রতী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহ লাভ করায় খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, পরে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অনুরাগী হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহচর্য প্রাপ্ত হওয়ায় মেট্রোপলিটান কলেজে তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দর্শন শাস্ত্রের অনার্স পড়াতে থাকেন। তিনি কলিকাতায় সেণ্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউসন (বর্তমানে ক্ষুদিরাম বসু কলেজ) প্রতিষ্ঠা করে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ পদে আসীন ছিলেন।

ক্ষুদিরাম বসু

বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক গণনাথ সেনের (১৮৭৭—২৭।১০।১৯৪৪) জন্ম বারাণসীতে হলেও তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডে। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম। তিনি এল্. এম্. এস্ (১৯০৩) এবং এম্. এ. (১৯০৮) পাশ করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সমন্বয় সাধন করে চিকিৎসা করতেন। পিতার নামে বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় স্থাপন তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁরই চেষ্টার ফলে তৎকালীন বঙ্গদেশ সরকার কর্তৃক ষ্টেট্ ফ্যাকালটি অফ্ আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। নিখিল ভারত আয়ুর্বেদীয় মহাসম্মেলনে ইন্দোর অধিবেশনে (১৯১১) এবং মহীশূর অধিবেশনে (১৯৪০) তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত করেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ : প্রত্যক্ষ শারীর ও সিদ্ধান্ত নিদান এবং বাঙ্গালা গ্রন্থ : আয়ুর্বেদ পরিচয়।

গণনাথ সেন

বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ গণপতি পাঁজা (১৩০০-২১।৫।১৩৬৬ বঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার মাজিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র

চন্দ্র নন্দীর অর্থানুকূল্যে লেখাপড়া শিখে এম্. বি. বি. এস্. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। চর্মরোগ সম্পর্কে গবেষণা ও চর্মরোগ চিকিৎসার জন্য তাঁর খ্যাতি ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়। মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোটস্ সুবর্ণপদক লাভ করেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল ও ভেটারেনারি শাখায় সভাপতি (১৯৪৭) নির্বাচিত হন। এশিয়া মহাদেশে তিনিই প্রথম চর্মরোগ গবেষণাগার স্থাপন করেন।

গণপতি পাঁজা

বর্ধমান জেলার বেরুগ্রাম নিবাসী জানকীপ্রসাদ বসুর পুত্র গিরিশচন্দ্র বসু (২৯।১০।১৮৫৩—১।১।১৯৩৯ বঙ্গাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স এবং হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৭৬) পাশ করে কটকে র‍্যাভেন্‌শ কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে অধ্যাপনাকালে এম্. এ. পাশ করেন। সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাতে গিয়েছিলেন। বিলাতে রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সোসাইটির আজীবন সভ্য হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কৃষিব্যবস্থার উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সাপ্তাহিক কৃষি গেজেট পত্রিকা প্রকাশ করেন। বঙ্গবাসী স্কুল (১৮৮৬) ও বঙ্গবাসী কলেজ (১৮৮৭) প্রতিষ্ঠা করে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং বোটানিক্যাল সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের প্রথম সভাপতি (১৯৩৫) ছিলেন। কৃষি ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : **Manual of Botany**, কৃষি সোপান, কৃষি পরিচয়, গাছের কথা, ভূতত্ত্ব, ইউরোপ ভ্রমণ, বিলাতের পত্র প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্র বসু

গৌরীদাস পণ্ডিত (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী) অম্বিকা-কালনা নিবাসী। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অন্তরঙ্গ ভক্ত। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভু গৌরী-দাসের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। গৌরীদাসের ভ্রাতা সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবৎকালেই তাঁদের বিগ্রহ গৌরীদাস প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতেন। পদকল্পতরুতে গৌরীদাসের রচিত দুটি পদ সংকলিত হয়েছে।

গৌরীদাস পণ্ডিত

পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ এফ. এ. (আঃ ১৮৮৯—১৯১২) নবদ্বীপে বসবাস করলেও কালনার সন্তান। তিনি নবদ্বীপ কংগ্রেসের সভাপতি ও নবদ্বীপ বঙ্গ বিবুধজননী সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি চৈতন্য চরিতামৃত ও রামচরিত মানসের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ১২ খণ্ডে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ (আংশিক) প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া জাতীয়তাবাদী বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করে কালনা থেকে প্রকাশ করতেন। নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস ও সুনীতি শিক্ষা নামে দুখানি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুবক্তা—সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন।

গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতনামা পুরুষ দেবকীকুমার বসু বর্ধমানের কৃতী সন্তান। তাঁর নিবাস ছিল কালনা থানার অন্তর্গত অকালপৌষ গ্রামে। দেবকীকুমার (২৫।১১।১৮৯৮—১৭।১১।১৯৭১) বিদ্যাসাগর কলেজে ছাত্রাবস্থায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। কলেজ ছেড়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং শক্তি নামে দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। ধীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন কোম্পানীর Flame and Flesh ছবিতে গল্পকার ও চিত্রনাট্যকার হয়েছিলেন (১৯২৭), প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রতিষ্ঠানের অপরাধী চিত্রের কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করে পরিচালনা করেন। নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষের আহ্বানে এখানে চণ্ডীদাস ছবি (১৯৩০) পরিচালনা করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে যোগ দিয়ে তিনি সীতা (হিন্দী) ও সোনার সংসার (দ্বিভাষিক) চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ভেনিসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৩৫) ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রথম সম্মানিত হয়। নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে বিদ্যাপতি (দ্বিভাষিক) সাপুড়ে, নর্তকী প্রভৃতি এবং স্বাধীনভাবে কৃষ্ণলীলা, কবি, রত্নদীপ, চন্দ্রশেখর, চিরকুমার সভা প্রভৃতি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। নব নব কলাকৌশল প্রয়োগ করে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছিলেন। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৫৬) এবং পদ্মশ্রী (১৯৬৫) উপাধিতে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন।

দেবকীকুমার বসু

কালনা নিবাসী নগেন্দ্রনাথ সেন (মৃত্যু : ১৩২৬ বঙ্গাব্দ) কলিকাতায় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করেও কবিরাজী চিকিৎসা করতেন। কেশরঞ্জন তেলের আবিষ্কর্তা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ হন। কালনা নিবাসী কবিরাজ বিনোদলাল সেন ও জবাকুসুম তেলের আবিষ্কর্তা কবিরাজ চন্দ্রশেখর সেন তাঁর নিকট আত্মীয়। সচিত্র কবিরাজী শিক্ষা, সচিত্র ডাক্তারি শিক্ষা, সচিত্র সুশ্রুত সংহিতা ও দ্রব্যগুণ শিক্ষা তাঁর রচিত গ্রন্থ।

নগেন্দ্রনাথ সেন

প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ নলিনাক্ষ দত্তর (৪।১২।১৮৯৩—২৭।১১।১৯৭৭) পিতৃভূমি বর্ধমানের পূর্বস্থলী। তাঁর পিতার নাম সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পালিভাষায় অনার্স সহ বি. এ. ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম্.এ. পাশ করেন। পরে পি. আর. এস্., পি. এইচ্. ডি., বি. এল এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্. ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুকাল রেঙ্গুনে জাড্‌সন কলেজে অধ্যাপনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষার অধ্যাপক হন। কাশ্মীর সরকারের আহ্বানে তিনি গিলগিট ম্যানাসক্রিপ্ট সম্পাদনা করেন। ইণ্ডিয়ান্ হিস্‌টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, মহাবোধি সোসাইটি ও গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটির পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। দুবার এশিয়াটিক্ সোসাইটির অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ও বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মসভায় (১৯৬০) ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন। ব্যবসায়ী হিসাবেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচিত গবেষণা গ্রন্থ : **Aspects of Mahayāna Buddhism in its relation to Hinayano.**

নলিনাক্ষ দত্ত

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভ্রাতা নিধিরাম মিশ্র (চক্রবর্তী)র নিবাস ছিল দামিন্যা বা দামুন্যা গ্রামে। কবিচন্দ্র মিশ্র নামেও তিনি পরিচিত। তাঁর রচিত গঙ্গার বন্দনা, গুরুদক্ষিণা, সত্যনারায়ণ কথা প্রভৃতি কাব্য। দাতাকর্ণ ও কলঙ্কভঞ্জন রচয়িতা কবিচন্দ্র সম্ভবতঃ নিধিরাম মিশ্রের সঙ্গে অভিন্ন।

নিধিরাম মিশ্র

রানীগঞ্জের জমিদার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় (২২/৬/১২৯১—১৭/৫/১৩৫১ বঙ্গাব্দ) ছিলেন সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক। তাঁর পিতার নাম যাদবলাল

বন্দ্যোপাধ্যায়। লাভপুরে তিনি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৩১২ বঙ্গাব্দে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পূর্ণিমা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৩৩৩ সালে। নবাবী আমল, বীর রাজা, ভুলের মেলা, রূপকুমারী (গীতিনাট্য), প্রভাত স্বপ্ন, অন্তরায় (উপন্যাস) প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসুর পত্নী এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের কন্যা নীরদমোহিনী দেবীর (২৪।২।১৮৬৪—২।১১।১৯৫৪) জন্ম বর্ধমানে। গিরিশচন্দ্র বিলাত গেলে নীরদমোহিনী দেশে থেকে দেশী-বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং প্রবাহ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। অল্প বয়স থেকেই তাঁর কবিতা বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নারীমুক্তি, দেশের স্বাধীনতা, প্রভৃতি ছিল তাঁর কাব্যের বিষয়। পরে কবিতাগুলি পারিজাত ও ছায়া নামে সংকলিত হয়।

নীরদমোহিনী দেবী

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ত্রিভঙ্গ রায়ের (১৯০৬—৯/৬/১৯৭৯) জন্মস্থান বর্ধমান জেলার বনপাস। তিনি বোলপুর শিক্ষানিকেতন থেকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী এবং গণিতে লেটার সহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিলেন। তিনি নিরালম্ব স্বামী (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপদানে ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। কানপুরের জে. কে. অরগানাইজেসনের কমলা টেম্পল্‌-এর ভিতরের দেওয়ালে অংকিত শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত কাহিনীর চিত্ররূপ তাঁর অসামান্য কীর্তি। দিল্লীর প্রদর্শনীতে তাঁর সিল্কের উপরে অংকিত হোলি বিষয়ক চিত্রটি স্বর্ণপদক লাভ করে। মাটির প্রতিমা নির্মাণে ও গ্রন্থ রচনায় তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। গৌতম বুদ্ধ, মাণিক অঙ্গুরী, ছুটির চিঠি, বাঙলা মায়ের রূপকথা, রাঙাদির রূপকথা প্রভৃতি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন।

ত্রিভঙ্গ রায়

বর্ধমানের মেড়াল নিবাসী অঘোরনাথ দত্তের পুত্র নলিনচন্দ্র দত্ত (১৮৯৩—১১।১০।১৯৬৪) অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হয়ে ইনি চন্দননগর বোড়াই চণ্ডীতলায় মাতুলালয়ে পালিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. পাশ করে (১৯১৮) কার্তিক বসু লেন থেকে প্রবর্তক সঙ্ঘের মুখপাত্র Standard Bearer পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারের দায়িত্ব

নলিনচন্দ্র দত্ত

গ্রহণ করেন। প্রবর্তক সঙ্ঘ গঠনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মতিলাল রায়ের মৃত্যুর পর তিনি প্রবর্তক সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রথম জীবনে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

ধর্মপ্রচারক পত্রিকার সম্পাদক এবং বসুমতী পত্রিকার সহসম্পাদক নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় (৮।৭।১২৮৮—২৭।৭।১৩৫০ বঙ্গাব্দ) কাব্যসিন্ধু (কাশী) জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার গঙ্গাপুর (গাঙ্গপুর) গ্রামে। তিনি ইংরাজী ও

নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালায় ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ: সাহিত্যপ্রসূন, সাহিত্যদর্পণ, আশুতোষ সরল ব্যাকরণ, সাহিত্য রত্নাকর, সংস্কৃত ব্যাকরণ সারসোপান, A Garland of Poems, Boys' First Word Book, Reading in English, Hints on the Study of Sanskrit, The Code of Civil Procedure 1882—1889.

প্রতাপচন্দ্র রায় সি. আই. ই. (১৬।৩।১৮৪১—১৩।১।১৮৯৫) জন্মগ্রহণ করেন বর্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায়

প্রতাপচন্দ্র রায়

এসে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে চাকরি নিয়েছিলেন। পরে তিনি একটি বইএর দোকান খুলেছিলেন। সাত বৎসরের পরিশ্রমে মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ও ইংরাজী অনুবাদ তাঁর মূল্যবান কীর্তি। রামায়ণ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি বহু পৌরাণিক গ্রন্থেরও তিনি অনুবাদক।

প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর (২৭।৮।১৮৮০—১২।১০।১৯৭৩) জন্মস্থান: বর্ধমান জেলার চান্দুলি। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম: প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. পাশ করলেও গণিত ও পদার্থবিদ্যায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

শ্রীঅরবিন্দ যখন অধ্যক্ষ ছিলেন ন্যাশন্যাল কাউনসিল অফ্ এডুকেশন-এ শিক্ষকতা করতেন। পরে তিনি রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। পরে সাধনার মার্গে প্রবেশ করেন। তন্ত্র সাধনায় তিনি স্যর জন উড্রফের সহকর্মী। তিনি বিজ্ঞান ধর্মের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। Approaches to Truth, Metaphysics, Science and Sadhana, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান, বেদ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দের রচিত পুস্তক।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী ও সহকর্মী অরবিন্দ

প্রকাশ ঘোষের বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত পুত্র বটকৃষ্ণ ঘোষের জন্মস্থান কালনা থানার অন্তর্গত অকালপৌষ গ্রামে। বটকৃষ্ণ প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হওয়ার পরে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষা এবং স্বগৃহে নিজ চেষ্টায় জার্মান ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। জার্মানীর ম্যুনিখ ও ফ্রান্সের প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে উভয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অধ্যাপনা করেন, বিদ্যাসাগর কলেজে ফরাসী ও জার্মান ভাষার লেকচারার ছিলেন, এসিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। **Linguistic Introduction to Sanskrit, Collection of Fragments of Lost Brahmanas, Hindu Law and Custom, Hindu Ideal of Life—1947** প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর পাণ্ডিত্যের নিদর্শন।

বটকৃষ্ণ ঘোষ

বর্ধমান জেলার মাজিদা গ্রাম নিবাসী রাজনারায়ণ মৈত্রের পুত্র বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র এলাহাবাদ একাউন্‌টেন্ট্ জেনারেলের অফিসে চাকরি করার সময়ে ওকালতি পাশ করে (১৮৭৪) এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করেন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর রচিত অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ অপচয় ও উন্নতি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র

সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯২—১১।৫।১৯৫৯) কাটোয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র। তিনি ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ডাকবিভাগে চাকরি করে অবসর গ্রহণ করেন। দীপালি নামে সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা (১৯২৯) ও মহিলা নামে মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী, কিশোর সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৪০টি গ্রন্থের রচয়িতা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, সাহিত্যকথা, সাহিত্যিকা, মীরাবাঈ, অবশেষে, চ্যারিটি শো, বহ্নি-বলয়, সুন্দরী, দিবাস্বপ্ন, শাপমুক্তি, শেষদান, মন্দিরা প্রভৃতি বসন্তকুমারের রচনাবলী।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ্

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুরপুনি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রমথনাথ (১০৯৩—১২।৪।১৯৭৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স ও এম্. এ. পরীক্ষায় এবং আইন পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। অখণ্ড বাঙ্গালায় ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় রাজস্ব খাদ্য ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। আইন কলেজের তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ও কানাডার ম্যাকডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত হন। ইংরাজী ভাষায় আইন সম্পর্কিত গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমথনাথ মিত্রের (১২৫৬—২৫।৮।১৩২৩ বঙ্গাব্দ) জন্মস্থান বর্ধমান জেলার শ্রীকৃষ্ণপুর। পিতার নাম কানাইলাল মিত্র। বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়ায় চন্দননগরে মাতুলালয়ে তিনি প্রতিপালিত হন। নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফরাসী ও হিন্দীভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তিনি লিখতেন। মহম্মদ মহসীনের জীবনী তিনিই রচনা করেছিলেন। বিশ্বকোষ রচনায় তিনি ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসুর সহায়ক। চন্দননগর পুস্তকালয় (১৮৭২) স্থাপন করে তিনি আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন।

প্রমথনাথ মিত্র

কালনা নিবাসী কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনের পুত্র বলাই চন্দ্র সেন (১৩০৩—১৩৫১) সফল ব্যবসায়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পিতার ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিলেন। নিজেও তিনি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিস্ নামে হ্যারিকেন তৈরীর কারখানা এবং পিওর ড্রাগ এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল নামে ওষুধের কারখানা স্থাপন করেছিলেন। কালনায় অম্বিকা হাইস্কুল, কলেজ ও মিউনিসিপ্যাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় প্রভূত অর্থ দান করেছিলেন।

বলাই চন্দ্র সেন

সিদ্ধসাধক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার বণ্ডুল গ্রামে। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। অল্প বয়সে এক সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে বিন্ধ্যপর্বতের গুহায় সাধন-ভজন করেন। ভৃগুরাম পরমহংসদেবের কাছে যোগতন্ত্রাদি সাধনায় ইনি

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

দীক্ষালাভ করেন। শিক্ষা সমাপনের পরে ইনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর শিষ্যদের অন্যতম। তাঁর শিষ্যগণ তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য বারাণসীতে অখণ্ড মহাযোগ সঙ্ঘ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ (১২৭৯-১৩৬১ বঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সারদাচরণ ভট্টাচার্য। মাত্র বারো বৎসর বয়সে মুগ্ধবোধের আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার পরে, কাব্যের আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ২৪ পরগণার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ন্যায় শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার ও স্বর্ণকেয়ুর লাভ করেন। শ্রীভারত ধর্মমহামণ্ডলের পক্ষে মিথিলায় মহারাজ কামাখ্যাপ্রসাদ সিংহের কাছ থেকে তর্কনিধি উপাধি লাভ করেন। প্রথমে তিনি বৈদ্যপুর গ্রামে জ্ঞানতরঙ্গিণী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে (১৩১০) দশ বৎসর অধ্যাপনা করেন এবং ১৩২১ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বর্ধমান বিজয় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর রচিত লকারার্থ নির্ণয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে (১৯২১)।

বীরেশ্বর তর্কতীর্থ

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯।১১।১৮৭৭-৫।৯।১৯৩০) জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চান্নাগ্রামে। পিতার নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. পর্যন্ত পড়ার পর এলাহাবাদে প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হিন্দী শিক্ষা করেন। বরোদারাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি অরবিন্দ ঘোষের সাহায্যে যতীন্দর উপাধ্যায় নামে বরোদার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে (১৮৯৭) ঘোড়সওয়ার সৈন্য থেকে মহারাজের দেহরক্ষী পদে উন্নীত হন। অরবিন্দের প্রেরণায় বৈপ্লবিক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙ্গালাদেশে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং কলিকাতায় সার্কুলার রোডে বাড়ীভাড়া নিয়ে সস্ত্রীক বসবাস করেন। এখানেই বিপ্লবীদের ঘাঁটি তৈরী হয়। এই দলের শাখা বঙ্গদেশ বিহার উড়িষ্যায় প্রসারিত হয়। ১৯০৬ সালে যতীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবে বিপ্লবীদল গঠন করেন। এই সময়ে তিনি সোহহংস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করে নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন। তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও সন্ন্যাস গ্রহণ করে চিন্ময়ী দেবী নামে পরিচিতা

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা নিরালম্ব স্বামী

হন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর (১৯০৭) তিনি সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক হন। কিন্তু পরিচালকদের সঙ্গে মতান্তরের ফলে পদত্যাগ করে মাতার আহবানে স্ব-গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে শ্মশানের ধারে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বাস করতে থাকেন। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুর বোমার মামলায় ধৃত হয়েও প্রমাণাভাবে মুক্তিপান। বাঘা যতীন বৈপ্লবিক কর্মে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বরাহনগরে এক সহকর্মীর গৃহে তাঁর মৃত্যু হয়।

বর্ধমান জেলার বড় ধামাস গ্রামনিবাসী শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (১৫।৩।১৮২৪-১৯০৯) বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়ায় দারিদ্র্যের মধ্যেও লেখাপড়া করেন এবং হিন্দু কলেজ থেকে জুনিয়ার পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ২০ টাকা ও সিনিয়র পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করে ৪১ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন তাঁর সহপাঠী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল। রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে তিনি কানপুরে এ্যাসিস্ট্যান্ট্ ইঞ্জিনিয়ার পদ লাভ করেন। সরকারী কাজ ত্যাগ করে ১৮৬৮ সালে তিনি হায়দারাবাদে নিজামের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপ্যাল ও পরে প্রিন্সিপ্যাল হন। ১৮৯২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ হায়দারাবাদে তাঁর গৃহে অবস্থান করেছিলেন। ৩০ বৎসর নিজাম সরকারে কাজ করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমানে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কংগ্রেসসেবী যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (১৮৮৫-১৯৬৯) মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে আইন ব্যবসা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি কুড়ি বৎসর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হন। অবিভক্ত বাঙ্গালাদেশের তিনি ছিলেন আইন পরিষদের সদস্য এবং স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সদস্য।

যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

বর্ধমান জেলার চাণকগ্রাম নিবাসী নবদ্বীপচন্দ্র মিত্রের পুত্র খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ মধুর কণ্ঠে স্বরচিত কীর্তন গায়ক রসময় মিত্র (১৮৫৯-১০।৪।১৯৩১) শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় আত্মীয়দের সাহায্যে লেখাপড়ার সুযোগ পান। সিউড়ির সরকারী বিদ্যালয় থেকে বর্ধমান বিভাগে প্রথম হয়ে মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করে এন্ট্রান্স্ পাশ করেন। তিনি হুগলী কলেজ থেকে ২০ টাকা

বৃত্তি সহ এফ্. এ. এবং ২৫ টাকা দুর্গাচরণ বৃত্তি সহ বি. এ. এবং ইংরাজীতে এম্.এ. পাশ করার পরে মেদিনীপুরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন, পরে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে পাঁচ বৎসর প্রধান শিক্ষক হিসাবে স্কুলের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে ১৬ বৎসর কাজ করে হিন্দু-স্কুলকে নবজীবন দান করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইংরাজ সরকার তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তাঁকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচয় তিনি কৃপাদৃষ্টি, রসকণিকা প্রভৃতি পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন।

রসময় মিত্র রায়বাহাদুর

বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া নিবাসী রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি। ইনি গ্রাম্য পাঠশালা, মিশনারী স্কুল ও হুগলী মহসীন কলেজে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করেন। ইংরাজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্যে তিনি সংবাদ প্রভাকরে লিখে সাহিত্য-সাধনা সুরু করেন। তিনি এডুকেশন গেজেট (১৮৫৫-) পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছয় মাস অধ্যাপনার পর আয়কর এসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর হন, পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে সুনামের সঙ্গে চাকরি করে ১৮৮২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্বদেশ প্রেমমূলক কাব্য স্বদেশী আন্দোলনে প্রেরণা স্বরূপ হয়েছিল। পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্মদেবী, সুরসুন্দরী, কাঞ্চীকাবেরী, কুমার সম্ভব কাব্যের পদ্যানুবাদ, বিরহ বিলাপ (কবি রামশর্মার Widow Drops কবিতায় অনুবাদ) রচনা করে তিনি বাঙ্গালা কবিতায় আধুনিক যুগের সূচনা করেছিলেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত কীর্তনীয়া রসিকলাল দাস (১২৪৮-১০।১২।১৩২০ বঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার দক্ষিণ খণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অনুরাগী দাসও ছিলেন একজন বিখ্যাত কীর্তনীয়া। অভিনব সুরতাল প্রবর্তন করে তিনি মনোহরশাহী কীর্তনকে মাধুর্য মণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিলেন।

শাকনাড়া নিবাসী রায়বাহাদুর রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৯-১৯১৪) ১৪ বৎসর বয়সে কলিকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা

করেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য তিনি পাঁচ বৎসরের জন্য সিনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেই বৎসরই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে দেড় বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি প্রথমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেকটর অফ্‌ স্কুলস্‌ হিসাবে কাজ করেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থানে কাজ করেন। উড়িষ্যায় (১৮৬৬-৬৭) ও বিহারে (১৮৭৪) দুর্ভিক্ষের সময়ে ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। স্বগ্রামে দীঘি খনন, স্কুল স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য করেছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় আত্মচিন্তন, আচারচিন্তন, পুলিশ ও লোকরক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান জেলার গৌরব স্মরণীয় পুরুষ তোরকোণা গ্রাম নিবাসী জগবন্ধু ঘোষের পুত্র স্যর রাসবিহারী ঘোষ (২৩।১২।১৮৪৫—২৮।২।১৯২১) বাঁকুড়া হাই স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৬৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ভারতীয় ছাত্র হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে এম্‌. এ. (১৮৬৬) এবং স্বর্ণপদক সহ আইন পাশ করে (১৮৬৭) কিছুকাল বহরমপুরে অধ্যাপনা করার পর হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই আইন ব্যবসায়ী হিসাবে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। স্যর আশুতোষ এবং ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। পরে রাসবিহারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর ল প্রফেসর নিযুক্ত হন (১৮৭৫)। ১৮৮৪ সালে তিনি ডক্টর অফ্‌ ল উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর সি. আই. ই (১৮৯৬), সি. এস্‌. আই (১৯০৯) এর স্যর্‌ (১৯১৫) উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। তিনি যাদবপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু সভাপতি ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষার জন্য বারো লক্ষ টাকা এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বহু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন, জনহিতকর কার্যেও প্রচুর দান করেছেন।

স্যর্‌ রাসবিহারী ঘোষ

বর্ধমান জেলার আর এক স্মরণীয় ব্যক্তি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু (২।৫।১৮৮৫—x।১।১৯৪৫) সুবলদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা বিনোদবিহারী

বসু চন্দননগরে বাস করতেন। মর্টন স্কুল ও ডুপ্লে কলেজে পড়ার পর চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘ ও মুরারিপুকুর বাগানে বারীন ঘোষ সংগঠিত গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার আশংকায় তিনি দেরাদুনে ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে হেডক্লার্কের চাকরি গ্রহণ করেন। এখান থেকেই তিনি দেশ-বিদেশে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি নানাস্থানে বিপ্লববাদ প্রচার করেন এবং বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হওয়ায় তিনি পি. আর্. ঠাকুর ছদ্মনাম দিয়ে জাপানে উপনীত হন। এখান থেকেই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ১৯৪১ সালে জাপান মিত্রপক্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়দের সংগঠিত করে আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ বা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্‌ডেন্‌স লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানে উপস্থিত হলে রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের হাতে এই দলের ভার অর্পণ করেন।

রাসবিহারী বসু

অসামান্যা বিদুষী বর্ধমানের কলাইমুটি নিবাসী নারায়ণ দাস ও সুধামুখীর কন্যা রূপমঞ্জরী কোটাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে পিতার কাছে পরে নিকটবর্তী অপর এক পণ্ডিতের কাছে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও আয়ুর্বেদে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সপ্তগ্রামে গোকুলানন্দ তর্কালংকারের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আজীবন অবিবাহিতা থেকে রূপমঞ্জরী প্রায় শতবর্ষ (১১৮১-৮২—১৫।৯।১২৮২ বঙ্গাব্দ) জীবিত ছিলেন এবং শাস্ত্রচর্চায় অতিবাহিত করেছেন।

রূপমঞ্জরী

বর্ধমানের অন্যতম সুসন্তান রেভারেণ্ড লালবিহারী দে (১৮।১২।১৮২৪—২৮।১০।১৮৯৪) জন্ম সোনাপলাশী গ্রামে সুবর্ণ বণিক পরিবারে। কলিকাতা জেনারেল এসেম্ব্লিজের ছাত্র হিসাবে লালবিহারী ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ ২রা জুলাই রেভাঃ ডাফ কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে ধর্মযাজকের কাজে ব্রতী হন। ১৮৫৫ সালে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে ফ্রী চার্চের রেভারেণ্ড হন। ১৮৬৭ সালে তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন

রেভাঃ লালবিহারী দে

এবং ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত তিনি হুগলী কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এই সময়ে তিনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় শিক্ষা বিষয়ক বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। **Bengal Peasant Life** এবং **Folk Tales of Bengal** লালবিহারীর বিখ্যাত গ্রন্থ।

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯—১৯৭২) গঙ্গাটিকুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত রসসাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র।

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বি. এল্. পাশ করে তিনি কিছুকাল হাইকোর্টে ওকালতি করেন। পরে পল্লীবাঙ্গালার ওকালতি ছেড়ে স্বগ্রামে বসবাস করেন। সমাজসেবা তাঁর জীবনের ব্রত হয়েছিল। স্বগ্রামে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৬১ সালে গঙ্গাটিকুরি গ্রামে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙ্গালার সাহিত্যতীর্থ চুপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্যামাদাস বাচস্পতি (১৮৬৪—৩।৭।১৯৩৪)। তাঁর পিতার নাম অন্নদাপ্রসাদ। নবদ্বীপে

শ্যামাদাস বাচস্পতি

ন্যায়শাস্ত্র ও কাশীতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের অন্তে তিনি কলকাতায় টোল খুলে অধ্যাপনা এবং কবিরাজী চিকিৎসা করতে থাকেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে টোল তুলে দিয়ে তিনি বৈদ্য শাস্ত্র পীঠ প্রতিষ্ঠা করে দু' লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। চা পানের দোষ, ব্রহ্মার কথা, শিবের কথা, ইন্দ্রের কথা প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি প্রণেতা।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ব্যঙ্গ লেখক সাংবাদিক সজনীকান্ত দাসের (২৫।৮।১৯০০ —১৯৬২) জন্ম বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামে। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এস্. সি. পড়ার সময়ে তিনি শনিবারের চিঠি পত্রিকায় ভাবকুমার প্রধান

সজনীকান্ত দাস

ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। পরে তিনি শনিবারের চিঠির সম্পাদক ও পরিচালক হয়েছিলেন। বঙ্গশ্রী এবং দৈনিক বসুমতী পত্রিকাদ্বয়েরও তিনি সম্পাদক হয়েছিলেন, প্রবাসী পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। বহু সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি বা সহ-সভাপতি ছিলেন। মনোদর্পণ, পথ চলতে ঘাসের ফুল, পঁচিশে বৈশাখ, কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল, উইলিয়াম কেরী, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

ধাত্রিগ্রাম নিবাসী রামদাস চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থল পাটনায় জন্ম গ্রহণ করেন তাঁর বিখ্যাত বেদবিদ্যায় পারদর্শী বেদ প্রচারক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী (২৮।৫।১৮৪৬—১।৬।১৯১১)। মাত্র আট বৎসর বয়সে কাশীর সরস্বতী মঠে গৌড় স্বামীর নিকটে বেদ অধ্যয়ন সুরু করে ১৮৬৬ সালে বিদ্যাচর্চা শেষ করে কাশ্মীর সহ উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। এই সময়ে দেশের নানা স্থানের পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তিনি প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন এবং বুন্দী রাজের দ্বারা সামশ্রমী উপাধিতে ভূষিত হন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্রীকে তিনি বিবাহ করেন। কাশী থেকে 'প্রত্নকম্রসন্দিনী' নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি সাময়িক পত্রিকা বেদবিদ্যা প্রচারের জন্য আট বৎসর যাবৎ প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার জন্য সামবেদ সম্পাদনা করেছিলেন। উষা নামে একটি পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছিলেন (১৮৮৯—১৯০৫)। বঙ্গাক্ষরে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেছিলেন।

সত্যব্রত সামশ্রমী

বর্ধমান জেলার কাইগ্রামে নবীনচন্দ্র তর্কালংকার প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। স্ব-গ্রামে ছিল তাঁর চতুষ্পাঠী। এই চতুষ্পাঠীতেই প্রথমে অধ্যয়ন করেছিলেন তাঁরই যোগ্যতম পুত্র মহামহোপাধ্যায় সীতারাম ন্যায়াচার্য শিরোমণি (১৮৬৪—৫।৬।১৯২৮)। সীতারাম নবদ্বীপে ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তর্করত্ন উপাধি লাভ করেছিলেন। নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভা থেকে তিনি ন্যায়াচার্য শিরোমণি উপাধিতে সম্মানিত হন (১৮৯৬)। কাশীতে তিনি স্বামী বলরাম ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদান্তে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মুর্শিদাবাদ মঠ নামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সীতারাম ১৪ বৎসর অধ্যাপনান্তে নবদ্বীপে দেয়ারা পাড়ায় আরণ্য চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ সালে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি হরিবাসর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বর্ধমান রাজের বিদ্বৎশোভিনী সভার সভ্য, বঙ্গীয় সরকারের সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহী সভার সদস্য, বঙ্গীয় বেদ সভার সভাপতি, কোচবিহার রাজের

মহামহোপাধ্যায়
সীতারাম ন্যায়াচার্য
শিরোমণি

মাঙ্গলিক কর্মের উপদেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন সম্মানজনক পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অসাধারণ দানশীলা কাশিম বাজারের মহারানী স্বর্ণময়ীর (১৮২৭—১৮৯৭) জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ভট্টকোল গ্রামে। মাত্র এগারো বৎসর বয়সে কাশিম বাজারের রাজকুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর সঙ্গে বিবাহ হলেও মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহারানীর সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করলে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করে তিনি সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পেয়েছিলেন। বিভিন্ন জনহিতকার্যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে তিনি অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারানী ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সি. আই. উপাধি লাভ করেন।

মহারানী স্বর্ণময়ী

বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি হটী বিদ্যালংকার নামে প্রসিদ্ধ। বাল্য বিধবা এই বিদুষী মহিলা বাল্যকালে পিতার নিকটে সংস্কৃত ব্যাকরণে ও অন্যান্য বিষয় অধ্যয়ন করে বিধবা হওয়ার পর কাশী গিয়ে সেখানে ব্যাকরণ স্মৃতিশাস্ত্র ও নব্যন্যায়ে পারদর্শিতা লাভ করে বিদ্যালংকার উপাধিতে ভূষিতা হন এবং কাশীতেই চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। পণ্ডিত সভার তর্কাদিতেও তিনি যোগ দিতেন।

হটী বিদ্যালংকার

বর্ধমান জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান

বর্ধমান জেলার প্রধান শহর বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ শহর। শহরটি দামোদরের শাখা বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত—দামোদর পর্যন্ত প্রসারিত। এই নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গম রায়। আইন-ই-আকবরীর মতে সরকার সরিফাবাদের অন্তর্গত বর্ধমান মহালের সদর কার্যালয় ছিল বর্ধমান শহর। একটি বিশাল কৃষি অঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বর্ধমানের গুরুত্ব ছিল। গ্রাণ্ডট্রাংকরোড ও রেলপথের বিস্তার বর্ধমানের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে নূতন গঞ্জ স্থাপন করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পরে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বর্ধমান শহরে কালেক্টরের অফিস স্থাপন করে।

বর্ধমান শহরের উল্লেখযোগ্য স্থান রাজ প্রাসাদ, গোলাপ বাগ ও দিলখুসা। রাজবাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এগুলি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। রাজবাড়ীর উত্তর পূর্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদের পুরাতন জেলখানা ছিল। রাজবাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিমে রাজ কলেজ, রাজ কলেজের পূর্বে পুরাতন চক। পুরাতন চকের উত্তরে ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুখানের প্রতিষ্ঠিত জুম্মা মসজিদ আছে। পুরাতন চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের্ আফ্গান ও কুতুবিদ্দিনের সমাধি আছে। মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ে পারস্থ দেশীয় পীর বহরাম তীর্থযাত্রা পথে বর্ধমানে উপনীত হয়ে জয়পাল নামক এক হিন্দু যোগীর আশ্রয় লাভ করেন, এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। সম্রাট আকবর তাঁর সমাধি গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফ্গান এবং তাঁর হত্যাকারী বঙ্গদেশের সুবেদার কুতুবুদ্দিন কোকার সমাধিও এই সমাধিক্ষেত্রে অবস্থিত। রাজবাড়ীর সংলগ্ন পায়রাখানা গলিতে কাবুল থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত পীর থক্কর সাহেবের সমাধিস্থল অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর ১৭ই ফাল্গুন উরস উৎসব পালিত হয়।

বর্ধমানের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি বৃহৎ পুষ্করিণী বা দীঘি—মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের জননী ব্রজসুন্দরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রানী সায়র, ঘনশ্যাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্যাম সায়র ও কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ সায়র রাজবাড়ীর পূর্বে শ্যামবাজারে প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গলেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসগৃহ, শ্যামবাজারের পূর্বে বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার মন্দির। রাজবাড়ীর পূর্বে বড়বাজার ও তারও পূর্বে রাণীগঞ্জ বাজার। রাণীগঞ্জ বাজারে বিজয়চাঁদ রোডের উপরে থানার বিপরীত দিকে উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার। এই রাস্তার পূর্বপ্রান্তে গ্রাণ্ডট্র্যাংক রোডের ধারে মহারাজ বিজয়চাঁদের আমন্ত্রণে লর্ড-কার্জনের বর্ধমানে আগমন উপলক্ষ্যে নির্মিত সুদৃশ্য তোরন কার্জন গেট্ বর্তমানে বিজয় তোরণ নামে প্রসিদ্ধ। বিজয় তোরণের সম্মুখে বিশাল প্রান্তরে জেলা পরিষদ, জজকোর্ট ও অন্যান্য সরকারী কার্যালয়। বিজয়চাঁদ রোডের পশ্চিম প্রান্তে সোনাপটির পরে লক্ষ্মীনারায়ণ জীর মন্দির দর্শনীয়। বর্ধমান তালিত রোডের উপরে নবাবহাটে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী বিষ্ণুকুমারী প্রতিষ্ঠিত আটচালা রীতির একশ' আট শিবমন্দির আছে।

গ্রাণ্ডট্র্যাংক রোডের দক্ষিণে গোলাপ বাগ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার-ভুক্ত। গোলাপ বাগের পূর্বে রমনার বাগানে বিজয়ানন্দ বিহারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করতেন। এখানেই মেঘনাদসাহা তারামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। গোলাপবাগের দক্ষিণে তারাবাগেরও দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্রভবন। এছাড়া শ্যামসায়রের তীরে বিজয়চাঁদ হাসপাতাল, রাজকলেজ, হরিসভা, রামকৃষ্ণ আশ্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মহান্ত অস্থল, বোরহাটে কমলাকান্তের কালী-বাড়ী, কালনা রোডে অরবিন্দ স্টেডিয়াম, সদর ঘাটে বিবেকানন্দ কলেজও দর্শনীয় বস্তু।

বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে বরাকর নদের ধারে অবস্থিত বরাকর একটি শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র, বরাকর নদীর বামতীরে অবস্থিত। বরাকরে কয়েকটি মন্দির অবস্থিত। বরাকর স্টেশন থেকে দেড় কি. মি. দূরে বেগুনিয়া বাজারের ডান দিকে চারটি শিখর রীতির প্রস্তর নির্মিত মন্দির আছে তন্মধ্যে সিদ্ধেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত চতুর্থ মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরটি অষ্টম নবম শতাব্দীতে নির্মিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। একটি মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্যা শিবের উদ্দেশ্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ এবং গণেশ ও দুর্গার বিগ্রহ আছে। বরাকর থেকে ৮ কি. মি. দূরে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির শক্তিপূজার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই স্থানটি মাইথন নামে পরিচিত। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির ছাড়াও আরও দুটি মন্দির আছে পূর্বমুখী। দেবী পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন। কিম্বদন্তী অনুসারে দেবী সন্ধ্যাদীপ জ্বালাবার উদ্দেশ্যে আগতা পূজারীর কন্যাকে ভ্রমবশে ভক্ষণ করেছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

বর্ধমানের নিকটবর্তী **কাঞ্চননগর** ছুরি-কাঁচির জন্য বিখ্যাত। এখানে কিছু পোড়ামাটির কাজসহ একটি জোড়া বাংলা রীতির একটি মন্দির আছে। মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন কংকালী দেবীর বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে কথিত গোবিন্দ দাস কর্মকারের জন্মস্থান ও বাসস্থান কাঞ্চননগর।

শিল্পনগরী **দুর্গাপুর** একটি মহকুমা শহর। গলসী, ফরিদপুর, অণ্ডাল ও

কাঁকসা—এই চারটি ব্লক নিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা। নূতন পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় শাল-অরণ্যে কাঁকর-মাটির উষর ভূমিতে গড়ে উঠেছে এই শিল্পনগরী। দামোদর ভ্যালিকর্পোরেশনের জলসেচনের উৎস দুর্গাপুর ব্যারেজ দর্শনীয় স্থান। কয়লার খনি নিকটবর্তী হওয়ায় দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠা সহজ হয়েছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, মিশ্র ইস্পাত কারখানা, দুর্গাপুর, কেমিক্যালস্ লিঃ, মাইনিং এণ্ড্ এলায়েড্ মেশিনারী কর্পোরেশন, দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার, দুর্গাপুর সিমেণ্ট্, দুর্গাপুর কোক ওভেন, দুর্গাপুর ডেয়ারী, ভারত অপ্থ্যালমিক গ্লাস প্রভৃতি বহু কলকারখানা এখানে অবস্থিত।

একমাত্র কাঁকসা ছাড়া সমস্ত দুর্গাপুরই শিল্পাঞ্চল। কাঁকসা ও অণ্ডালে অনেক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে। কাঁকসায় নিকটে ভরতপুরের স্তূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। কাঁকসায় কাঙ্কেশ্বর গড়। শিবমন্দির এবং রাজার মসজিদ দর্শনীয়। অমরার গড়ে সদ্গোপ বংশীয় রাজাদের একটি শাখার রাজধানী ছিল।

দিসেরগড়ঃ কয়লার খনি অঞ্চল, কুলটি থানার অন্তর্গত, দামোদর ও বরাকর নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাচীন নাম ছিল ডিহি শেরগড়। এখানে ভারতীয় খনি সমিতি (Indian Mining Association) এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

আসানসোলঃ মহকুমার সদর কার্যালয় আসানসোল শহর গ্রাণ্ড্ট্র্যাংক রোডের দুদিকে গড়ে উঠেছে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রানীগঞ্জ থেকে মহকুমা সদর আসানসোলে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়লা-খনি অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় আসানসোলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ এখানে মিশ্র জনবসতি গড়ে তুলেছে। বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান আসানসোলকে শিল্পনগরীতে পরিণত করেছে। এখানকার রেলওয়ে স্কুলটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। নুনিয়া নদীর তীরে এক বিশাল বটবৃক্ষের নিম্নে আছেন ঘাগরা চণ্ডী। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষ্যে বিপুল জনসমাগম হয়। রাখাল চক্রবর্তী নামে এক তান্ত্রিক সাধকের প্রতিষ্ঠিত কালীবিগ্রহ, কালী মন্দিরের পশ্চিমে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের, সাঁতা পল্লীতে ছিন্নমস্তার মন্দির, গোবিন্দদাস সাধু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

রেলপারের শিবমন্দির, পদ্মবাঁধের নিকটে গৌরাঙ্গ মন্দির, টি. টি. রোডের ধারে রাধাগোবিন্দ মন্দির, হরিবোল মন্দির, শ্মশানকালীর মন্দির, সত্যনারায়ণ মন্দির, কল্যাণেশ্বরী আশ্রম প্রভৃতি এখানকার দর্শনীয় বস্তু। নীলকণ্ঠেশ্বরের গাজন উৎসব, মাঘী পূর্ণিমায় ছিন্নমস্তার উৎসব, রাস, ঝুলন, দোল প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবীর উৎসব আসানসোলের জনজীবনে প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলে।

কাঁকসা থানার অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম আড়া। এখানে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরের দেবতা রাঢ়েশ্বর বা কালেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। কিম্বদন্তী অনুসারে সেনবংশীয় কোন নরপতি রাঢ়েশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা, মতান্তরে গোপভূমের সদ্গোপ রাজারা এই মন্দির ও শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা।

কলিকাতা থেকে রেলপথে ২২৫ কি. মি. ও রাজপথে ২৫৬ কি. মি. দূরে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযোগস্থলে অবস্থিত **চিত্তরঞ্জন**। মিহিজাম, সুন্দর-পাহাড়ী প্রভৃতি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিল্পনগরী চিত্তরঞ্জন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ্ ওয়ার্কস্ নামে ভারতের বৃহত্তম রেল-এঞ্জিন তৈরীর কারখানা অবস্থিত।

চিত্তরঞ্জন

কুলটিঃ বর্ধমান জেলার অন্যতম শিল্পনগরী। গ্রাণ্ডট্র্যাংক রোডের উত্তরে অবস্থিত। অধুনা ভারত সরকারের দ্বারা অধিগৃহীত ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কোম্পানী (Indian Iron and Steel Company)-র কারখানার জন্য কুলটি প্রসিদ্ধ।

গৌরাঙ্গপুরঃ কাঁকসা থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। অজয় নদের ধারে পানাগড়-ইলামবাজার রাস্তার ধারে সাতকাহানিয়া থেকে ৫ কি. মি. পশ্চিমে এই গ্রাম একটি মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ। রেখ রীতির এই দেউল ধর্মমঙ্গল কাব্যখ্যাত ইছাই ঘোষ এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত গোপভূমির সদ্গোপরাজ ইছাই ঘোষের সঙ্গে ঢেকরি বা ঢেকুরে গড়ের অধীশ্বর ছিলেন।

গৌরাংডিঃ অজয়ের তীরে বরাবনি থানার অন্তর্গত একটি শহর—কয়লা খনির কেন্দ্র। অণ্ডাল-গৌরাংডি শাখা রেলের দ্বারা এই স্থান সংযুক্ত।

পাণ্ডবেশ্বর রানীগঞ্জ থেকে ১৯ কি. মি. দূরে রাণীগঞ্জ-সিউড়ি পথের ধারে

পূর্বরেলের অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত প্রাচীন গ্রাম পাণ্ডবেশ্বর কয়লা শিল্পের কেন্দ্র। এখানে কয়েকটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মহাভারতের পাণ্ডবগণ মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা।

দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত **রাণীগঞ্জ** একটি সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল। এখানে উৎকৃষ্ট মানের কয়লা উত্তোলিত হওয়ায় এই স্থানের গুরুত্ব বর্ধিত হয়। আসানসোলে মহকুমা স্থানান্তরিত হওয়ায় (১৯০৬ খ্রীঃ) পূর্ব পর্যন্ত রাণীগঞ্জ বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহর ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে রাণীগঞ্জ পূর্বভারতীয় রেলপথের শেষ স্টেশন ছিল। তখন সৈন্যদের এখানে অবতরণ করতে হোত বলে অস্থায়ী সৈন্যাবাসও নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে গোরাবাজার অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। বিভিন্ন অঞ্চলে লোকের বসতি এবং অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য এই শিল্পনগরের বৈশিষ্ট্য।

রূপনারায়ণপুর ঃ সালামপুর থানার অন্তর্গত ইষ্টার্ন রেলওয়ের মেন লাইনের শেষ স্টেশন। উৎকৃষ্ট জলবায়ুর জন্য এক সময়ে এই স্থান স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পরে বিহার পটারি ও বেঙ্গল পটারি স্থাপিত হওয়ায় রূপনারায়ণপুর শিল্পনগরে পরিণত হয়। হিন্দুস্থান কেবল্ ফ্যাক্টরি স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানের গুরুত্ব বর্ধিত হয়েছে।

আসানসোলের ৩ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি শিল্পকেন্দ্রিক শহর। এখানে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং এবং ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্কস্ এর কারখানা আছে। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ বসবাস করায় বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন—শিবমন্দির, মহাবীর মন্দির, বিশ্বকর্মা মন্দির, রামসীতার মন্দির প্রভৃতি।

প্রতাপপুর ঃ দুর্গাপুরের ৬ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে এবং জয়দেব-কেন্দুবিল্ব থেকে ১০ কি. মি. দক্ষিণপূর্বে প্রতাপপুর অবস্থিত। প্রতাপপুরের ২ কি. মি. দক্ষিণে পাড়ুল গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীন গৃহের (অনেকের মতে রাজবাড়ীর) ধ্বংসাবশেষ থেকে বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলীতারা ও মিথুন মূর্তি আবিষ্কৃত হয়।

পানাগড় ঃ বর্ধমানের পশ্চিমে একটি গ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এখানে একটি বিমানক্ষেত্র ও প্রতিরক্ষা শিবির স্থাপিত হয়েছিল।

গুসকরা ঃ পূর্ব রেলের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে একটি স্টেশন ও নিকটবর্তী শহর। শহরের উত্তরে কুনুর ও ঘুসকরা নদী প্রবাহিত। চট্টগ্রাম থেকে আগত

চোঙ্‌দার পরিবার বর্ধমানের মহারাজের কাছ থেকে এই গ্রামের পত্তন পত্তনি নিয়েছিলেন। চোঙ্‌দার পরিবারের বাস্তুদেবী ছিলেন রমনা। কুনুর নদীর তীরে সোমেশ্বর শিবের নবরত্ন মন্দির আছে। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এখানে নীলকুঠি ছিল। ধান, আলু, আখ প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য এখানে প্রচুর উৎপন্ন হওয়ায় গুসকরা বাণিজ্যকেন্দ্র ও শহরে পরিণত হয়েছে।

গলসি ঃ বর্ধমানের পশ্চিমে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপরে পূর্ব রেলের মেন লাইনের স্টেশন ও গলসি থানার সদর একটি ব্যবসায় কেন্দ্র গ্রামের মধ্যে আটচালা মন্দিরে গর্গেশ্বর শিবলিঙ্গ, দালান মন্দিরে ধর্মরাজ ও অষ্টভুজা দুর্গা অধিষ্ঠিতা আছেন। শ্রাবণ মাসের কোন শনি বা মঙ্গলবারে ধর্মরাজ ও গর্গেশ্বরের গাজন হয় এবং মেলা বসে। এ ছাড়া কয়েকটি শিখর দেউল ও আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান।

বুদবুদ ঃ গ্রাণ্ডট্র্যাংক রোডের উপরে বুদবুদ থানার সদর কার্যালয় এবং ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। ধর্মরাজ এই গ্রামের অধিষ্ঠিত জনপ্রিয় দেবতা।

চম্পাই নগরী ঃ বা চম্পক নগরী মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সওদাগরের কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিম্বদন্তী অনুসারে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দুটি চাঁদ সওদাগরের প্রতিষ্ঠিত। বুদবুদের দক্ষিণে দামোদরের উত্তর তীরে চম্পাই নগরী অবস্থিত।

দরিয়াপুর ঃ গুসকরার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এই গ্রাম ডোকরা, কামার ও মাল উপজাতীয়দের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এখানকার ডোগরা শিল্প পিতল কাঁসা গালানো শিল্পদ্রব্য বিখ্যাত।

জামুরিয়া ঃ আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত কয়লা শিল্পকেন্দ্রিক শহর—জামুরিয়া থানার প্রধান কার্যালয় এবং বাণিজ্যকেন্দ্র। দুটি ব্লকে বিভক্ত জামুরিয়া কয়লাখনি অঞ্চল। আদিবাসী সাঁওতাল এখানকার অধিবাসী। বর্তমানে ভারতের নানা স্থান থেকে আগত শ্রমিক ও কর্মচারী মিলে মিশ্র সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে।

চুরুলিয়া ঃ জামুরিয়া থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম আসানসোল থেকে ১৪ কি. মি. উত্তর পশ্চিমে অজয় নদের তীরে অবস্থিত। পূর্ব রেলের অণ্ডাল সাঁইথিয়া লাইনের স্টেশন চুরুলিয়া—বর্ধমান থেকে নিয়মিত বাস যোগাযোগে সহজগম্য। এখানকার শিল্পীদের গড়া ভাস্কর্য বিখ্যাত—পাথরের মূর্তি ও

গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এখানে রাজা নরোত্তমের গড় নামে প্রস্তর নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐতিহাসিক ওল্ড্হ্যামের মতে পঞ্চকোটের সামন্তরাজা নরোত্তম ও তাঁর বংশধরেরা এখানে রাজত্ব করতেন। আয়মাদার মুসলমানদের আক্রমণে এই গড় বিধ্বস্ত হয়। চুরুলিয়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান। নজরুল একাডেমির উদ্যোগে নজরুল পাঠাগার ও নজরুল সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া সমবায় সমিতি, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও নজরুল ইসলাম কলেজ এই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১১ই জ্যৈষ্ঠ থেকে নজরুল মেলা হয়—সাহিত্যের আসর ও সংস্কৃতির মেলা হয়।

ছোট রামচন্দ্রপুর ঃ গ্রামে দিদি ঠাকরুণ ও রাধাবল্লভজীর দুটি মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে দিদি ঠাকরুণের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে এখানে মেলা বসে। পূজার আট দিন পরে অষ্টমঙ্গলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পানাগড় রেল স্টেশন থেকে বাসযোগে এই গ্রামে পৌছানো যায়।

হীরাপুর ঃ আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত—হীরাপুর থানার সদর——আসানসোল থেকে বাসপথে সহজগম্য। দামোদর নদের তীরে অবস্থিত এই স্থান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ—শিল্প কারখানার অধিষ্ঠান। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য শ্রীনিবাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণিকচাঁদ ঠাকুর এখানে একটি মন্দিরে মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের সম্মুখে মাণিকচাঁদ ঠাকুরের সমাধি মন্দির আছে।

ছোট দিঘরি গ্রামে কারুকার্য খচিত প্রস্তর নির্মিত রঘুনাথজীর মন্দির দর্শনীয়। আসানসোল থেকে বাস পথে এই গ্রামে যাওয়া যায়। সীতারাম চোবে মহান্ত ও রাঘব চোবে মহান্ত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহান্ত পরিবারের কুলদেবতা রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা এই মন্দিরে অধিষ্ঠিত।

ধবণী প্রসিদ্ধ কৃষ্ণযাত্রাকার সাধক কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। দুর্গাপুর থেকে মালানদীঘিতে নেমে পদব্রজে ধবণী যেতে হয়। নীলকণ্ঠের তিরোধান উপলক্ষ্যে ঝুলন পূর্ণিমার দিন নীলকণ্ঠ স্মরণে তাঁর স্মৃতিমন্দিরের পাশে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

উখরা অণ্ডালের নিকটবর্তী একটি সমৃদ্ধ গ্রাম—বর্তমানে শহরের আকৃতি-বিশিষ্ট। বর্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগান এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ

করেছিলেন। বর্তমানে উখরা খনি অঞ্চলে অবস্থিত এক শিল্প নগরী। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চৈতন্য চরিতামৃতের সংস্কৃতে অনুবাদক স্বামী ভাস্করানন্দের জন্মস্থান উখড়া। এখানকার অমৃতি নামে মিষ্টান্ন বিখ্যাত।

অমরার গড় আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত পূর্ব রেলের মেন লাইনে মানকর স্টেশনের কাছে একটি প্রাচীন গ্রাম। ভাল্কী, অমরার গড়, কাঁকসা, দিগ্‌নগর, ঢেক্করী বা ঢেকুর (গৌরাঙ্গপুরা), মঙ্গলকোট, নীলপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সদ্‌গোপ রাজবংশের রাজত্ব প্রসারিত ছিল। অমরার গড় ছিল গোপভূমের রাজধানী। কিম্বদন্তী অনুসারে সদ্‌গোপরাজ মহেন্দ্রনাথ রাজধানীতে একটি দুর্গ নির্মাণ করে পত্নী অমরাবতীর নামে নামকরণ করেছিলেন। অমরার গড়ে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও প্রচুর আছে। পুরাতন দেবালয়ও আছে অনেক। একটি শিখর দেউলে গ্রামের প্রধান দেবতা বুদ্ধেশ্বর শিব। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছেন, পাশেই আছে শিবাখ্যা দেবীর দালান মন্দির। গ্রামের মধ্যস্থলে সদ্‌গোপ পরিবারের তেরটি শিব মন্দির আছে, এদের মধ্যে ছয়টি আটচালা মন্দির ও দুটি শিখর রীতির মন্দির। পঞ্চরত্ন বিষ্ণুমন্দির অপূর্ব কারুকার্য খচিত, বাংলা ঘরের আদলে তৈরী দুর্গামন্দিরটিও অপূর্ব সুন্দর।

মানকর ঃ পূর্ব রেলের মেন লাইনের একটি স্টেশন—বুদ্‌বুদ্‌ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। এক সময়ে মানকর গোপভূম পরগণার অন্তর্গত ছিল। মানকরের সিল্কের চেলী এবং তসর ছিল বিখ্যাত। মানকরের তন্তুবায়েরা একদিকে সিল্কের নকসা ও অপর দিকে সুতোর নক্সা করা কুতনি নামে শাড়ী নির্মাণ করে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। এখানকার কর্মকাররা গহনার ডাইস তৈরী করতেন। মুগার সুতা মানকরেই তৈরী হোত। তাম্বুলীরা ধান চালের আড়তদারী করে লক্ষপতি হয়েছিলেন। এখানকার গোপীনাথ দত্তের তামাক বিখ্যাত ছিল। বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির জন্মস্থান কোটা-মানকর। কবি ও পণ্ডিত রঘুনন্দন গোস্বামীর জন্মস্থান ও নিবাস মানকরের নিকটবর্তী মাড়ো গ্রাম। মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চূড়ামণি, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম, কৈলাশনাথ ভট্টাচার্য, দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিংহের গুরু উত্তম ভট্টাচার্য, বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র ও চিত্রসেনের দীক্ষাগুরু ভক্ত লাল গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ছিলেন মানকরের অধিবাসী।

ভক্তলালের উত্তর পুরুষ রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত প্রথম জমিদার—যিনি স্বদেশী আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন।

শৈব-তান্ত্রিক ধর্মের কেন্দ্র ছিল মানকর। পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসাবে মাণিকেশ্বর শিব, মল্লিকেশ্বর ও বুড়োশিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। মাণিকেশ্বর মানকরের গ্রাম দেবতা। অমরার গড় থেকে মানকরে প্রবেশের পথে বৈদ্য কবিরাজদের কুলদেবী আনন্দময়ীর মন্দির। আনন্দময়ী কালীর পাষাণ-প্রতিমা শ্বেতপদ্মের উপরে স্থাপিত। এই মন্দিরের কাছে হংসেশ্বর শিবের মন্দির। পঞ্চকালী ও বড়কালী এখানকার বিখ্যাত দেবতা। রামানন্দ গোস্বামী বড় কালী প্রতিষ্ঠা করে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভক্ত লাল গোস্বামী রাধাবল্লভজীর নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গুরু উত্তম ভট্টাচার্যের নামে উত্তম সায়র এবং তাঁর পত্নীর নামে ঠাকরুণ সায়র নামে দুটি পুষ্করিণী মানকরে অদ্যাপি বিদ্যমান। বড় বড় কদমার জন্য মানকরের প্রসিদ্ধি আছে।

খণ্ডঘোষ ঃ বাঁকুড়া জেলার প্রান্তে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে খণ্ডঘোষ থানার সদর—একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্ধমান শহর থেকে সরাসরি বাস যোগাযোগ আছে। মোঘল আমলে বত্রিশটি পাড়া নিয়ে খণ্ডঘোষ পরগণার সদর কার্যালয় ছিল। বর্ধমান বাঁকুড়া রাস্তার উপরে অবস্থিত হওয়ায় খণ্ডঘোষ বাণিজ্যকেন্দ্রও। খণ্ডঘোষ আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ স্যর রাসবিহারী ঘোষের পৈত্রিক বাসভূমি। রাসবিহারী ঘোষের পরিবারের প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালের পঞ্চম দোল ও রাস উপলক্ষ্যে এখানে বিশেষ উৎসব হয়। কমললোচন নামক ধর্ম ঠাকুরের নবম দোল, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োশিবের গাজন, রাধা বল্লভজীর রাস, ঝুলন, দোল প্রভৃতি উৎসবে আনন্দমুখর থাকে এই গ্রাম।

খান্দরা বা খাঁদরা ঃ অণ্ডাল থেকে বাসে বা উখরা স্টেশন থেকে যাওয়া যায়। এই গ্রামে মহিষমর্দিনী দেবী বুড়ী মা নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে প্রস্তর নির্মিত রাধামাধবের পঞ্চরত্ন মন্দির, গৌরাঙ্গ মন্দির, নীলকণ্ঠ শিবের প্রাচীন মন্দির, ভুবনেশ্বর শিবের মন্দির, গিরিধারী মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয়।

চানক ঃ গুসকরার নিকটবর্তী গ্রাম শিক্ষাবিদ রায়বাহাদুর রসমিত্রের জন্মস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত শিক্ষা ও তন্ত্র সাধনার কেন্দ্র হিসাবেও এক সময়ে এই গ্রামের প্রসিদ্ধি ছিল।

চান্না : সাধক কবি কমলাকান্তের মাতুলালয়। খানা জংসন থেকে ৬ কি.মি. দূরে এই গ্রামে কমলাকান্তের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। এই গ্রামে একটি মন্দিরে বিশালাক্ষী দেবী কমলাকান্তের প্রথম জীবনে আরাধ্যা ছিলেন। এই গ্রামে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরবর্তী কালে নীলাম্বর স্বামী নামে প্রসিদ্ধ—জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিশালাক্ষী মন্দিরের নিকটে নিরালম্ব স্বামীর আশ্রম আছে।

বারুল : জামুরিয়ার ৩ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত,—এক সময়ে আকরিক লোহার খনির জন্য বিখ্যাত।

বালিজুড়ি : দুর্গাপুরের সন্নিকটে কয়লার খনি সংলগ্ন গ্রাম। এখানে ভারত-রাশিয়ার মিলিত প্রয়াসে ঝাঁঝরা প্রজেক্ট আছে। গ্রামে একটি বিল্ব-বৃক্ষের নীচে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। জমিদার রামকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পিতা শিশুরাম ও পিতৃব্য কবিরাম তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। শিশুরাম ক্ষ্যাপাকালী, নবীন রাম নবীনা কালী, রামকান্ত এলোকেশীর মন্দির, দুর্গা-মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ও পঞ্চশিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শঙ্করাচার্য পুরী গোস্বামী নামে এক সাধক শ্মশানে কালীমন্দির ও বিল্বমঙ্গল মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জমিদারের দৌহিত্র বংশ বাঁড়ুজ্জে কালী প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নপূর্ণা আশ্রম, দুর্গামন্দির, শিবমন্দির, গোপাল মন্দির, কালীমন্দির প্রভৃতি দর্শনীয়।

কল্যাপুর : আসানসোল মহকুমার বরবানী থানার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। সেন-র‍্যালে সাইকেল কোং প্রতিষ্ঠার পর কল্যাপুর ক্রমে ক্রমে শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়।

ঊষাগ্রাম : আসানসোলের উপকণ্ঠে একটি শিল্পকেন্দ্র। এখানে হিন্দুস্থান পিকলিংটন কোম্পানীর কাচের কারখানা অবস্থিত।

কাজোরা : কয়লার খনি অঞ্চলে অবস্থিত, কাজোরা-কয়লাক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ।

সাঁকতোরিয়া : বরাকরের সন্নিকটে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়। কোল বোর্ডের পরিচালনায় এখানে একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে।

ভরতপুর : পানাগড় রেল স্টেশনের দক্ষিণে প্রাচীন গ্রাম। এখানে বৌদ্ধ স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্তূপ খনন করে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বজ্রাসনে

উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। স্তূপের নিম্নভাগে তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই গ্রামের প্রধান দেবতা ধর্মরাজের মন্দিরে গণেশ, সূর্য, শিব, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ক্ষেত্রপাল ও বাণলিঙ্গ শিবের প্রস্তরময় বিগ্রহ বর্তমান। বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

শামডি ঃ সালামপুরের অন্তর্গত সীতারামপুর স্টেশন থেকে বাসযোগে গন্তব্য। এখানে মুড়াইচণ্ডী বা মুক্তাচণ্ডী পাহাড়ে শিব কালিকা ও শীতলা অধিষ্ঠিতা আছেন। উচ্চ শিখর রীতির দেউলটি দর্শনীয়। মাঘী পূর্ণিমায় চারদিন উৎসব হয়।

শাঁকারী ঃ খণ্ডঘোষ থানার উত্তরপূর্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ধর্মমঙ্গলের কবি নরসিংহ বসু এখানে বাস করতেন। গোবিন্দজীর মন্দির, সিংবাহিনী মন্দির এবং টেরাকোটা শোভিত শিবমন্দির এই গ্রামের সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এখানকার বাসুদেব বিগ্রহের শিল্পসৌন্দর্য অনুপম।

শিলামপুর ঃ পানাগড়ের সন্নিকটে প্রাচীন গ্রাম। একদা চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত সিলামপুর পরগণার প্রধান কার্যালয় ছিল শিলামপুর। এখানে শিলামপুরের শাসনকর্তা বারা খাঁ ও তাঁরা এক বন্ধু ব্রাহ্মণের সমাধি আছে। শিবের গাজন উপলক্ষ্যে এখানে বড় মেলা বসে।

সরপী ঃ গ্রাম উখরার ২ কি. মি. উত্তরপূর্বে অবস্থিত। দুর্গাপুর থেকে সড়ক পথে এখানে গমনাগমন সম্ভব। অর্জুন রায়চৌধুরী নবাব সরফরাজ খানের কাছ থেকে জমিদারী বন্দোবস্ত নিয়ে জঙ্গলমহলে সরফপুর গ্রাম পত্তন করেন। সরফপুর সরপীতে পরিণত হয়েছে। অর্জুনের পুত্র রামেশ্বর রামসায়র নামে দীঘি খনন করে দীঘির তীরে ল্যাটেরাইট পাথরের দুটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। রামেশ্বরের পুত্র কল্যাণচন্দ্র লক্ষ্মীজনার্দনের বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামেশ্বরের অপর পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ টেরাকোটার অলংকরণ সহ গোপালজীউর নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সারুল ঃ গলসী থেকে ৩ কি. মি. পূর্বে প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ধর্মরাজের শিলামূর্তি, বিশালাক্ষীর মন্দির, মুখোপাধ্যায় পরিবারের টেরাকোটার কারুকার্য মণ্ডিত শিখর দেউল, শিবের শিখর দেউল, শিবের দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির ও দুটি শিখর দেউল প্রভৃতি দর্শনীয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশালাক্ষীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব হয়।

সাঁকো ঃ বর্ধমান-গলসী বাসরাস্তার ধারে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে বিশ্বেশ্বর চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত শিবের শিখর দেউল, দুটি আটচালা শিবমন্দির, পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ, হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উষাদিত্য নামে সূর্য-বিগ্রহের মন্দির প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এখানে আষাঢ় মাসের পঞ্চমীতে শঙ্খেশ্বরী নামে মনসাদেবীর পূজা ও মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে উষাদিত্যের বিশেষ পূজা উৎসব উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামের ধর্মদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী বিখ্যাত ছিল। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক স্যর প্রতাপচন্দ্র রায় এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সুয়াতা ঃ মানকর গুসকরা বাস রাস্তায় অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এখানে জাগ্রত পীর বহমন শাহের মাজার বিখ্যাত। কিম্বদন্তী অনুসারে অমরার গড়ে শিবাখ্যা দেবীর সম্মুখে নরবলি বন্ধ করার চেষ্টার ফলে ধর্মপ্রচারের জন্য আগত সৈয়দ বহমন শাহ নিহত হন। প্রতিবৎসর বহমন শাহের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণের দিনে বিশেষ উৎসব হয়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহুলোক এই উৎসবে যোগদান করেন।

হিজলগড়া ঃ জামুরিয়ার ৪ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামের ধর্মরাজ বিখ্যাত। একটি প্রাচীন মন্দিরে অনাদিনাথ, বুড়োশিব, আবালেশ্বর শিব, ধর্মরায়, বুড়োরায় ও বাণেশ্বর শিবের শিলামূর্তি পূজিত হয়। বৈশাখের নৃসিংহ চতুর্দশীতে ধর্মরাজের গাজন ও উৎসব হয়।

হাঁসুয়া ঃ বুদবুদের ৪ কি. মি. পশ্চিমে সেনা নিবাস। এখানে একটি দালান মন্দিরের মধ্যে হংসেশ্বরী কালীর বিগ্রহ ও হংসেশ্বর শিবলিঙ্গ নিত্য পূজিত হয়ে থাকেন। এখানে তেঁতুলবাগানের মধ্যে কাঠের বেদীতে ক্ষেত্রপালের মূর্তি জাগ্রত দেবতা হিসাবে পূজিত হয়ে থাকেন।

মল্লসারুল ঃ গলসী থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে মহারাজ ভৈরব বিজয় সেনের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

বীরভানপুর ঃ দুর্গাপুর স্টেশনের দক্ষিণে দামোদর নদের উত্তরে প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। খননকার্যের ফলে এখানে প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হওয়ায় ক্ষুদ্রাশ্মীয় সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

বেতালবন ঃ গলসী থানার অন্তর্গত রামদাস বাউলের এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক সজনীকান্ত দাসের মাতুলালয় ও জন্মস্থান।

বননবগ্রাম ঃ আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত গুসকরা থেকে বাসে গমনযোগ্য। এখানে সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

ওয়ারিসপুর ঃ বননবগ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম। এই গ্রামে সৈয়দ আবদুল হালিম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত দুই খণ্ডে ইসলামের ইতিহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে একটি বৃহৎ মসজিদ, ইমামবাড়া ও আদিরায় নামক ধর্মঠাকুর বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পাণ্ডবেশ্বর ঃ রাণীগঞ্জ-সিউড়ী রাস্তার উপরে রাণীগঞ্জ থেকে ১৯ কি. মি. দূরে অজয় নদের তীরে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ও কয়লাখনি অঞ্চল। পূর্ব রেলের অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখায় পাণ্ডবেশ্বর স্টেশন আছে। দুর্গাপুর ও অণ্ডাল থেকে ট্রেন বা বাসযোগে পাণ্ডবেশ্বর যাওয়া যায়। ফরিদপুর থানার অন্তর্গত গ্রামটির প্রকৃত নাম বৈদ্যনাথপুর। পাণ্ডবেশ্বর শিবের নামে গ্রামের নামকরণ হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে যে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসকালে এখানে অবস্থান করেছিলেন ও পাঁচটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যদিও মন্দিরগুলিকে অত প্রাচীন মনে হয় না।

পাণ্ডুক ঃ আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত গুসকরা বা ভেদিয়া থেকে যাতায়াত-যোগ্য একটি গ্রাম। জনশ্রুতি অনুসারে এখানে পাণ্ডু রাজার রাজধানী ও গড় ছিল। এই গ্রামে পাণ্ডুরাজার ঢিবি খনন করে তাম্রপ্রস্তর ও তাম্রাশ্মীয় যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে মহোৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ধরে মেলা ও হরিনাম সংকীর্তন হয়।

চিচুরিয়া ঃ জামুরিয়া থেকে ৮ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত একটি গ্রাম কালারায় ও বুড়োরায় নামক ধর্ম ঠাকুরের জন্য প্রসিদ্ধ। বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে সাড়ম্বরে ধর্মরাজের গাজন উৎসব হয়। ধর্মরাজের মন্দিরের নিকটে তেঁতুলতলায় শ্রাবণী সংক্রান্তিতে মনসা পূজা, আষাঢ়ের প্রথমে দিগম্বরী মায়ের পূজা ও ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

জামালপুর ঃ দামোদর নদের তীরে অবস্থিত জামালপুর থানার সদর ও বাণিজ্যকেন্দ্র—কাঁচাগোল্লার জন্য বিখ্যাত। হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনে জামালপুর অবস্থিত।

জৌ গ্রাম ঃ হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে জামালপুর থানার অন্তর্গত একটি

প্রাচীন গ্রাম ও রেলওয়ে স্টেশন। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের এই গ্রামে তপস্যা করে কৈবল্য লাভ করেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। সে সময়ে গ্রামের নাম ছিল জম্ভীয় গ্রাম। এই গ্রামে টেরাকোটা অলংকরণ শোভিত অনেকগুলি শিবমন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, পঞ্চমুণ্ডীর আসনে স্থাপিত মুক্তকেশী কালীর বিগ্রহ, বদর সাহেবের সমাধি প্রভৃতি দর্শনীয়, কলেশ্বরনাথ শিবের প্রাচীন শিখর রীতির দেউল বিশেষ প্রসিদ্ধ। আশ্বিন মাসের পঞ্চমীতে এখানে ঝাপান উৎসব হয়। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক কলানিধির চতুষ্পাঠী এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত (১৮৫০) বিদ্যালয় এই গ্রামের গৌরব।

বসুধা ঃ পানাগড় থেকে বাসে গমনযোগ্য। এই গ্রামে পুরাতন মন্দিরে রূপাইচণ্ডী প্রতিষ্ঠিত আছেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে দেবীর বাৎসরিক পূজা ও গাজন উপলক্ষ্যে মেলা বসে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি নরসিংহ বসুর পৈত্রিক বাসস্থান এই গ্রামে।

মসাগ্রাম ঃ বর্ধমান হাওড়া কর্ড-লাইনের একটি স্টেশন ; জামালপুর থানার অন্তর্গত। এখানে বনরায় নামক ধর্ম-ঠাকুরের অধিষ্ঠান। জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজের গাজন উৎসব হয়। চারচালা, আটচালা অষ্টকোণাকৃতি আটচালা শিবমন্দির ও টেরাকোটা অলংকরণ সমৃদ্ধ পঞ্চরত্ন শিবমন্দির পুরাকীর্তি হিসাবে গ্রামের গৌরব বর্ধিত করেছে।

বসন্তপুর ঃ জামালপুর থেকে ৪ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত মসাগ্রাম থেকে বাসে গমনযোগ্য। রক্ষাকালীর পাষাণ বিগ্রহ ও মন্দির এবং বৈশাখ মাসে দেবীর বাৎসরিক পূজা উৎসবের জন্য গ্রামটির খ্যাতি আছে।

পর্বতপুর ঃ জামালপুর থানার অধীন জৌগ্রাম স্টেশন থেকে ৪. কি. মি. দূরবর্তী গ্রাম। প্রতিবৎসর ১৬ই ফাল্গুন দামোদর তীরে শ্মশানকালীর বাৎসরিক পূজা উৎসব, কষ্টি-পাথরের শ্যামসুন্দর ও অষ্টধাতুর শ্রীরাধার রাম-নবমীতে দোল উৎসব এবং ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে কালাচাঁদ নামক ধর্মরাজ তলায় ঝাপান উৎসব এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য উৎসব।

আঝাপুর ঃ প্রাচীন গ্রাম, কিম্বদন্তী অনুসারে শালিবাহন রাজার রাজধানী, কবি তরুদত্ত ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক স্যার রমেশচন্দ্র দত্তের পৈত্রিক নিবাস, সাহিত্যিক কৃষ্ণধন দে ও ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাসভূমি। মেমারি

অথবা মসাগ্রাম রেলস্টেশন থেকে এখানে যাওয়া যায়। এই গ্রামের মধ্যে যে প্রকাণ্ড ঢিবি বা ধ্বংসস্তূপ আছে, সেখান থেকে একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। টেরাকোটা অলংকরণে সজ্জিত চারটি শিব মন্দির এই গ্রামে আছে।

ইলসরা গ্রামঃ জৌগ্রাম রেলস্টেশন থেকে ৩ কি. মি. পূর্বে ইলসরা নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামে চারটি পীরের আস্তানা আছে। রায় বংশের কুলদেবতা কৃষ্ণরায়ের দোল উৎসব রামনবমীতে অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্রমাসে গাজন উৎসব পালিত হয়। বর্ধমানের বিখ্যাত চিকিৎসক শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

কোন্দাঃ অজয় নদের তীরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধক ঘনশ্যাম গোস্বামীর সাধন স্থান। অণ্ডাল থেকে বাসে কোন্দা যাওয়া যায়।

কুলীন গ্রামঃ জামালপুর থানার অন্তর্গত—জৌগ্রাম রেল-স্টেশন থেকে ৫ কি. মি. দূরে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ—প্রাক্‌চৈতন্য যুগে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় রচয়িতা মালাধর বসুর এবং মালাধরের পুত্র এবং পৌত্র শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ সত্যরাজ খান এবং রামানন্দ বসুর জন্মস্থান। এই গ্রামেই পদকর্তা গোপাল বসু বাস করতেন। চৈতন্য পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল কুলীন গ্রামে। এই গ্রামে চৈতন্য পার্ষদ হরিদাস ঠাকুরের (যবন, হরিদাস) ভজন স্থান আছে। হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে তাঁর তিরোধান উৎসব ও অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় মঠের বার্ষিক উৎসব হয়। কুলীন গ্রামের কীর্তনীয়া সম্প্রদায় বিখ্যাত ছিল। এই গ্রামে আটচালা গোপেশ্বর শিবের মন্দির এবং মদনগোপাল, শ্রীরাধা ও ললিতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। রথযাত্রার সময়ে উৎসব হয়। এছাড়া প্রস্তর নির্মিত শিবা দেবী ও দশভূজা ভুবনেশ্বরী দেবী পূজিতা হন।

রায়নাঃ দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম বর্ধমান আরাম রোডের উপরে অবস্থিত। এক সময়ে রায়না থানার সদর কার্যালয় ছিল এই গ্রাম, পরে থানার সদর কার্যালয় শ্যামসুন্দরে উঠে যায়। রায়নার বাগদী সম্প্রদায় দৈহিক শক্তি ও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে একটি মুখমণ্ডল শীতল রায় ধর্মঠাকুর নামে পূজিত হয়। এই গ্রামে চারটি শিখর রীতির দেউলে শিবলিঙ্গ এবং একটি আটচালা মন্দিরে শ্রীধর আছেন। প্রতিবৎসর শ্মশান কালীর (১৫ই ফাল্গুন) একদিনের মেলা বসে।

শ্যামসুন্দরঃ রায়না ব্লকের অন্তর্গত। পূর্বনাম ছিল আহার বেলমা।

এই গ্রামের স্বনামধন্য বিশালাক্ষ বসু গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের নামে গ্রামের নাম পরিবর্তন করেন। শ্যামসুন্দর কলেজ, রায়না থানার সদর কার্যালয়, ব্লক অফিস ভূমি সংস্কার অফিস, ব্যাংক প্রভৃতি এই গ্রামে অবস্থিত।

কাইতি ঃ শ্যামসুন্দর থেকে সড়ক যোগে বাসপথে যাওয়া যায়। আইন ই-আকবরীতে ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে কাইতি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি রূপরাম চক্রবর্তী কাইতির নিকটবর্তী শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিদ্ধেশ্বরী। কাইতির উত্তর-পশ্চিমে মুণ্ডেশ্বরী খাল নামে নদী খাতের বাণরাজার রাজ্য ছিল। এখানে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে।

গোতান ঃ রায়না থানার অন্তর্গত রত্নানদীর তীরে বর্ধমান থেকে দামিন্যায় বাসে গমন যোগ্য একটি গ্রাম—আচার্য সুকুমার সেনের জন্মস্থান।

দামিন্যা ঃ রায়না থানার অন্তর্গত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান। মুকুন্দরাম পূজিত ধাতুনির্মিত চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী চণ্ডীমূর্তি এখনও এখানে পূজিতা হন। এখানে রত্না নদীর তীরে প্রাচীন চক্রাদিত্য শিবের অধিষ্ঠান। শিবরাত্রির সময় বড় মেলা হয়। চক্রাদিত্য শিবের গাজনের সময়ে শিব ও শীতলার বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের উত্তরে মাণিক পীরের উরস উপলক্ষ্যে তিনদিন মেলা হয়। রত্না নদীর উপরে জাহাজপোতা নামক স্থানে খনন কার্যের ফলে প্রচুর পুরাতাত্ত্বিক বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।

বড়র ঃ জামালপুর থানার অন্তর্গত মসাগ্রাম স্টেশনের নিকটবর্তী, ভুবন-মোহিনী প্রতিভার কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। এখানে গিয়াসুদ্দিন পীরের দরগায় ৫ই মাঘ উরস উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা হয়।

বড়শুল ঃ বর্ধমান শহর থেকে ১৯ কি. মি. দূরে দামোদর নদের উত্তর তীরে প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম—বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে দশহরার চারদিন পূর্বে ধর্মরাজের গাজন উৎসব হয়। গ্রামের পাশ দিয়ে গাঙুর নদী প্রবাহিত। এখানে সমবায় শিক্ষাকেন্দ্র ও বেসিকট্রেনিং কলেজ অবস্থিত। মহারাজ বিজয়চাঁদ এখানে জোড়া শিবমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বেড়ুগ্রাম ঃ জামালপুর থানার অন্তর্গত। এখানে নাটমন্দির সহ একটি পুরাতন শিবমন্দিরে তিন ফুট উঁচু মৃত্যুঞ্জয় শিব অধিষ্ঠিত আছেন। এখানে বৈশাখ মাসে শিবের গাজন হয়।

শক্তিগড়ঃ বর্ধমান শহর থেকে ১০ কি. মি. পূর্বে গ্রাণ্ড্ ট্রাংক রোডের উপরে একটি প্রাচীন গ্রাম—মেন লাইনে শক্তিগড় রেলস্টেশন। এখানকার ল্যাংচা বিখ্যাত। অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে রাধাবল্লভের পঞ্চরত্ন মন্দির দর্শনীয়।

বোড় বলরামঃ বর্ধমান সদর মহকুমার রায়না থানার অন্তর্গত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। শক্তিগড় রেলস্টেশন থেকে বাসে ৪ কি. মি. দূরে বড়শুল গ্রামে নৌকায় দামোদর পার হয়ে ৫ কি. মি. পদব্রজে অথবা মসাগ্রাম স্টেশন থেকে সাদীপুরে দামোদর পার হয়ে ৩ কি. মি. পদব্রজে বোড়গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। বোড় গ্রামের গ্রাম-দেবতা বলরামের নামানুসারে গ্রামের নাম হয়েছে। বারো তেরো ফুট উঁচু শুভ্রবর্ণ ত্রিনয়ন চতুর্দশভুজ বলরাম বাসুদেব ও সংকর্ষণের মিলিত রূপ। বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ায় বলরামের স্নানযাত্রা, শুক্লা চতুর্দশী বা নৃসিংহ চতুর্দশীতে চক্ষুদান উৎসব গাজন ও মেলা হয়।

মেমারিঃ পূর্ব রেলের মেন লাইনের স্টেশন সন্নিকটস্থ গ্রাণ্ড ট্রাংক রোডের উপরে প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম—মেমারি থানার সদর কার্যালয়। এক সময়ে মেমারি সূতী ও রেশমের বস্ত্র নির্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে আটচালা মন্দিরে সোমেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজিত হন। এছাড়া সিংহবাহিনী দেবী, শীতলা, শ্রীধর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি এখানে পূজা পান।

পালসিটঃ মেমারির সন্নিকটে প্রাচীন গ্রাম ও বৈষ্ণবতীর্থ—শ্রীপাট পালসিট্ নামে প্রসিদ্ধ। শ্যামাদাস আচার্যের সাধন ভজন ও বসবাসের স্থান। প্রতি বৎসর মদনগোপালের রাস ও দোলোৎসব ও মেলা এখানকার উল্লেখযোগ্য উৎসব। জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় শ্যামাদাসের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে মহোৎসব হয়। মদনগোপালের নাটমন্দির সহ আটচালা মন্দিরটি দর্শনীয়। পালসিটে হীরালাল চট্টোপাধ্যায় নামে এক তান্ত্রিকের গৃহে পাষাণময়ী জগদ্ধাত্রীর নিত্যপূজা হয়। টেরাকোটা অলংকরণে শোভিত তিনটি চারচালা শিবমন্দির এই গ্রামের শোভা বর্ধন করেছে।

গণ্ডারঃ মেমারি ১ নং ব্লকের অন্তর্গত মেমারি-মন্তেশ্বর রাস্তার ধারে একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গ্রাম। এখানকার গ্রামদেবতা চণ্ডী—প্রাচীন টেরাকোটা অলংকরণ সমৃদ্ধ দেউলে অবস্থিত। স্থানীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাস অনুসারে সতীর কর্ণ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হয়ে এখানে পতিত হওয়ায় একান্ন সতীপীঠের অন্যতম এই

স্থান 'কানতার' থেকে 'গন্তার'-এ পরিণত হয়েছে। বৈশাখ মাসের সীতানবমী উপলক্ষ্যে এক সপ্তাহ ধরে মেলা বসে।

মণ্ডল গ্রাম ঃ মেমারি থেকে ২০ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এখানকার গ্রামদেবতা জগৎগৌরী মনসা চতুর্ভূজা প্রস্তরময়ী। কিম্বদন্তী অনুসারে দেবী নরপাল নামে কোন রাজার আরাধ্যা। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে রাজার দ্বারা পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্তা এবং বহুকাল পরে জেলের জালে উদ্ধারপ্রাপ্তা। আষাঢ় মাসে দশহরার পরের পঞ্চমীতে দেবীর বিশেষ পূজা উৎসব ও মেলা হয়।

বরেঁায়া ঃ মেমারি থানার অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম। এখানকার ধর্মরাজ বিখ্যাত। বল্লুকা নদীর তীরে ধর্মরাজের প্রাচীন পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। আচার্য সুকুমার সেনের মতে ধর্মপূজা বিধানে উল্লিখিত ধর্মপীঠ শ্রীবর্ধমান বর্তমান বরেঁায়া গ্রাম।

ভাতাড় ঃ বর্ধমান-কাটোয়া রোডের উপরে অবস্থিত সমৃদ্ধ গ্রাম—বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথে ভাতাড় স্টেশন। এই গ্রামে ফায়ার ব্রিগেড্ অফিস, ব্লক অফিস, ভূমিসংস্কার অফিস, পূর্ত বিভাগের ডাক বাংলো, সিনেমা, সরকারী ফ্ল্যাট, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিদ্যমান।

বড় বেলুন ঃ ভাতাড় ব্লকের অন্তর্গত বর্ধমান থেকে বাসযোগে গমনযোগ্য একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে অনন্তপুরী গোস্বামীর শ্রীপাট অবস্থিত। অনন্তপুরী প্রতিষ্ঠিত রাধাগোপীনাথ বিগ্রহের দোল, রাস, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়। এখানকার কালীপূজা প্রসিদ্ধ। কালীপূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও অন্যান্য পণ্ডিতদের জন্মস্থান বড়বেলুন।

দেবীপুর ঃ মেমারি থানার অন্তর্গত পূর্ব রেলের মেন লাইনে দেবীপুর স্টেশন থেকে ৩ কি. মি. উত্তরে প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে সিংহ পরিবার প্রতিষ্ঠিত টেরাকোটা অলংকারশোভিত প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির ও তাম্বুলি পরিবার প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

দেনুড় ঃ মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত খড়েশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম শ্রীপাট দেনুড়। চৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস এই গ্রামে বাস করেছিলেন এবং এখানে বসেই চৈতন্য ভাগবত রচনা করেছিলেন এবং শ্রীপাট

স্থাপন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতীরও জন্মস্থান দেনুড় বলে প্রসিদ্ধি আছে। কেশব ভারতীর প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতুর বালগোপাল এখনও পূজিত হন। এই গ্রামে কবিওয়ালা বেণীমাধব দীক্ষিত, কবি সত্যকিংকর কুণ্ডু, সাহিত্যিক অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, ভোলানাথ ব্রহ্মচারী ও অভিনেতা অক্ষয়কালী কোঙার বাস করতেন।

পাতুনঃ মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়ের নিকটবর্তী প্রাচীন গ্রাম—দার্শনিক পতঞ্জলি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত পতঞ্জলীশ্বর শিবের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য যাদবেন্দু পণ্ডিতের শ্রীপাট হিসাবে পাতুন প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে অবস্থিত পাত্রেশ্বর শিবের বিশেষ পূজা উৎসব সম্পন্ন হয় শিবরাত্রিতে। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী ও দশমীতে শ্রীপাটে মহোৎসব হয়।

পুটশুড়িঃ মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়ের নিকটবর্তী অপর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মন্তেশ্বর বা কুসুমগ্রাম থেকে বাসে এখানে যাওয়া যায়। এখানে প্রস্তর নির্মিত গজকালিকার শ্রাবণ মাসে বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে একটি মেলা বসে। দোল পূর্ণিমায় গোপীনাথের দোলোৎসব, পৌষ সংক্রান্তিতে ব্রহ্মা পূজা, আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে বাবাঠাকুরের বাৎসরিক পূজা উৎসব, বৈশাখের সংক্রান্তিতে যোগাদ্যা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। টেরাকোটা অলংকরণশোভিত জোড়া শিবের শিখর দেউল দর্শনীয়।

শুশুনিঃ মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত মালডাঙ্গা থেকে ২ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত তারাক্ষ্যা মা'র অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হিসাবে তারিক্ষ্যেতলা নামে পরিচিত। কষ্টিপাথরে নির্মিত পথের উপরে উপবিষ্টা বামপদে সিংহপৃষ্ঠে অসীনা, মহাদেবকে স্তন্যপানে নিয়তা দেবী তারাক্ষ্যা চক্ষুরোগ আরোগ্যকারিণী হিসাবে বহুজনের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিতা হন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

শ্রীধরপুরঃ মেমারি থানার অন্তর্গত কমলপুর বাস ষ্টপেজ থেকে ৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত ধর্মরাজের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। দুটি কূর্মমূর্তিসহ চল্লিশটি ধর্মশিলা এই গ্রামে পূজিত হয়। বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। আটচালা শিবমন্দির ও জোড়া শিবমন্দির এই পুরাকীর্তি হিসাবে দর্শনীয়।

সাতগাছিয়াঃ সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ গ্রাম বর্ধমান থেকে ৩২ কি. মি.

পূর্বে বর্ধমান-কালনা বাস রাস্তার ধারে অবস্থিত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দোলমঞ্চ, সিংহবাহিনীর আটচালা মন্দির ও শিবের পঞ্চরত্ন মন্দির দর্শনীয়।

কুসুম গ্রাম ঃ মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত কালনা-বর্ধমান বাসপথের ধারে অবস্থিত মধ্যযুগে মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত তিন গম্বুজ ও চার মিনার বিশিষ্ট মসজিদটি পুরাকীর্তি হিসাবে দর্শনীয়।

কুড়মুন ঃ কুসুম গ্রামের নিকটবর্তী খড়ি নদীর তীরে অবস্থিত। ঈশানেশ্বর শিবের মন্দির, মকতুল সাহেবের আস্তানা, কালাচাঁদ নামে ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি, ইন্দ্রাণীদেবীর পাষাণময় বিগ্রহ এই গ্রামে অধিষ্ঠিত।

অম্বিকা কালনা ঃ বর্ধমান জেলার পূর্বপ্রান্তে গঙ্গার পশ্চিম তীরে প্রাচীন মহকুমা শহর। এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকার নামানুসারে নামকরণ হয়েছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত ও পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থে অম্বুয়া মুলুকের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মুসলমান আমলে কালনা শাসনকেন্দ্র ছিল। পণ্ডিতদের মতে অম্বুয়া জৈনদেবী। বর্তমানে অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী কালীরূপে পূজিতা হন। অবশ্য কালনায় গঙ্গাতীরে মহিষমর্দিনী-তলায় শ্রাবণী পূর্ণিমায় চারদিন অম্বিকা মহিষমর্দিনীর পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। অম্বুয়াতে শ্রীচৈতন্যপার্ষদ গৌরীদাস পণ্ডিত সপরিবারে বাস করতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরী যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্য অম্বুয়া এসেছিলেন, গৌরীদাসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়েছিল। কালনা শহরের দক্ষিণপূর্বে একটি তেঁতুল বৃক্ষের তলে মহাপ্রভু বিশ্রাম করেছিলেন ও গৌরীদাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। গৌরীদাস মহাপ্রভুর অনুমতি নিয়ে তাঁর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতেন। তেঁতুলগাছের অদূরে গৌরীদাসের গৃহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বিগ্রহ আজও পূজিত হয়। গৌরীদাস কালনা অঞ্চলে চৈতন্যধর্ম প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু গৌরীদাসের ভ্রাতা সূর্যদাস সরখেলের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেছিলেন। গৌরীদাসের সাধনক্ষেত্র হিসাবে শ্রীপাট অম্বিকা কালনা নামে পরিচিত।

প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক কবি কমলাকান্ত কালনার বিদ্যাবাগীশপাড়ার অধিবাসী মহেশ্বর ভট্টাচার্যের পুত্র। বিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক ও ভক্তিগীতি

রচয়িতা ভবা পাগলা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ব্যবসায়ী বাচস্পত্যাভিধানম্ রচয়িতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছিলেন কালনার অধিবাসী। বিদ্যাসাগর মহাশয় তারানাথকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার জন্য অনুরোধ করতে স্বয়ং কালনায় এসেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমভাগে কালনায় ৩৭টি চতুষ্পাঠী ছিল। বর্তমানে একটি ডিগ্রী কলেজ ও কয়েকটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বালক ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যমান।

মুসলমান আমলেও কালনা বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এখানে পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ধর্মপ্রচারক বদরুদ্দীন বদরে আলম কালনায় বাস করেছিলেন। তাঁর সহযোগী শাহ মজলিসের নামে নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৪৮৭—৯০) এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে দশটি গম্বুজ বিশিষ্ট জামিয়া মসজিদ নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি মসজিদ এখানে নির্মিত হয়েছে।

বর্ধমানের রাজারা গঙ্গাবাসের জন্য কালনাকে নির্বাচন করার পর রাজবাড়ী, রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে লালজী মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, রাজবাড়ীর সন্নিকটে একশ' আট শিবমন্দির, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির, অনন্ত বাসুদেবের আটচালা মন্দির, গোপালজীর মন্দির, সমাজবাড়ী প্রভৃতি নির্মিত হয়। মন্দিরগুলির স্থাপত্য-শিল্প ও গঠন সৌন্দর্য বিস্ময় উদ্রেক করে। পঁচিশ রত্ন লালজী মন্দিরের সৌন্দর্য অনুপম।

নেপাকুলি ঃ কালনা শহর থেকে ৩ কি. মি. পশ্চিমে বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে একটি মন্দিরে কমলা ও বিমলা দেবী আছেন। আষাঢ় মাসের নবমীতে ও দশহরায় দেবীর ঝাপান উপলক্ষ্যে মেলা হয়।

সিঙ্গারকোন ঃ কালনা-বৈঁচি পাকা রাস্তার ধারে কালনা থেকে ১০ কি. মি. দূরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে জোড়াবাংলা মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ গোস্বামীদের দ্বারা পূজিত হন। দোলের উৎসব নিকটবর্তী চতুষ্পার্শ্বের গ্রামের বড় উৎসব। দোলের পূর্বদিন রাত্রিতে বাজি পোড়ে। আট দশ দিন ব্যাপী দোলতলায় একটি বড় মেলা বসে। এই গ্রামে বুড়ী মা (দুর্গা), পথের

কালী, সিদ্ধেশ্বরী কালী ও শ্মশান কালী শাক্তপ্রাধান্যের ইঙ্গিত দেয়। একটি প্রাচীন টেরাকোটা অলংকৃত পঞ্চরত্ন মন্দিরও আছে। পাকা রাস্তার ধারে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে।

বৈদ্যপুর ঃ কালনা থেকে ৮ মাইল পশ্চিমে এবং বৈঁচি স্টেশন থেকে ৫ মাইল পূর্বে কালনা-বৈঁচি রাস্তার উপরে হুগলী জেলার সীমানায় গাঙ্গুর নদীর তীরে কালনা থানার অন্তর্গত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের জমিদার নন্দী পরিবারের কীর্তিসমৃদ্ধ এই গ্রাম। এক সময়ে সংস্কৃত চর্চার জন্যও বৈদ্যপুর ও তৎসংলগ্ন মীরহাট গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। কুমারকৃষ্ণ নন্দী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও রাজরাজেশ্বর বালিকা বিদ্যালয় নামে মাধ্যমিক স্কুল, কয়েকটি টেরাকোটা অলংকরণে সুশোভিত শিবমন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন মন্দির, রাসমঞ্চ, শুভানন্দ পাল নির্মিত দ্বাদশ শতকের একজোড়া শূন্যগর্ভ রেখ দেউল, বিশাল কাঠের রথ, রাজরাজেশ্বরের (শালগ্রাম শিলা) পূজাবাড়ী তথা রাজরাজেশ্বর এষ্টেটের কাছারী বাড়ী, দীনবন্ধু নন্দী প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় (বর্তমানে হেল্‌থ সেণ্টার—গ্রামীণ হাসপাতাল) এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বস্তু। প্রসিদ্ধি আছে যে কিঙ্করমাধব সেন নামে এক সামন্তরাজা এখানে রাজত্ব করতেন। বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাজরাজেশ্বরের রথের উৎসব ও মেলা, রাস যাত্রায় উৎসব ও মেলা, জগদ্ধাত্রী পূজার উৎসব, বৃন্দাবন-চন্দ্রের পঞ্চম দোল এতদঞ্চলের মানুষদের আনন্দদানের ব্যাপক আয়োজন।

পাতিলপাড়া ঃ বৈদ্যপুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈদ্যপুরের পূর্বে অবস্থিত বৈদ্যপ্রধান প্রাচীন গ্রাম। এক সময়ে এখানে খ্যাতনামা কবিরাজদের বাসস্থান ছিল। ম্যালেরিয়ার মহৌষধরূপে পাতিলপাড়ার পাঁচন বিখ্যাত ছিল। এখানেই কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জন্ম হয়েছিল। কবি ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের পিতৃভূমি ও জন্মভূমি পাতিলপাড়া বৈদ্যরাজা কিঙ্কর মাধব সেনের সঙ্গেও এই গ্রামের নাম সংশ্লিষ্ট। রাজডাঙ্গা নামক স্থানটি কিঙ্কর মাধবের সভাগৃহ হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই গ্রামেই অবস্থিত হরগৌরীর যুগল শৃঙ্গার মূর্তি ভাস্কর্যের দিক থেকে অনুপম। প্রসিদ্ধি আছে যে রাজা কিঙ্কর মাধব সেনের দ্বারা হরগৌরী পূজিত হয়েছিলেন।

উদয়পুর ঃ বৈদ্যপুরের সন্নিকটে এবং উত্তরে বেহুলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। পতির শব নিয়ে ভেসে যাবার সময় বেহুলার এখানে উদয়

হয়েছিল বলে উদয়পুর নাম। এখানে বেহুলা দেবীর অধিষ্ঠান। আষাঢ় মাসে হোরা পঞ্চমীতে বেহুলার ঝাপান হয় ও মেলা বসে।

নারিকেলডাঙ্গা ঃ বৈদ্যপুরের পশ্চিমে বেহুলা নদীর তীরে ছোট প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের জগৎগৌরী বিখ্যাত। দশহরার পরের পঞ্চমীতে দেবীর ঝাপান উৎসব হয়। বিরাট মেলা বসে।

দেরিয়াটোন ঃ কালনা স্টেশন থেকে কিছু দূরে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ, বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও মহেন্দ্রনাথ দত্তের পৈত্রিক বাসভূমি।

ধাত্রীগ্রাম ঃ কালনার নিকটবর্তী ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথের ধারে স্টেশন ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বল্লালসেনের তাম্র শাসনে উল্লিখিত ধার্যগ্রাম ও ধাত্রীগ্রাম অভিন্ন। সত্যব্রত সামশ্রমী, সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামসুন্দর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মস্থান।

বাঘনাপাড়া ঃ কালনা থানার অন্তর্গত কালনা স্টেশনের পরবর্তী রেল স্টেশন ও রেল স্টেশনের পশ্চিমে কিছুদূরে প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম। কিম্বদন্তী অনুসারে ব্যাঘ্রপাদ মুনির তপস্যার স্থল হিসাবে অথবা নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবীর পালিত পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের বাঘকে হরি নামে বশীভূত করে গ্রামকে ব্যাঘ্রহীন করার জন্য গ্রামের নাম বাঘনাপাড়া বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বংশীবদন চট্ট বাঘনাপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। বংশী বদনের পৌত্র ও চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামাইকে দীক্ষা দিয়ে জাহ্নবা দেবী পালিতপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রমা করে বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ বলরামের বিগ্রহ এনে রামাই বাঘনাপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে রামচন্দ্রের তিরোধান দিবসে ছয় দিন ব্যাপী মহোৎসব হয়। বহু বৈষ্ণব ভক্ত গোস্বামীর এই উৎসবে আগমন ঘটে। এ ছাড়া বৈশাখী পূর্ণিমায় কৃষ্ণ বলরামের ফুলদোল, দোল যাত্রায় কৃষ্ণ বলরাম রেবতী ও রাধারানীর গ্রাম পরিক্রমার উৎসব। চৈত্র মাসে গোপীশ্বর শিবের গাজন, জগন্নাথের স্নান যাত্রা, রথযাত্রা, চৈত্র মাসে বংশীবদনের জন্মোৎসব প্রভৃতি গ্রামটিকে উৎসবমুখর করে রাখে। বল্লুকা নদীর তীরে অবস্থিত বাঘনাপাড়ায় ধর্মরাজ ও মনসার অধিষ্ঠান। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় ধর্মরাজের জাত উৎসব ও জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে মনসার ঝাপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্বস্থলী ঃ কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বস্থলী থানার সদর কার্যালয় ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেল পথের স্টেশন ও নিকটবর্তী গ্রাম। এখানকার বুড়ী মা জাগ্রত দেবী হিসাবে প্রসিদ্ধ। চড়কের উৎসব ও মেলা এবং কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা ও শোভাযাত্রা পূর্বস্থলীর প্রধান উৎসব।

আমুখাল ঃ কালনা শহর থেকে ৫ কি. মি. প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে মজুমদার পরিবারের অষ্টধাতুর জয়দুর্গা দেবীর গাজন উপলক্ষ্যে মেলা হয়। বহু লোকের সমাবেশ হয়। চড়ক উৎসবে ফোঁড় হয়।

জামালপুর ঃ কালনা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বস্থলী থানায় অবস্থিত বুড়োরাজ বা ধর্মরাজ পূজার জন্য প্রসিদ্ধ ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে পাটুলি স্টেশন থেকে বাসে, রিক্সায় বা পদব্রজে গমনযোগ্য। বুড়োরাজ শিবলিঙ্গ হলেও ধর্মরাজের মতই পূজা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের গাজন হয়,—বিরাট মেলা বসে, বহু ছাগ বলি প্রদত্ত হয়—মেলা প্রায় একমাস থাকে, কাতারে কাতারে ভক্ত মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়।

পাটুলি ঃ পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে রেলস্টেশন, পাটুলি থেকে পূর্ব দিকে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। মধ্য যুগে পাটুলি ছিল বাণিজ্যকেন্দ্র। রবার্ট ক্লাইভ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ যাত্রাকালে এখানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। ভাগীরথী এখানে উত্তর বাহিনী হওয়ায় পৌষ সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ উত্তরবাহিনীর পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে সপরিবারে অবস্থান করেছিলেন। দোলযাত্রায় ও বারদোলের পর কৃষ্ণদেব ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে উৎসব হয়।

মেড়াতলা ঃ পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যে একটি ঢিবি থেকে আবিষ্কৃত শিব লিঙ্গ বুড়ো শিব নামে খ্যাত। চৈত্রমাসে গাজনের অনুষ্ঠানে সন্ন্যাসীরা নানা প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করে থাকেন। আতসবাজী পোড়ানো হয়। একটি বিরাট মেলা বসে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অকালপৌষ ঃ কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর থেকে মাইল তিনেক উত্তরে প্রসিদ্ধ গ্রাম। বিপ্লবী অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ ও তাঁর পুত্র বিখ্যাত

ভাষাতাত্ত্বিক বটকৃষ্ণ ঘোষের জন্মস্থান এই গ্রাম। এ ছাড়া প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র পরিচালক দেবকীকুমার বসু এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অগ্রদ্বীপ ঃ কাটোয়া মহকুমা ও কাটোয়া থানার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে কষ্টিপাথরে অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে এখানে বসবাস করেছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর গোপীনাথ তাঁর পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করেছিলেন এবং পিণ্ডদান করেছিলেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কৃষ্ণা একাদশীতে (আম বারুণীর আগের একাদশী) ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে, বহু ভক্ত বৈষ্ণব বাউল ইত্যাদির সমাগম হয় বারুণীর মেলা উপলক্ষ্যে। প্রায় ১৫ দিন মেলা থাকে। সাহেব ধনী সম্প্রদায়, বলরাম ভজা সম্প্রদায় এমন কি মুসলমানগণও এই উৎসবে যোগদান করেন।

ঘোড়াইক্ষেত্র ঃ অগ্রদ্বীপ থেকে তিন মাইল উত্তরে প্রাচীন গ্রাম। এক সময়ে এই গ্রামের পাশ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হোত। এক সময়ে ঘোড়াই-ক্ষেত্র তান্ত্রিক প্রধান স্থান ছিল। কুব্জিকাতন্ত্রে উল্লিখিত অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ-তীর্থ কালীতলার নিকটে প্রাচীন পীঠ বর্তমানে গঙ্গাগর্ভে। এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হোত। গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে এই পীঠের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয়েছে।

দাঁইহাট ঃ কাটোয়া থেকে ৬ কি. মি. দক্ষিণপূর্বে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথে দাঁইহাট স্টেশনের পূর্বে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন শহর। দাঁইহাট, ভাউ সিং ও বেড়া মৌজা নিয়ে দাঁইহাট পৌরসভা গঠিত। কাটোয়া থানার অন্তর্গত এই শহর। সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্দ্র ছিল দাঁইহাট। কাশীরাম দাস এই অঞ্চলে ভাগীরথীর তীরে দ্বাদশ তীর্থের উল্লেখ করেছেন। এই দ্বাদশ তীর্থ কাটোয়া দাঁইহাটের মধ্যে বর্তমান ছিল। ইন্দ্রাণী পরগণার রাজা ইন্দ্রেশ্বর গঙ্গার ঘাটে শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেখানেই ছিল রাজবাটী। এই স্থান রাজডাঙ্গা নামে পরিচিত। ইন্দ্রেশ্বর ঘাটের অদূরে মসজিদ ও মাজার শিব মন্দিরের উপাদান নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। চৈতন্যদেব গঙ্গা পার হয়ে ইন্দ্রেশ্বর ঘাট থেকে কাটোয়া গিয়েছিলেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। ইন্দ্রেশ্বর ঘাটে ইন্দ্র-দ্বাদশীর দিন পুণ্যস্নানের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়।

ইন্দ্রেশ্বর ঘাটের নিকট সিদ্ধেশ্বরী তলায় শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা সিদ্ধ সাধক রামানন্দের পাট। এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে রামানন্দ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বাসুদেব ঘোষের পুত্র বৈষ্ণব সাধক মুকুন্দ ঘোষ, গদাধর ভাস্কর, নয়ন ভাস্কর ও গায়েন মুকুন্দ দত্ত এখানে বাস করতেন। ভাস্কর্যের জন্য দাঁইহাট বিখ্যাত ছিল। পাথর কেটে দেবদেবীর মূর্তি এখনও এখানে নির্মিত হয়।

প্রথমে দাঁইহাট ছিল বর্ধমানের রাজাদের গঙ্গানিবাস। বর্ধমানের রাজাদের নির্মিত বুড়োরাণীর ঘাটের নিকটে রাজাদের সমাজ বাড়ী আছে। এখানে আবু রায় থেকে চিত্রসেন পর্যন্ত রাজাদের সমাধি আছে। সমাজবাড়ীর পশ্চিমে কীর্তিচাঁদ ত্রিলোকচাঁদের সময়ের তিনটি মন্দির আছে। দাঁইহাটের পশ্চিমাংশ দেওয়ানগঞ্জ নামে পরিচিত। বর্ধমান রাজের দেওয়ান মাণিকচাঁদের নামানুসারে এই অঞ্চলের নামকরণ হয়েছে। দেওয়ান সম্ভবতঃ একটি ঘাট নির্মাণ করিয়েছিলেন। দেওয়ানের হাট থেকে দাঁইহাট নাম হওয়া সম্ভব। নিকটবর্তী জগদানন্দপুরে ঘোষচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি ভাস্কর্য ও শিল্পনৈপুণ্যের জন্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পশ্চিম ভারতের নানা স্থান থেকে নানা রঙের পাথর এনে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। নবদ্বীপের শক্তিরাসের অনুসরণে দাঁইহাটে মহা সমারোহে রাসোৎসব পালিত হয়।

কাটোয়া ঃ অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে প্রাচীন মহকুমা শহর। বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর (গৌরাঙ্গদেব) এখানে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য কাটোয়া বৈষ্ণবতীর্থ। গৌরাঙ্গবাড়ী এখানকার দর্শনীয় বস্তু। গৌরাঙ্গের মস্তক মুণ্ডনের স্থান এবং গদাধর দাস ও কেশব ভারতীর সমাধিস্থান আছে মন্দিরের নিকট। মাধাই-তলায় মাধাই এর সমাধিস্থল আছে। গৌরাঙ্গপার্ষদ গদাধর দাস প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গমূর্তির সেবার ভার গদাধর তাঁর প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন দাসকে দিয়ে গিয়েছিলেন। যদুনন্দন কর্ণানন্দ, প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সম্রাট ফারুখ শাহের আমলে শাহ আলম খান ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ্ নির্মাণ করিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি ও ১লা মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণের উৎসব পালিত হয়। কার্তিক মাসে গদাধর দাসের তিরোভাব উপলক্ষ্যে ভক্ত বৈষ্ণব কীর্তনীয়াদের সমাগমে উৎসব জমে ওঠে। কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিকপূজা ও কার্তিক লড়াই কাটোয়ার বৃহত্তম উৎসব।

উজানি-কোগ্রাম ঃ কাটোয়া মহকুমায় মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত অজয়

ও কুমুরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বর্তমানে কো গাঁ নামে পরিচিত। কুমুর দক্ষিণ পূর্বে কো গ্রামকে বেষ্টন করে অজয় নদে মিশেছে। ক্ষমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গল কাব্য অনুসারে উজানিতে ছিল বেহুলার পিত্রালয় এবং ধনপতি শ্রীমন্ত সওদাগরের বাসস্থান। কোগ্রাম মঙ্গলকোট আড়াল প্রভৃতি গ্রাম নিয়েছিল সেকালের উজানি নগর। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে উজানি নগরের বর্ণনা আছে। বর্তমানে উজানি নাম অপ্রচলিত। কোগ্রাম এখনও বর্তমান। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে উজানি পীঠস্থান এখানে দেবী সতীর কফোণি পড়েছিল। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডিকা, ভৈরবের নাম কপিলাম্বর। কোগ্রামে একটি মন্দিরে কাঠের সিংহাসনে পিত্তলময়ী দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুর মর্দিনী চণ্ডী বিরাজমানা, দেবীর বামে কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ কপিলাম্বর। বৈষ্ণব কবি ও চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাসের জন্মস্থান ও বাসস্থান ছিল কোগ্রাম। এখানে লোচনদাসের পাট ও সমাধি আছে। অজয় কুমুরের সঙ্গমস্থলে ছিল ভ্রমরার দহ। ধনপতি সওদাগর ভ্রমরার দহে ডিঙায় চেপে সিংহলে বাণিজ্য করতে যেতেন। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের মধ্যে বজ্রাসনে উপবিষ্ট একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে। লোচনদাসের পাটের কাছে ষোড়শ জৈন তীর্থংকর শান্তিনাথের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল। অজয়-কুমুরের গর্ভ থেকে প্রচুর বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। গঙ্গামঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ কমলাকান্তের নিবাস ছিল উজানি কোগ্রামে। রবীন্দ্রানুসারী কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কো গ্রামে বাস করতেন।

মঙ্গলকোট ঃ কুমুর ও অজয়ের অববাহিকায় অবস্থিত মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র ও প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র। কিম্বদন্তী অনুসারে এখানে বিক্রমাদিত্য বা বিক্রম কেশরী নামে এক রাজা ছিলেন। মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে রাজার বিরোধ হয়। আঠারো জন আউলিয়া এই গ্রামে আগমন করায় এই স্থানকে আঠারো আউলিয়ার দেশ বলা হয়ে থাকে। বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য গ্রন্থে বিক্রম কেশরী ও তাঁর পূর্বপুরুষ শ্বেত রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সামন্তরাজা বিক্রমকেশরী বা বিক্রমজিৎ এর দ্বারা আউলিয়াগণ নিহত হন। গজনবী নামে এক গাজী বা পীর হিন্দু রাজাকে হত্যা করে মঙ্গলকোট অধিকার করেন। গোলাম পাঞ্জাতন নামে পীর ও পাঁচজনের সমাধি আছে মঙ্গলকোটে। এখনও মঙ্গলকোটে পীর পঞ্জতনের মেলা হয়। হোসেন শাহের মসজিদ,

নসরত শাহের মসজিদ, হোসেন শাহের আমলের দীঘি, দানেশ মন্দর্খা নির্মিত মসজিদ, কোয়ার সাহেবের মসজিদ, হামামখানা, নাকরাখানা, ফুলবাস, বিক্রমাদিত্যের ভিটা প্রভৃতি পুরাতাত্ত্বিক মূল্যবান নিদর্শন এখানে আছে।

কৈচর-মাজিগ্রাম ঃ মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত বর্ধমান-কাটোয়া রোডের উপরে অবস্থিত, কৈচর গ্রাম থেকে কয়েক কি.মি. দূরে মাজিগ্রাম। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল ও কৃপাণধারিণী, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী শাকম্ভরী দেবী। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে শাকম্ভরীর বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়, মেলা বসে। মদন চতুর্দশীতে শাকম্ভরীর সঙ্গে দেউলেশ্বর শিবের বিবাহ উৎসব হয়।

ক্ষীরগ্রাম ঃ বর্ধমান-কাটোয়া রেলপথের কৈচর স্টেশন থেকে কিছুদূরে মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন বৃহৎ গ্রাম। কুব্জিকাতন্ত্রে ক্ষীরগ্রাম একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠ পড়েছিল, এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম যোগাদ্যা, ভৈরবের নাম ক্ষীরকণ্টক। দেবীর নামান্তর ক্ষীরভবানী থেকে গ্রামের নাম হওয়া সম্ভব। কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত সিংহবাহিনী দশভুজা দুর্গা যোগাদ্যা। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র গ্রামের মধ্যে যোগাদ্যার পুরাতন মন্দিরের উপরে নূতন মন্দির নির্মাণ করেন। দেবীর শঙ্খপরার কাহিনী বহু কবির রচনার বিষয় হয়েছে। দেবীর বাৎসরিক উৎসব সমগ্র বৈশাখ মাস ধরে চলে।

শ্রীখণ্ড ঃ কাটোয়া-বর্ধমান লাইনে শ্রীপাট শ্রীখণ্ড এবং শ্রীখণ্ড স্টেশন থেকে অথবা বর্ধমান-কাটোয়া বাসে বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ডে যাওয়া যায়। বৈদ্য প্রধান গ্রাম বলে এই গ্রামের প্রাচীন নাম বৈদ্যখণ্ড। শ্রীখণ্ড চৈতন্য-পার্ষদ নরহরি সরকারের বাসস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই যশোরাজ খান, কবি দামোদর সেন, নারায়ণ সরকার ও রাজবৈদ্য মুকুন্দ সরকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু নরহরি সরকারের আহ্বানে শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন। শ্রীখণ্ডের কীর্তন গানেরও প্রসিদ্ধি ছিল। রঘুনন্দন, অভিরাম গোস্বামী প্রভৃতির কীর্তন প্রসিদ্ধ ছিল। নরহরির তিরোধানের পরে রঘুনন্দন এই অঞ্চলের বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে নরহরি সরকারের তিরোধান মহোৎসব হয়। নরহরি গৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতেন। বহু বৈষ্ণব কবি শ্রীখণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বৈষ্ণব

সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীখণ্ডের স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শাক্ত-ধর্মেরও মিলন ঘটেছিল শ্রীখণ্ডে। বৈদ্যখণ্ড বা শ্রীখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী খণ্ডেশ্বরী। এখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে, শ্রীখণ্ডের উত্তরে আছেন অনাদিলিঙ্গ শিব। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে ইনিই ভৈরব ভীরুক। রাজা রাজবল্লভ শিবমন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

আউরিয়া ঃ কাটোয়া থানার অন্তর্গত শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গুরু কেশব ভারতীর জন্মস্থান। মাঘমাসের ভীম একাদশীতে কেশব ভারতীর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা বসে, বহু কীর্তনীয়ার দল এই উৎসবে কীর্তন গান করে থাকে।

কেতুগ্রাম ঃ কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঈশানী নদীর তীরে অবস্থিত কেতুগ্রাম থানার সদর কার্যালয়। অতীতে এই গ্রামের নাম ছিল বহুলাপুর বা বহুলাপীঠ। কিম্বদন্তী অনুসারে এখানে চন্দ্রকেতু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয় কেতুগ্রাম। এখানে স্থানীয় জমিদারের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। নৃসিংহ তর্কপঞ্চানেনর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 'গণমার্তণ্ড' টীকা অনুসারে কবীন্দ্র চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর পূজারী ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই চণ্ডীদাসই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি।

কেতু গ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী অধিষ্ঠিতা। তন্ত্র চূড়ামণির মতে এই স্থানে সতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় বহুলাক্ষী মহাপীঠ। বহুলা সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু কাল পাথরে গড়া সুন্দর দেবীমূর্তি। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ ও বাম পার্শ্বে কার্তিকেয়। দেবীর ভৈরবের নাম ভীরুক। কেতুগ্রাম থেকে ১ কি. মি. দূরে বহুলা নদীর তীরে মহাশ্মশানটি শিব-চরিতে রণখণ্ড নামে কথিত। রণখণ্ডে দেবীর ডান কুনুই পড়েছিল। এখানে দেবীর নাম বহুলাক্ষী, ভৈরবের নাম মহাকাল। বহুলা ও বহুলাক্ষীকে নিয়ে যুগ্মপীঠ। বহুলাক্ষীর বিগ্রহ পাওয়া যায় না। মহাকাল এখনও আছেন। কেতুগ্রামে গাজন উৎসবে বোলান গানের দল দিনরাত্রি বোলান গান করে।

মরাঘাট বা রণখণ্ডের এক মাইল দূরে প্রাচীন মহাপীঠ অট্টহাস। কুব্জিকা তন্ত্রের মতে এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করেন। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়েছিল, এই পীঠের

শক্তির নাম ফুল্লরা, ভৈরবের নাম বিশ্বেশ্বর বা বিল্বনাথ, তিনি থাকেন নিকটবর্তী বিল্বেশ্বর গ্রামে। দেবীর মূর্তি বিনষ্ট হওয়ায় ঘটে ও যন্ত্রে তাঁর পূজা হয়। দেবালয়ের পার্শ্বস্থ একটি প্রাচীন পুষ্করিণী থেকে একটি ভগ্ন অথচ সুন্দর দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। ইনি চামুণ্ডা বা মহানন্দা হতে পারেন।

উদ্ধারণপুর ঃ কাটোয়া শহরের দু' মাইল উত্তরে অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত বিখ্যাত স্থান। সপ্তগ্রামের বণিকপ্রধান উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে এই স্থানে শ্রীপাট স্থাপন করেন ও গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন করে পূজা করেন। উদ্ধারণ দত্তের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়। কিঞ্চিৎ দূরে উদ্ধারণপুরের বিখ্যাত মহাশ্মশান। এই শ্মশানে কালিকানন্দ অবধূত কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন এবং পরে উদ্ধারণপুরের ঘাট নামক উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

কুলাই ঃ কাটোয়া শহর থেকে ১৬ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত অজয় তীরবর্তী প্রাচীন গ্রাম চৈতন্যদেবের পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষের জন্মস্থান। কুলাই গ্রাম নিবাসী যাদব কবিরাজ, দৈত্যারি ঘোষ, কংসারি ঘোষ প্রভৃতি গৌরভক্তবৃন্দ নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। এখানে বাসুদেব ঘোষের সাধনপীঠ ছিল।

কুলুট ঃ কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম। এখানে হোসেন শাহের আমলের টেরাকোটা অলংকরণ-সমৃদ্ধ একটি প্রাচীন মসজিদ আছে।

ঝামটপুর ঃ কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কাটোয়া বারহারওয়া রেলপথে বহরান স্টেশন থেকে আড়াই কি. মি. পূর্বে অবস্থিত চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান। আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোধান উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়।

নৈহাটী বা নবহট্ট ঃ কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত উদ্ধারণপুরের উত্তরে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামেই বল্লাল সেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ রূপ ও সনাতনের পৈতৃক নিবাস ছিল নৈহাটী। এখানকার কালরুদ্রদেবের পাষাণ বিগ্রহ প্রসিদ্ধ এবং ভাস্কর্য হিসাবে অনুপম। পদ্মাসনে শবোপরি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান চতুর্ভুজ নরমুণ্ড, খট্টাঙ্গ ও ত্রিশূলধারী, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, কুণ্ডল ও যজ্ঞোপবীতশোভিত, দুই পার্শ্বে যোগমগ্ন দুই যোগী ও দুটি অপ্সরা সমন্বিত মূর্তিটি একটি দুর্লভ বস্তু।

শ্রীপুর ঃ কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কাটোয়া-আমদপুর রেলপথে রামজীবনপুর স্টেশন থেকে ২ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এখানে বাননাগরার জঙ্গলে একটি ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিকটে রানী ভবানী শিব ও কালীর দুটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। শিবের গাজন উপলক্ষ্যে দীর্ঘদিন স্থায়ী একটি মেলা বসে।

সিঙ্গি ঃ কাটোয়া থেকে বাসযোগে গমনযোগ্য মহাভারতের রচয়িতা কাশীরাম দাসের জন্মস্থান। এই গ্রামে বুড়ো শিবের নবরত্ন মন্দির, রত্নেশ্বর শিবের চারচালা মন্দির ও আনন্দময়ী কালীর মন্দির দর্শনীয়। আষাঢ় মাসে কৃষ্ণা নবমীতে বটবৃক্ষে সাড়ম্বরে ক্ষেত্রপালের পূজা হয়। বুড়োশিবের গাজন ও চড়ক উৎসবও সম্পন্ন হয়।

মামগাছি ঃ পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত ভাণ্ডারটিকুরি রেলস্টেশন থেকে ১০ কি. মি. দূরে বৈষ্ণবতীর্থ। এখানে বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট আছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী ও তাঁর পুত্র চৈতন্যভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবন দাস মামগাছিতে বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের আশ্রয়ে বসবাস করেছিলেন।

সমুদ্রগড় ঃ পূর্বস্থলী থানার অধীনে সমুদ্রগড় স্টেশনের অদূরে ভাগীরথীর অদূরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত বা বুনো রামনাথের জন্মস্থান ও বাসস্থান হিসাবে বিখ্যাত। বর্তমানে মহার্ঘ তাঁতবস্ত্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ও একটি বাণিজ্যকেন্দ্র।

বর্ধমানের সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বলতে আমরা একটি জাতির বা জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীণ অভ্যুন্নতির বাহ্যিক প্রকাশকে বুঝি। সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বলতে বোঝায় আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি। সাহিত্য শিল্প, ললিতকলা অর্থাৎ চিত্র শিল্প ভাস্কর্য নৃত্যগীত প্রভৃতি, ধর্মীয় চেতনা তথা ধর্মাচরণ, আচার ব্যবহার ইত্যাদির উন্নত যে বিকাশ জাতি বা জনসঙ্ঘের জীবনে প্রকাশ পায় তাকেই সংস্কৃতি বলে থাকি। ইংরাজী কালচার শব্দকেই বঙ্গভাষায় সংস্কৃতি বলা হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সভ্যতা তরুর পুষ্পই সংস্কৃতি।[১] ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'সংস্কৃতি'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষ আজীবন

১। সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস—পৃঃ ৬

চেষ্টা করে যাতে তার জীবনকে সমস্ত আবর্জনা ও মালিন্য থেকে মুক্ত করতে, তার নিজেকে সংস্কৃত করতে, সর্ববিধ উপায়ে নিজের উন্নতি সাধন করতে। সেই সংস্কৃত, উন্নত জীবনের ফলশ্রুতিই হচ্ছে সংস্কৃতি।"[১] ডঃ রায় আর এক জায়গায় বলেছেন, "খাদ্যোৎপাদন ও সন্তান প্রজনন থেকে সুরু করে সঙ্গীত ও নৃত্য, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি এবং সংসার বাসনাহীন অধ্যাত্ম সাধনা পর্যন্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানুষ নিজেদের জীবনের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য যত যাবতীয় কর্মে লিপ্ত হয়, সে সমস্ত কর্মই জীবনকর্ষণ কর্ম, সমস্তই সংস্কৃতি কর্ম এবং সে কর্মের ফলশ্রুতিই কৃষ্টি, সংস্কৃতি।"[২]

সংস্কৃতির এই তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনা করতে গেলে বর্ধমানের সংস্কৃতিকে উন্নতমানের বলে স্বীকার করতেই হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বর্ধমানের জনসমষ্টির জীবনাচরণের এবং মননের যে সমুন্নত বিকাশ, তা-ই বর্ধমানের সংস্কৃতি। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সমন্বয়ের সংস্কৃতি। বর্ধমান জেলারও অতীত ও বর্তমানে ঐতিহাসিক সামাজিক ও মানসিক বিবর্তনে এই সমন্বয়ের ভাবধারা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

বর্ধমানের জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জনজাতির সংমিশ্রণ। বীরভানপুর, ভরতপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি ইত্যাদি খননকার্যের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সঙ্গে পরবর্তীকালে আগত আর্যসভ্যতার সম্মিলনে গড়ে উঠেছে বর্ধমানের সংস্কৃতি। পণ্ডিতদের মতে দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, অষ্ট্রলয়েড্ প্রভৃতি প্রাগার্য জাতি-গোষ্ঠী এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। ডোম, চণ্ডাল, বাগ্‌দি, বাউড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রাগার্য জাতির নিজস্ব সংস্কৃতির কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়। এরা অধিকাংশই ছিল বীর জাতি এবং সৈনিক বৃত্তিধারী। মঙ্গল কাব্যগুলিতে তার পরিচয় মেলে।

আর্যপ্রভাব তথা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম কোন না কোন সময়ে বর্ধমানকে প্লাবিত করে। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে বিলীন হয়ে গেলেও তার প্রভাব জনজীবন থেকে একেবারে লয়প্রাপ্ত হয় নি। ধর্মচর্যায় দেবদেবীর মূর্তিতে

১। কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি—পৃঃ ৩১
২। তদেব পৃঃ ৩৭

পূজানুষ্ঠানে এমন কি বাহ্যিক আচারেও জৈন-বৌদ্ধ প্রভাব অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। বুদ্ধ মূর্তি এবং জৈন তীর্থংকরদের মূর্তিও এই জেলায় দুর্লভ নয়।

আর্যধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে হঠিয়ে দিয়ে দৃঢ়ভাবে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দু-তান্ত্রিকতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মহাযান বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা গভীরভাবে শিকড় বিস্তার করে। ফলে সহজযান বা সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ ঘটতে থাকে। এই সহজিয়া ধর্মসাধনা এত জনপ্রিয় হয় যে বৈষ্ণবধর্মেও তার অনুপ্রবেশ ঘটে। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ বর্ধমান জেলাতেই রচিত হতে থাকে। এই সব বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও তাদের সাধন পদ্ধতি হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যরূপে গণ্য হয়।

ধর্মরাজের পূজা বর্ধমান অঞ্চলেই উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। অন্ততঃপক্ষে ধর্মরাজ পূজার ব্যাপকতা ও ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা বর্ধমান জেলাতেই সর্বাধিক। সাধারণতঃ ধর্মরাজকে বৌদ্ধ দেবতা বলে গ্রহণ করা হলেও কোন কোন পণ্ডিত তাঁকে আর্যেতর জাতিগোষ্ঠীর উপাস্য বলে মনে করেন। ধর্মরাজ সূর্য, বিষ্ণু ও শিবের সঙ্গে স্থান বিশেষে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন। জামালপুরের বুড়োরাজ ধর্মরাজের নামান্তর হলেও তিনি শিবলিঙ্গ। বুদ্ধ পূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও এই উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ড এবং পশু বলিদান বৌদ্ধধর্ম থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে। ধর্মরাজের গাজন শিবের গাজনে রূপান্তরিত হয়। শিবের গাজনে যে সকল অনুষ্ঠান হয় এবং যে কৃচ্ছ্রসাধন করা হয়, তা কোন কোন আর্যেতর গোষ্ঠীর ধর্মাচরণ থেকে আগত, জৈন কৃচ্ছ্রসাধনের কিছু প্রভাব থাকাও সম্ভব। তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি বর্ধমান জেলায় পূজিত দেবগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন। এই দেব-দেবীদের উদ্ভব সম্পর্কে মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু এঁদের পূজার্চনায় অনার্য প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী পশুদের আরাধ্যা অথবা ব্যাধজাতির দ্বারা পূজিতা। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বর্ধমানেই জন্মেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্ততঃ একজন প্রধান কবি বর্ধমান জেলার অধিবাসী।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবগোষ্ঠীর মধ্যে শিব-শক্তি ও বিষ্ণুই প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন। অনেকগুলি শক্তিপীঠ বর্ধমান জেলাতেই অবস্থিত। পৌরাণিক

দুর্গা-মহিষমর্দিনী যেমন এখানে পূজা পান, তান্ত্রিক কালী, তারা, চামুণ্ডাও ভক্তদের ভক্তি শ্রদ্ধা আদায় করে থাকেন।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ এই জেলাতে ব্যাপক ভাবে পূজিত হয়ে থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের প্রভাব বর্ধমানেই সর্বাপেক্ষা বেশী অনুভূত হয়েছিল। শক্তিপীঠের মত বর্ধমানে গ্রামে গ্রামে বহু বৈষ্ণব সাধকের সাধনক্ষেত্র বা শ্রীপাট অবস্থিত। বঙ্গভাষায় চৈতন্য-জীবনীকারগণ সকলেই বর্ধমানজেলাবাসী। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কয়েকজন কবি বর্ধমান জেলার অধিবাসী। অম্বিকা কালনা, বাঘনাপাড়া, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। শ্রীখণ্ড, কুলীনগ্রাম প্রভৃতি কীর্তনগানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

শাক্তধর্মের প্রাধান্য এ জেলায় বহু কথিত। এই জেলায় কয়েকটি প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ বা মহাপীঠ যেমন আছে, স্বল্পখ্যাত পীঠস্থানেরও অপ্রতুলতা নেই। তান্ত্রিক সাধকদের সাধনক্ষেত্র—পঞ্চমুণ্ডীর আসন, তান্ত্রিকতার ব্যাপ্তি বৈষ্ণব ধর্মের মত বর্ধমানের সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কয়েকজন বিখ্যাত শাক্তকবি বর্ধমান জেলার গৌরব বর্ধিত করেছেন শাক্তপদাবলী রচনা করে। শাক্তধর্মের সঙ্গে শৈবধর্মও বর্ধমানের সর্বত্র প্রসারিত। শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গের অধিষ্ঠান গ্রামে শহরে সর্বত্র।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান যেমন অসামান্য, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ও পদ্যে এবং গদ্যে বর্ধমান তার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। সংস্কৃত-চর্চায় এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে কোন ক্ষেত্রেই বর্ধমান পশ্চাৎপদ ছিল না বা নেই। স্থাপত্য ভাস্কর্য ও বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্পেও বর্ধমানের অবদান অসামান্য। অজস্র মন্দির নির্মাণ ও মন্দিরের কারুকার্য শিল্পীদের অসামান্য দক্ষতার পরিচয়বাহী। গ্রামে শহরে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন—মেলার বৈচিত্র্য, মেলায় বহু মানুষের মিলন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আদর্শটিকে স্পষ্ট করে তোলে। পীর ফকিরের দরগায় হিন্দু-মুসলমানের ভক্তি-শ্রদ্ধা পূজা নিবেদন, উরস ও অন্যান্য উৎসবে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত যোগদান বর্ধমানকে হিন্দু-মুসলমানের মিলনতীর্থে পরিণত করেছে। হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মন্দিরের অলংকরণের সঙ্গে মুসলমানদের মসজিদের স্থাপত্যকলাও বর্ধমানের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত। হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র

হিসাবে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজা এই জেলাতেও ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পশ্চিমাংশে উষর রুক্ষ মৃত্তিকা, খনি ও যন্ত্র-শিল্পাঞ্চল পূর্বাংশে কোমল উর্বর মৃত্তিকায় উল্লেখযোগ্য কৃষিক্ষেত্র বর্ধমান জেলায় প্রাকৃতিক বৈপরীত্যের মধ্যে এনেছে সামঞ্জস্য। শিল্পাঞ্চলে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী জনগণের সমাগমে সংস্কৃতির রূপান্তর স্বাভাবিকভাবেই লক্ষিত হয়। অবাঙ্গালী বিশেষতঃ হিন্দীভাষী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। পূর্বাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে এই অঞ্চলের মানুষ ধর্মে কর্মে জাতিগত বা গোষ্ঠীগত আচার আচরণে। তথাপি প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনার্য আর্য বৈদেশিক নানা সংস্কৃতির সমাগমে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সাহিত্যে মননশীলতায়, যাত্রায় কবিগানে, পাঁচালীগানে আচারে আচরণে ধর্মে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে পরিশীলিত কলাবিদ্যায় বর্ধমান এমন একটা উন্নত মহিমা লাভ করেছে যা মহামানবের মিলনক্ষেত্র এবং বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হয়েও নিজস্ব গৌরবে গরীয়ান।

গ্রন্থপঞ্জী

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বুক এম্পোরিয়ম্, ১ম সং, পুঃ মুঃ ১৩৫৯।

২। বর্ধমান বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, ৮ম অধিবেশন—স্মারক গ্রন্থ ২ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান শাখা।

৩। দুর্গাপুরের ইতিহাস—প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়—১৯৮৪।

৪। বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর—সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক ষ্টল—২য় সং—১৯৬৬।

৫। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম ও ২য় খণ্ড—নব ভারত পাবলিশার্স—১৯৭১।

৬। বাঙ্গালার ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (নবাবী আমল), স্টুডেন্ট্স্ লাইব্রেরী—২য় সং ১৩১৫।

৭। বঙ্গভূমিকা—ডঃ সুকুমার সেন, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স—১ম সং ১৯৭৪।

৮। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম সং পুস্তক প্রকাশক—১৯৫৭।

৯। বর্ধমান পরিচিতি—নারায়ণ চৌধুরী—অনুকূলচন্দ্র সেন, বুক সিণ্ডিকেট—১ম সং ১৩৭৩।

১০। বর্ধমান—ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ১ম খণ্ড—পুস্তক বিপণি ২য় সং ১৯৯৫।

১১। বর্ধমান—ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ২য় খণ্ড—পুস্তক বিপণি ১ম সং ১৯৯১।

১২। বর্ধমান—ইতিহাস ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ৩য় খণ্ড—পুস্তক বিপণি ১ম সং ১৯৯৪।

১৩। বর্ধমান পরিক্রমা—সুধীর চন্দ্র দাঁ, বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ—১৯৯২।

১৪। বর্ধমান চর্চা—১ম ও ২য় খণ্ড, সম্পাঃ শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু।

১৫। শারদীয় বর্ধমান—১৩৭৪।

১৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড—১৯৭০—মডার্ণ বুক এঃ।

১৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন—ইষ্টার্ন পাবলিশার্স—১ম খণ্ড, ৪র্থ সং ১৯৬১।

১৮। বঙ্গ সাহিত্যাভিধান—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ৪ খণ্ড—ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ ১৯৮৭।

১৯। যাত্রা গানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য—চলন্তিকা নবদ্বীপ ১ম সং ১৩৭৪।

২০। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, ১ম সং—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী—ইণ্ডিঃ এসোঃ পাব্‌ কোং ১৮৮০ শকাব্দ।

২১। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, মহাজাতি প্রকাশন, ১ম সং ১৩৭২।

২২। কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—ডঃ গোপেশ চন্দ্র দত্ত, জিজ্ঞাসা ১ম সং, ১৯৭৬।

২৩। পূজা পার্বণ—যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।

২৪। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১ম সং, ১৩৫৮।

২৫। দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী—ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী—এ. মুখার্জী, ১ম সং, ১৩৬৭।

২৬। সাহেব ধনী সম্প্রদায়—তাদের গান—ডঃ সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি—১ম সং, ১৯৮৫।

২৭। আমার জানা শ্রীখণ্ড—নিত্যরঞ্জন কবিরাজ।

২৮। প্রবোধ চন্দ্রোদয়—কৃষ্ণ মিশ্র।

২৯। মহাভারত—হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ সম্পাদিত—চিত্তবাণী প্রকাশনী।

৩০। রামায়ণ—মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত।

৩১। সিদ্ধান্ত কৌমুদী—পাণিনি—বাসুদেব লক্ষ্মণ সম্পাদিত, বোম্বাই—১৯০৮।

৩২। বৃহৎসংহিতা—বরাহমিহির—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত—১৮১০ শকাব্দ।

৩৩। অর্থশাস্ত্র—কৌটিল্য—আর্ শ্যামা শাস্ত্রী সম্পাদিত—মহীশূর, ১৯২৪।

৩৪। অভিধান চিন্তামণি—হেম চন্দ্র পুরী—নিমতলা ঘাট, কলিকাতা ১৯৩৪।

৩৫। পবন দূত—ধোয়ী—সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ১৭শ খণ্ড, নব পত্র প্রকাশন।

৩৬। কল্পনা মঞ্জরী—রাজশেখর।

৩৭। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার—৬ষ্ঠ খণ্ড।

৩৮। Studies in Geography of Ancient & Medieval India —Dr. D. C. Sarkar.

৩৯। Some Historical Aspects of Some Inscriptions of Bengal—Dr. B. C. Sen, C. U. 1942.

৪০। Ancient India as described by Megasthenis & Arrian, C. C. & Co. 1960.

৪১। Ptolemy's Ancient India—by M. C. Crindle Ed.—S. N. Mazumdar Sastri.

৪২। Studies in Indian Antiquities—Dr. H.C. Roychowdhury C. U.—1932.

৪৩। On Youngchuang—Watters.

৪৪। Historical Aspects of Bengal Inscription—Dr. B. C. Sen C. U. 1942.

৪৫। Historical Geography of Bengal—Amitabha Bhattacharya, Sanskrit Pustak Bhandar—1977.

৪৬। Inscriptions of Bengal Vol-III, Ed. N. G. Mazumdar, Varendra Research Society—1929.

৪৭। History of Bengal Vol-I & Vol-II, Ed. Sir Jadunath Sarkar—D. U. 1962, 1963.

৪৮। Dynastic History of Northern India—Dr H. C. Roy, Vol-I, C. U. 1981.

৪৯। History of Mediaeval Bengal—Dr. R. C. Mazumdar.

৫০। Bakataka Gupta Age—R. C. Mazumdar, Motilal Benarasidas—1954.

৫১। History of North Eastern India—R. G. Basak, The Book Co. Ltd.—1934.

৫২। Ancient Geography of India—General Cunningham

Ed.—S. Mazumdar Sastri, Chakraborti & Chatterjee Co.—1924.

৫৩। সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
—জিজ্ঞাসা-১ম সং।

৫৪। স্মৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
—জিজ্ঞাসা-১ম সং পুঃ মুঃ ১৯৮২

৫৫। রামরসায়ন—রঘুনন্দন গোস্বামী—বসুমতী

৫৬। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—সম্পাদক ডঃ সুকুমার সেন
সাহিত্য একাডেমি—১৩৮২

৫৭। অন্নদামঙ্গল—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী
—বসুমতী।

৫৮। শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য—ঘনরাম চক্রবর্তী—ক. বি. ১৯৬২

৫৯। ধর্মমঙ্গল কাব্য—রূপরাম চক্রবর্তী—বর্ধমান সাহিত্যসভা—১৩৫১

৬০। মনসার ভাসান—ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস
—প্রকাঃ বিহারীলাল সরকার—১২৯২

৬১। কামসূত্র বাৎসায়ন—নবপত্র প্রকাশন।

৬২। ন্যায়কন্দলী—শ্রীধরাচার্য

৬৩। ঐতরেয় আরণ্যক

৬৪। জীবন কথা—(সত্যব্রত সামশ্রমীব জীবনী)—হারানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ক. বি. ১৩৫১

৬৫। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—মন্মথনাথ ঘোষ
ঋদ্ধি ইণ্ডিয়া ২য় সং ১৯৮২

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তিনাম

খ

গ

ভ

ম

য

ল

স

গ্রন্থনাম

অ

আ

ই

প

ভ

য

স্থান নাম

অ

আ

ভ

বিবিধ

ঈ

উ

ঊ

এ

ও

ক

ভ

ইংরাজী

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০১	২৪	মাত	মাতা
১৩০	২২	পূর্বাহুত	পূর্ণাহুতি
১৩৩	২১	সংকলক	সংকলন
১৩৪	৫	সাহাজুই	সাহাজুই
১৩৬	১৮	ঊনবিংশ শতাব্দীতে	ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে
১৪৮	১৪	আখতাব চাঁদ	আফতাব চাঁদ
১৫০	১৫	ব্রজলী	ব্রজলীলা
১৫০	২৬	রায়ের	মতিরায়ের
১৫১	৭	স্থরযোদ্ধার	স্থরথোদ্ধার
১৫১	২৬	অঘোর কাব্যতীর্থ	অঘোর কাব্যতীর্থ রচিত
১৫১	২৭	প্রতাপাদিত্য পাল	প্রতাপাদিত্য পালা
১৫৫	১৮	মণ্ডেশ্বর	মন্তেশ্বর
১৫৭	১৪	সন্দীগীতির	নান্দীগীতির
১৫৮	১	নিষ্কল	সিদ্ধল
*১৫৮	৬	নেহাটী	নৈহাটী
*১৫৮	৭	ঝামাটপুর	ঝামটপুর
১৬২	১০	দুর্জন, মিহির, কলংক	দুর্জনমিহিরকলংক
„	১৯	মাতুরালোকমানং	মাতুরালোকমানং
„	২০	নন্দমা প্লোম্মি	নন্দমাপ্লোমি
„	২৬	একবর্ণার্বসংগ্রহ	একবর্ণার্থ সংগ্রহ
*১৬৫	১৮	বাঁকুড় সোনামুখী	বাঁকুড়া সোনামুখী
১৬৭	১৯	শব্দস্তোত্রম্‌মহানিধি	শব্দস্তোমমহানিধি
*১৬৭	২২, ২৪	শশীভূষণ	শশিভূষণ
১৬৮	২১	ভট্টাচার্য পীঠাণঃ	ভট্টাচার্য গীর্বাণঃ
১৯২	২	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস	জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস
১৯৩	১৩	২০শে জুলাই স্থায়ীভাবে	২০শে জুলাই রামমোহন স্থায়ীভাবে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০০	১১	বাবুলিয়ার	বাকুলিয়ায়
২০২	৫	বলাইচাঁদ গাঙুলী	বলাইচাঁদ গাঙ্গুলী
*২০৪	৪	আকালপৌষ	অকালপৌষ
২০৫	২৪	ঘোলাগ্রাম	টোলাগ্রাম
২০৭	১৫	বিজয় চৌধুরী	বিনয় চৌধুরী
*২২০	৮	গোরাচাঁদ ফরিক	গোরাচাঁদ ফকির
২২২	২৫	এখানে উত্তর বাহিনী	এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী
২২৮	৮	সিংহাসনের পুরাভাগে	সিংহাসনের পুরোভাগে
২৩০	১৮	পংক্তিতে নরহরি সরকার ও ২২ পংক্তিতে নিবাস স্থলের পরে পূর্ণচ্ছেদ বসবে।	
২৩৩	১১	ইতিহাস সিদ্ধ	ইতিহাস প্রসিদ্ধ
২৩৪	৮	জটাকূটধারী	জটাজূটধারী
* ”	১২	দালাল কোঠা	দালান কোঠা
”	১৪	জন্ম দিতে	জন্ম দিনে
* ”	২০	উর্ধ্বাঙ্গে	উর্ধ্বাঙ্গ
”	২২	নিয়তা	নিরতা
”	২৪	করেছিলেম	করেছিলেন
*২৪০	৮	মৃত্যুর	মৃত্যুঃ
* ”	১৪	মৃতুঃ	মৃত্যুঃ
”	২৫	বৃহমুগ্ধবোধ	বৃহদ্মুগ্ধবোধ
২৪৫	২২	Hinayano	Hinayana
২৫৬	৯	প্রত্নকত্রসন্দিনী	প্রত্নকত্রনন্দিনী
২৫৭	১৪	ব্যাকরণে	ব্যাকরণ
২৬৬	২৭	রসমিত্রের	রসময় মিত্রের
২৬৮	১৫	বারা খাঁ ও তাঁরা	বারা খাঁ ও তাঁর
২৭২	২২-২৩	আরাম রোডের	আরামবাগ রোডের
২৭৩	৮	নদীখাতের বাণ রাজার	নদীখাতের তীরে বাণ রাজার
২৭৪	২৬	গণ্ডার	গম্ভার